এই 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদ ও বিলাতযাত্রা, তাঁর কবিতার প্রতি রোদেনস্টাইনের আগ্রহ ওআমেরিকায় বিদগ্ধ সমাজে পরিচয়ের সবার পেছনেই ঈশ্বরের যেন এক গুঢ় উদ্দেশ্য লুকিয়ে আছে যা তাঁকে শুধু এশিয়ার শ্রেষ্ঠতম কবি হিসেবেই স্বীকৃতি এনে দিল না, তাঁকে প্রাচ্যের অভিজ্ঞ ও মানবতাবাদের এক প্রধান মুখপাত্রে পরিণত করল। গান্ধী ও নেহেরুর মতো রবীন্দ্রনাথও বিশ্বের দরবারে ভারতের যে আত্মমর্যাদা ও গৌরব প্রতিষ্ঠিত করলেন, কবির এই সময়কার কার্যকলাপই তার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল। উনিশ শ বারো-তের সালের এই বিদেশযাত্রা ও তৎকালীন ঘটনাবলী রবীন্দ্রনাথের জীবনে না ঘটলে তিনি নিশ্চয়ই বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠকবি হতেন, কিন্তু বিশ্বকবি হিসেবে বন্দিত হতেন কিনা সন্দেহ।

যদিও আমি রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কার ঘটনাকে উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বর্ণনা করেছি, তবু এর অধিকাংশ চরিত্র ও ঘটনাই অন্যের লিখিত বিবরণীর ওপর নির্ভর করে লেখা হয়েছে (পরিশিষ্টে গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য)। শুধুমাত্র উপন্যাসের ঘটনাস্রোত রক্ষার জন্য দু-তিনটি কাল্পনিক চরিত্র উপস্থাপিত করেছি, বিশেষ করে তাঁর জাহাজে করে ইংলণ্ডযাত্রা ও সেখান থেকে আবার জাহাজে ও ট্রেনে করে আমেরিকার আর্বানা শহরে যাবার সময়। তাই সংলাপ কাল্পনিক হলেও অধিকাংশ সময়েই সংলাপের বিষয়বস্তু ও চরিত্র কাল্পনিক নয়, সত্যিকারের জীবিত ব্যক্তির মুখ থেকেই তা বলানো হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনার মূল উৎস রবীন্দ্রনাথ নিজেই। উনিশ শ বারো সালে ইংলণ্ডে যাবার অভিজ্ঞতা তিনি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে। তাঁর জাহাজে অবস্থান ও লণ্ডনে রোদেনস্টাইন, ইয়েট্‌স্ বা স্ট্যাফর্ড ব্রুক্‌স্-এর সম্বন্ধে তাঁর ধারণার বর্ণনা রয়েছে এই গ্রন্থে। যদিও এই দেড় বছর বিদেশ-অবস্থানে তিনি একটি মাত্র বাংলা কবিতা ছাড়া আর কিছু বাংলায় লেখেননি,

তবু তাঁর নানা ধ্যান ধারণা ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা এই সময়ে লেখা তাঁর অনেক চিঠিতে ছড়িয়ে আছে। তেমনি কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের 'অন্ দি এজ্ অফ্ টাইম' স্মৃতিকথায়ও তাদের বিলাতযাত্রা এবং ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অবস্থানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। মেরী ল্যাগোর সম্পাদিত 'ইম্পার্ফেক্ট এন্কাউণ্টার' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ও রোদেনস্টাইনের যে সব পত্রাবলী সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের অবস্থানের এক ধারাবাহিক বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সবচাইতে তথ্যবহুল সূত্র হোল প্রয়াত গ্রন্থকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী'র দ্বিতীয়পর্ব। যদিও এটি ত্রুটিমুক্ত নয় (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। আবার রবীন্দ্রনাথের এই সময়ের কিছু লেখার থেকে শব্দান্তর করে তাঁর চিন্তা-ভাবনা বা সংলাপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি—অনেকটা গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো করার মতোই।

এই উপন্যাসে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ও পুত্রবধূ প্রতিমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছি অনেক সংকোচের সঙ্গে। মনে রাখতে হবে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়েস ছিল তখন চব্বিশ আর প্রতিমা দেবীর মাত্র উনিশ। এই লেখার মধ্যে তাদের ব্যক্তিত্বে যদি একটু বেশী পূর্ণতাপ্রাপ্তির লক্ষণ দেখা যায়, তাহলে বোলবো যে রথীন্দ্রনাথের চার বছর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ তার লাজুকভাব মোচনে অনেক সাহায্য করেছিল, আর প্রতিমা দেবীর ব্যক্তিত্ব গঠনে তার এই বিদেশ ভ্রমণ এক বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। তবু রবীন্দ্রনাথই এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র, তাঁকে কেন্দ্র করেই এদের ঘোরাফেরা, ব্যস্ততার পালা। আর রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের ছবি তো আমরা সর্বত্রই পাই—তাঁর নিজের অজস্র লেখায়, তাঁর সম্বন্ধে অন্যদের অজস্র লেখায়। আমার এই অক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যে কবির প্রীতিস্নিগ্ধ ও কৌতুকময়, আবার ভাবগম্ভীর ব্যক্তিত্বটি যদি ফুটিয়ে তুলতে পারি, তাহলেই আমার পরিশ্রম সার্থক বলে মনে করবো।

॥ এক ॥

সাতাশে মে, উনিশ শো বারো সাল। রবীন্দ্রনাথ যখন পুত্র রথী ও পুত্রবধূ প্রতিমাকে নিয়ে বোম্বাই থেকে ভোরবেলায় 'সিটি অফ গ্লাস্‌গো' নামে জাহাজে উঠলেন, তখন তাঁদের বিদায় দেবার জন্য জাহাজ ঘাটে কেউ ছিল না। শুধু অপরিচিত জনের বিদায় কালীন কলগুঞ্জন।

অথচ এ দৃশ্য দুমাস আগে তাঁদের কলিকাতা থেকে ইংলণ্ডের পথে জাহাজে চড়ার সম্পূর্ণ বিপরীত যখন আত্মীয়সজন বন্ধুবান্ধবে চাঁদপাল ঘাট ভরে গিয়েছিল। শুধু ঠাকুরবাড়ি থেকে নিকট আত্মীয়রাই নয়, এমনকি হিতেন্দ্রদাদার ছেলেমেয়েরাও এসেছিল বিদায় জানাতে।

কিন্তু সে যাত্রার আগের রাত্রে বন্ধুবর আশুতোষ চৌধুরীর বাড়িতে বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় দেখে নৈশভোজের পরও রবীন্দ্রনাথ গভীর রাত্ত অবধি চিঠি লিখে চললেন। এর ফলে পরের দিন সকালে এমন অসুস্থ হয়ে পড়লেন যে জাহাজে ওঠা তো দূরের কথা, ডাক্তারের পরামর্শে তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম নিতে হোল প্রায় ছমাস ধরে। ফলে সেদিন যারা তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছিল, তাদের সবাইকেই নিরাশ হয়ে ফিরতে হোল জাহাজ-ঘাট থেকে।

এবারে শান্তিনিকেতন থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তও কম মর্মস্পর্শী নয়। ছাত্রদের চোখে জল, শিক্ষক মশায়রাও খুব স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। সবাই তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। কবির শরীরের অবস্থার জন্য সবাই উদ্বিগ্ন। সবারই এক চিন্তা যে এত দূরের পথ যাত্রা, এই রুগ্ন শরীরে সেই বিরাট ধকল সইবে কী!

জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে রবীন্দ্রনাথ আর সবায়ের বিদায়-দৃশ্য দেখতে লাগলেন। তাঁদের পরিচিত কেউ এখন এখানে নেই। বোম্বাই শহরও তাঁর খুব পরিচিত নয়। তিন দিন আগে এসে এখানকার 'ওয়াটসন্' হোটলে উঠেছিলেন, তারপর ঘুরে ঘুরে বলতে গেলে এ শহরের অনেকটাই তারা দেখেছেন। তবু এ শহর যেন অপরিচিতই রয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল আঠারশ আটাত্তর সালে তাঁর সেই প্রথমবার ইংলণ্ডে যাত্রার কথা যখন যাত্রার পূর্বে ছমাসের জন্য বোম্বাইতে ছিলেন তড়খড়ে পরিবারের সঙ্গে। ডাঃ আত্মারাম তড়খড়ের মেয়ে আন্নার ওপর ভার ছিল রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কথপোকথন ও ইউরোপীয় সহবত শেখানোর। কয়েক দিনের মধ্যেই আন্না পরম ভক্ত হয়ে পড়ল রবীন্দ্রনাথের কবিতার ও গানের। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যিক নাম দিলেন 'নলিনী'। কতদিন তাকে তাঁর সদ্য-লিখিত কবিতা পড়ে শুনিয়েছেন। এখন সে কোথায় আছে কে জানে। কিন্তু যেখানেই থাক, তার অবস্থান রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির মণিকোঠায় চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

দেখতে দেখতে জাহাজ বোম্বাই শহরের সীমারেখা ছাড়িয়ে আরব সাগরের গভীরতার মধ্যে ঢুকে পড়ল। রথী এসে বলল, "বাবামশায়, কেবিনের ভেতরে চলুন, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

"তোমরা যাও, আমি আর একটু এখানে থাকি," বলে তিনি পাশের ডেক চেয়ারটি টেনে নিলেন।

রথী বুঝলো যে কবি এখন কিছুক্ষণ একলা থাকতে চান। একটু পরেই প্রতিমা এসে বলল, "বাবা মশায়, এই চাদরটি গায় দিয়ে জড়িয়ে বসুন, তাহলে ঠাণ্ডা কম লাগবে।" বলে তাঁর চেয়ারের হাতলে জরির কাজ করা আলোয়ানটি রেখে দিল।

কোলের ওপর আলোয়ানটি বিছিয়ে রবীন্দ্রনাথ দূরের সমুদ্রের দিকে অলসভরে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর সেই প্রথমবার ইংলণ্ডে

যাবার অভিজ্ঞতা কোনদিন ভোলবার নয়। মহর্ষি থেকে আরম্ভ করে সবার ইচ্ছে যে দেশের পড়াশুনায় যখন একদম মন নেই, তখন রবি বিলেত গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে আসুক। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই প্রথম যখন আরব সাগর পাড়ি দিলেন, তখন তাঁর বয়েস মাত্র সতের বছর। সেই জাহাজের মধ্যে 'সী-সিকনেস্'-এ ভুগে তাঁর কী কষ্ট! কিছু না খেয়ে চারদিন জাহাজের কেবিনে মরার মতো শুয়ে রইলেন। জাহাজের স্টুয়ার্ট যদি জোর করে তাঁকে না খাওয়াতো, তাহলে আর তাঁর দিকে তাকানো যেত না। সে বার বার বলত, "কিছু না খেলে তুমি ইঁদুরের মতো ক্ষুধার্ত ও দুর্বল হয়ে পড়বে।" তারপর আস্তে আস্তে তিনি ভাল হয়ে উঠলেন। জাহাজ যখন এডেন বন্দরে এসে পেঁাছলো, তখন তিনি দিব্যি সবল স্বাস্থ্যবান পুরুষ। কে বলবে যে মাত্র কয়েকদিন আগেও অসুস্থ হয়ে দিনরাত জহাজের কেবিনে পড়ে ছিলেন!

তারপর আঠারশ নব্বুই সালে উনত্রিশ বছর বয়েসে দ্বিতীয়বার যখন মাত্র চার মাসের জন্য ইংলণ্ডের পথে রওনা দিলেন, সেবারেও আবার 'সী-সিক্‌নেস্'-এ ভুগতে হোল কয়েকদিন, যদিও প্রথম বারের মতো অতো সাংঘাতিক নয়। অসুখের প্রথমেই ভুল করে আর একজনের কেবিনে ঢুকে পড়ে তার কম্বল নিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ সারারাতই ডেকের এক বেঞ্চিতে শুয়ে কাটালেন। তারপর যখন ঝাঁকিয়ে 'সী-সিকনেস্' এলো তখন তিনি কিছুই খেতে পারেন না, সব বমি করে ফেলেন। সেই জাহাজে বন্ধুবর লোকেন পালিত এক বিরাট ভরসাস্বরূপ ছিলেন। তাঁর হাসিখুশী স্বভাব ও নানা-বিষয়ে জ্ঞানপূর্ণ কথাবার্তা সে যাত্রাকে মধুর করে তুলেছিল।

আজ বাহান্ন বছর বয়েসে পৌছে আবার তিনি ইংলণ্ড অভিমুখে রওনা দিয়েছেন। শরীর এখন অনেক দুর্বল, ঈশ্বরের কৃপায় আবার যেন সেই 'সী-সিকনেস' চেপে না ধরে!

জলের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হোল, আমরা ডাঙার মানুষ, কিন্তু আমাদের চারদিকে সমুদ্র। জল ও স্থল এই দুই বিরোধী শক্তির মাঝখানে এই মানুষ। কিন্তু মানুষের প্রাণের মধ্যে এতো সাহস যে জলের কূল দেখতে না পেয়েও সে তাকে বাধা বলে মানলো না। তার মধ্যে ভেসে পড়ল। সমুদ্রের অগাধ জলরাশি তাকে নিরস্ত করতে পারলো না। বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করেছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটিয়ে চলেছে লক্ষ্মীকে সে আর পেল না। বীরকে তিনি আশ্রয় করবেন, লক্ষ্মীর এই পণ। এই জন্যেই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এক ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করেছেন। পার হতে পারলে তবেই তিনি ধরা দেবেন। যারা কূলে বসে কলশব্দে ঘুমিয়ে পড়ল, হাল ধরল না, পাল মেলল না, বা পাড়ি দিল না, তারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হতেই বঞ্চিত হোল।

কিছুক্ষণ পরে সূর্যের তাপ বাড়তে শুরু করল। প্রতিমা এসে বলল, "বাবামশায় এবার কেবিনের ভেতর চলুন, আর বেশীক্ষণ রদ্দুরে বসলে মাথা ধরতে পারে।"

"ঠিক আছে, চলো", বলে কবি আস্তে আস্তে উঠে পড়লেন।

পাশাপাশি দুটি কেবিন নেওয়া হয়েছে। একটি কবির জন্য, আর একটি রথী ও প্রতিমার। ছোট্ট ঘর। কিন্তু ছোট ঘরে থাকতে তো রবীন্দ্রনাথের কোন অসুবিধে নেই। সারা জীবনই তো ছোট ঘরে দিব্যি কাটিয়ে এলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর বাসস্থান 'দেহলি' তো অতিক্ষুদ্র কুটির। তাঁর পদ্মার বোটের ঘরও ছোট ছিল। কিন্তু সেখানে কত আনন্দের দিন কেটেছে। তখন ঘর ছোট বলে একটুও মনে হয়নি।

দুপুরের লাঞ্চ খাওয়ার পরে নিজের ঘরের টেবিল-চেয়ারে বসে কবি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। দুপুরে ঘুমোনো তাঁর কোনদিনই অভ্যেস নেই, যদিও অর্শের ব্যথার জন্য এখন মাঝে মাঝে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে একটু বিশ্রাম নেন। কিন্তু শান্তিনিকেতনের দুঃসহ

দুপুরেও তিনি নিয়মিত সাহিত্যচর্চা করেছেন। এবার জামাতা নগেন্দ্রকে কথা দিয়ে এসেছেন যে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য তাঁর এই ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা নিয়মিত লিখে পাঠাবেন।

বিকেলে চা খেয়ে জাহাজের ডেকে যখন রবীন্দ্রনাথ এলেন, তখন কোণের দিকে একটি চেয়ার টেনে রথী ও প্রতিমার কাছে বসে পড়লেন।

রথী বলল, "বাবামশায়, আমি প্রতিমাকে বলছিলুম যে আপনার সকালে রদ্দুরে অতক্ষণ বাইরে বসা ঠিক হয়নি। শরীর তো আপনার এখনো খুব দুর্বল।"

কবি হেসে বললেন, "না না, আমাকে যত দুর্বল মনে করো, আমার শরীর ততো ননীর নয়। শুধু এই অর্শের ব্যথায়ই একটু কাতর হয়ে পড়েছি। যাই হোক, তোমরা সব গুছিয়ে বসেছো তো? আমি দুপুরে মীরাকে একটি চিঠি লিখলুম। জাহাজের মেল ঘরে সময় করে দিয়ে এসো রথী।"

রথী মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানাল।

প্রতিমা বলল, "আমাকেও অনেক চিঠি লিখতে হবে। সবাই বার বার করে বলেছে আপনি কেমন থাকেনতা নিয়মিত জানাতে।"

"আচ্ছা আমাকে নিয়ে সবার এতো ভয় কেন বলোতো", রবীন্দ্রনাথ একটু ছদ্ম প্রতিবাদের সুরে বললেন, "আমি তো এখনো তেমন বুড়ো হইনি! এখন আমাকে দেখে লোকে বিশ্বাস করেনা যে যৌবনে আমার অটুট স্বাস্থ্য ছিল, জল-কাদায় শত দৌড়ঝাঁপেও কোন অসুখ করতো না।"

প্রতিমা কিছু না বলে চুপ করে হাসল। আজকের দিনটি তার অসম্ভব ভাল লাগছে। উনিশ বছর বয়েসে তার এই প্রথম রথীর সঙ্গে বিদেশযাত্রা। অতি অল্প-বয়েসে বিয়ে হয়েছিল, স্বামীর সঙ্গে ভাল করে পরিচয় হতে না হতেই সে মারা গেল। তারপর রথীর সঙ্গে যখন আবার বিয়ে হোল, সে তখন ইউরোপ-আমেরিকা

ঘুরে এসেছে। বিয়ের পরই ওরা শিলাইদহে চলে গেল। সেখানে রথী বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের কাজ করবে।

ওদের জীবনে সে দিনগুলি সোনার জলে লেখা থাকবে। কতদিন গভীর রাত অবধি ছাদের ওপর মাতুর বিছিয়ে কত গল্পই না করেছে তুজনে। গল্প মানে রথীরই কথা বলা। নিউইয়র্ক, শিকাগো, লণ্ডন ইত্যাদি সব বড় বড় শহরের গল্প। প্রতিমা মুগ্ধ হয়ে রথীর মুখের দিকে তাকিয়ে সেই সব কাহিনী শুনত।

আজ এই প্রথম দেশের বাইরে স্বামীর সঙ্গে সাগর পাড়ি দেওয়া। ইউরোপের যে সব বড়-বড় শহরের কথা রথীর মুখে অসংখ্যবার শুনেছে, এবার সচক্ষে সেই সব শহর দেখতে পাবে।

আজকের দিনটি রথীরও খুব ভাল লাগছে। বাবা মশায় যখন তাকে শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে এসে আশ্রম পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে বললেন, তখন পদ্মাতীরের সেই শ্যামল পরিবেশ ছেড়ে বীরভূমের রুক্ষমাটি তার একটুও ভাল লাগেনি। কিন্তু বাবা মশায়ের অনুরোধ প্রকারান্তরে আদেশেরই সমতুল্য। তারপর তাঁর শরীর তুর্বল হয়ে পড়েছে। শমী বেঁচে নেই। সব ভার তো একমাত্র জীবিত পুত্র হিসেবে তাকেই বহন করতে হবে।

এবার চব্বিশ বছর বয়েসে এই বিদেশযাত্রায় সেই দায়িত্ব বহনের ক্লান্তি থেকে সে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। ইউরোপ সে গতবারে আমেরিকা থেকে ফেরার পথে দেখেছে, কিন্তু আর একবার ভাল করে দেখতে সে সমান উৎসুক। বিশেষ করে এবার যখন পড়াশুনার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে সেখানে থাকা হবে।

আজ বিকেলে সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে সবাই যেন তাদের চিন্তা-ভাবনার প্রতিবিম্ব দেখতে পাচ্ছিল। আস্তে আস্তে কখন কথা থেমে গেছে তার খেয়াল নেই।

একটু পরে যখন আকাশের গায়ে সন্ধ্যাতারা ফুটে উঠল, তখন রথী ও প্রতিমা কবির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে জাহাজের অন্যদিকে

বেড়াতে গেল। রবীন্দ্রনাথ কোলের ওপর হাত দুটি জড়ো করে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সত্যি, সমুদ্রের ওপরে বসে পারিপার্শ্বিক সৌন্দর্যের তুলনা মেলা ভার। চারদিকে অন্ধকারের ভেতরে পুঞ্জীভূত সাদা ঢেউয়ের ফেনা, আর মাথার ওপরে শুধু তারাভরা আকাশ। এ যেন স্তব্ধের সঙ্গে চঞ্চলের, নীরবের সঙ্গে মুখরের দিগন্তব্যাপী আলাপ। আস্তে আস্তে সপ্তর্ষী, রোহিনী, সব পরিচিত নক্ষত্রমণ্ডল আকাশের বুকে ভেসে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল অতি অল্প বয়েসেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সেই হিমালয় পর্বতে বেড়াতে গিয়ে বাবার কাছ থেকে তারার পরিচিতি শেখা। কতদিন গভীর রাত্রে মহর্ষি তাকে নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান চিনিয়ে দিতেন, তারপর তাকে ঘুমোতে পাঠিয়ে সেই নির্জন ছাদের মধ্যে আসন বিছিয়ে ধ্যানস্থ হয়ে পড়তেন তিনি।

আশ্চর্য, অনেক গভীর রাতে রবীন্দ্রনাথের যদি ঘুম ভেঙে যেত, সেদিনও উঠে দেখতেন পিতৃদেব প্রদীপ নিয়ে বড় ঘরের দিকে চলেছেন.........নিশীথকালীন প্রার্থনায় বসতে। তখন তাঁর দিকে তাকালে মনে হোত বাহ্যজ্ঞান তাঁর রহিত হয়ে গেছে, মুখ-মণ্ডলে এক অপার্থিব আনন্দের লহরী খেলে যাচ্ছে।

সেই থেকে রবীন্দ্রনাথের খুব ভোরবেলায় ওঠা অভ্যাস। কিছু-দিন আগে শান্তিনিকেতনের আশ্রম বেদীতে বসে প্রত্যুষে যখন একমনে ঈশ্বরের ধ্যান করতেন, তখন তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী শোনার জন্য দু-একজন শিক্ষক এসে জড়ো হতে লাগলেন। আস্তে আস্তে তাই নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সবাই তখন ভিড় করে এসে আচার্যের বাণী শুনতো। কবি যখন বুঝলেন যে এটি ক্রমশ একটি অনুষ্ঠানে পরিণত হচ্ছে, তখন একদিন হঠাৎ তা বন্ধ করে দিলেন। কোন রকম নিয়ম-মাফিক কাজের মধ্যে বেশিদিন বদ্ধ

হয়ে থাকা তাঁর স্বভাব নয়, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটলো না।

কবি নিজের জীবনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন, তাঁকে নিয়ে জীবন-দেবতার লীলাখেলার যেন শেষ নেই। স্কুলের পড়াশুনো যখন হোল না, সবাই যখন তাঁর ভবিষ্যতের আশা ছেড়ে দিয়েছে, তখন সাহিত্যই তাঁকে সবরকম অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে, কবিতাই তাঁকে তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্দেশ করেছে। তারপর যতই তাঁর কবি হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, ততই সবাইতাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়েছে। তারা বুঝেছে যে পুঁথিগত বিদ্যা জীবনে সব নয়। হাতে যার কলমের জাতুস্পর্শ, কণ্ঠে যার বীণা-নন্দিত গান, তার পড়াশুনো বইয়ের সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি যখন 'বেথুন সোসাইটি'র সভায় সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা ও গান শুনে ভারতের 'নববাল্মীকি' বলে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন, উপস্থিত অনেকেই তখন ভেবেছিল যে রেভারেণ্ডের বুড়োবয়সে ভীমরতি ধরেছে, রবীন্দ্রনাথের সুন্দর দর্শন ও অনবদ্য কণ্ঠস্বর শুনে তিনি একেবারেই মোহিত হয়ে গেছেন, নইলে কুড়ি বছরের এক উদীয়মান কবিকে কিনা তিনি মহাকবি বাল্মীকির সঙ্গে তুলনা করছেন!

আজকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা সর্বত্র আবৃত্তি হয়, তাঁর গানে আজ বাংলার আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে। তবু মনে তাঁর এক অতৃপ্তি সব সময়েই রয়ে গেছে। কই, বিদেশের কেউ তো তাঁর গান শুনলো না, তাঁর কবিতা পড়লো না! পৃথিবীর লোক তো দূরের কথা, বাংলার বাইরে অন্য প্রদেশের লোকই তাঁর নাম প্রায় জানে না।

অথচ আজ তিরিশ বছরের ওপর হোল তিনি লিখে যাচ্ছেন সমানে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প। গানের সংখ্যাও কম নয়। সব মিলিয়ে বইয়ের সংখ্যা পঁয়ত্রিশের ওপর হবে। কুড়িটির ওপর কবিতার বইই তো ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বন্ধুবর

মোহিত সেন সেগুলি থেকে বাছাই করে 'চয়নিকা' নামে এক সংকলন প্রকাশ করেছিলেন তাঁর মারা যাবার আগে।

রবীন্দ্রনাথের মনে হোল তাঁর এই বিদেশযাত্রার পেছনে ঈশ্বরের যেন এক বিশেষ অভিপ্রায় লুকিয়ে আছে। নইলে দুমাস আগে যখন যাওয়া হোল না, তখন ঠিক করেছিলেন আর এবছর বিদেশে যাবেন না। কিন্তু ডাক্তারদের বায়ুপরিবর্তনের জন্য অনুরোধ, রথীর ইউরোপে উচ্চশিক্ষার ইচ্ছা ও শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের কাছ থেকে লণ্ডনে আসার সানুনয় অনুরোধ—সব মিলিয়ে তাঁকে যেন এই যাত্রাপথের দিকে ঠেলে দিল। শান্তি-নিকেতনে থাকতে যেন অহরহ মনের ভেতর এক ডাক শুনতে পেতেন, "বেরিয়ে পড়ো", "বেরিয়ে পড়ো", "এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্বে একবার অন্তত এর গোলার্ধ ঘুরে এসো।"

একদিন রাত্রে বিছানায় শুয়ে একদম ঘুমোতে পারছিলেন না। ছটফট করতে করতে রাত দুটো-তিনটে হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ তখন বিছানা থেকে উঠে বারান্দায় আসনের ওপর বসে তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন তাঁর মনের মধ্যে আবার সেই ডাকের অনুরণন শুরু হোল, "ওঠো, জাগো, বেরিয়ে পড়ো"। রবীন্দ্রনাথ তখনই ঠিক করলেন আর দেরী করবেন না, এবার ইউরোপ যাত্রায় ঠিকই বেরিয়ে পড়বেন।

কবির মনে হোল জীবনের এক পরম সন্ধিক্ষণে যেন তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন, যবনিকার অন্তরালে জীবনের আর এক অংশ যেন তাঁকে উঁকি দিয়ে ডাকছে, বলছে: "সাহস থাকে তো এগিয়ে এসে আমার সম্মুখীন হও। আমি তোমাকে অনেক দূরে নিয়ে যাবো, অনেক উঁচুতে তোমাকে তুলবো, শুধু আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, যা সত্য ও সুন্দর তাই তুমি প্রকাশ করো অন্তরের অন্তস্তল হতে।"

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ ডেকের ওপর যখন পায়চারি করছিলেন, তখন পেছন থেকে শুনতে পেলেন কে একজন ডাকছে। "এক্সকিউজ্ মি, আপনি কী কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের যাজক ?"

রবীন্দ্রনাথ ঘুরে দেখলেন এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁকেই সম্বোধন করছেন। কাছে আসতেই করমর্দন করে নিজের পরিচয় দিলেন। নাম রেজিন্যাল্ড জোনস্, বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে কাজ করেন। হোম লিভ্ নিয়ে এখন লণ্ডনে যাচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথও নিজের নাম ইংরেজীতে বললেন। তারপর হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন, আমার লম্বা পোশাক ও দাড়ি দেখে আপনার প্রিস্ট্ বলে বোধ হচ্ছে ?"

ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ"।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "না, আমি কোন যাজক নই। আমি একজন লেখক। ছেলেদের শিক্ষার কাজেও ব্যস্ত থাকি।"

"তার মানে আপনি কোন স্কুল বা কলেজের টিচার ?"

"না না, তবে বাংলার বীরভূম ডিস্ট্রিক্টে আমি একটি স্কুল স্থাপন করেছি এবং সেখানেই আমি শিক্ষার কাজে নিযুক্ত আছি।"

"ওহ্, আপনি তাহলে বেঙ্গলী ! বেঙ্গল মানেই তো টেররিস্ট-দের রাজত্ব।"

"কয়েকজনের অপকর্মের জন্য একটি গোটা জাতিকে আপনি নিন্দা করতে পারেন না, মিঃ জোনস। ব্যক্তিগতভাবে আমি সন্ত্রাসবাদে আদৌ বিশ্বাসী নই। আমি মনে করি তারা যে পথ বেছে নিয়েছে তাতে ভারতের প্রগতিই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু একথাও আপনি মনে রাখবেন ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের যে উচ্চমন্য মনোভাব, আমাদের স্বদেশবাসীদের বিশেষ কোন দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত না করা, এগুলিও বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছে না।"

"কেন, ভারতীয়দের উচ্চপদে তো আমরা বসিয়েছি। এই তো সেদিন লর্ড এস. পি. সিন্‌হাকে আমরা আসাম-বঙ্গ প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত করেছি।"

"সেটি কেবল এক বিচ্ছিন্ন নমুনামাত্র যা আপনি ভাল করেই জানেন। আমাদের শিক্ষিত বাঙালি তথা ভারতীয়দের সংখ্যানুপাতে এই সব পদ অতি নগণ্য।"

"আসলে আপনারা শিক্ষিত বাঙালিরা খালি বৃটিশ শাসনের খুঁত বার করতে ব্যস্ত। আর স্থানীয় খবর কাগজের কাজই হয়েছে এই ফুটোগুলোকে বড় করে দেখানো।"

"সেটা সব সত্য নয়। ইংরেজ কী আমাদের কাছে গিয়ে কোন-দিন জানতে চেয়েছে কী আমরা চাই, কী আমাদের বেদনা? সে দূর থেকে সব সংস্রব বাঁচিয়ে কারবার করতে চায়, কোনরকমে উপকারটি করে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চায়। তারপর ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলে আর হুইস্কি খেয়ে যেন এ দেশে বাস করার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। আগে যখন পাল তোলা জাহাজ ছিল, তখন ইংরেজরা এত ঘন ঘন দেশে যেতে পারতো না, ফলে এ দেশ-বাসীর সঙ্গে একটু বেশী করে মিশত। এখন এই কলের জাহাজের কল্যাণে ইংলণ্ডে যাওয়া খুব সহজ, তাই সে আবার কখন ফার্লোলিভে দেশে যাবে সেই আশায় বসে থাকে, এদেশের লোকদের সঙ্গে পারতপক্ষে মিশতে চায় না।"

"মিঃ টেগোর, আপনারা একটু বেশী স্পর্শকাতর। আপনি তো বুঝতে পারেন যে পঁচিশ কোটি লোককে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করা সহজ নয়, ভুল ত্রুটি থাকবেই।"

"আসল সমস্যা কোথায় জানেন মিঃ জোনস্? সেটা হচ্ছে অন্তরে। আপনারা দয়া করেন না, উপকার করেন, আপনারা স্নেহ করেন না, খালি আমাদের রক্ষা করতে চান। ভারতবর্ষের প্রতি আপনাদের শ্রদ্ধা নেই, অথচ ন্যায়াচরণের চেষ্টা করেন। ইংরেজ

শাসনের এই হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করে আমরা কোনপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করি না। আজকালকার অনেক আন্দোলনই এই গুরু মনঃক্ষোভ থেকে জন্মাচ্ছে।”

“আপনাদের সমানভাবে আমরা দেখবো কেমন কোরে বলুন? আপনাদের নিজেদের মধ্যে কোন একতা নেই। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সারাক্ষণই মারামারি চলছে। একে উঁচু পদ দিলে অন্যে ক্ষেপে ওঠে।”

“এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে আমাদের হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তেমন জাতিগত ঐক্য নেই। আমরা হিন্দু বাঙালিরা অশিক্ষিত মুসলমানদের অনেক ব্যাপারেই আমাদের জীবন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি, কাছে টেনে এনে একসঙ্গে কাজ করতে পারি না। এর জন্যে আমাদের সমাজের যেমন অনেক গলদ আছে, তেমনি বৃটিশ শাসনের ভেদনীতি ও কম সাহায্য করেনি। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলনের সময় তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত মুসলমান নেতাদের ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য বৃটিশ শাসকরাও কম দায়ী নয়, যার ফলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অনেক নিরপেক্ষ নরনারী প্রাণ হারিয়েছে। শাসকের কাজ যদি হয় দেশশাসন, তখন দেশ-বাসী প্রকৃত কী চায় তাও দেখা উচিত।”

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ দেখলেন রথী ও প্রতিমা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতেই কবি তাদের সঙ্গে মিঃ জোনসের পরিচয় করিয়ে দিলেন। জোনস্ শাড়িপড়া প্রতিমার সৌন্দর্য দেখে একটু বিস্মিত হলেন। কাছে থেকে কোন ভারতীয় মহিলাকে বোধহয় এর আগে কোনদিন দেখেননি। মাথা নিচু করে একটু ঝুঁকে তিনি বললেন, “মাদাম, জেণ্টেলমেন, আপনাদের আর আটকে রাখতে চাই না। হ্যাভ এ নাইস ডে,” বলে অন্য দিকে চলে গেলেন।

রথী বলল, "বাবামশায়, চলুন লাঞ্চের সময় হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ আগেই খাবারের ঘণ্টা বেজেছে।"

ডাইনিং টেবিলে গিয়ে ওরা বসতেই ওয়েটার এসে অর্ডার নিয়ে গেল। স্যুপ আসতেই প্রতিমা বলল, "বাবা মশায় আপনার জন্য চিকেন স্যুপের অর্ডার দিয়েছি। ডাক্তার বলেছেন প্রত্যেক দিনই স্যুপ খেতে।"

কবি স্যুপের চামচে করে এক চুমুক দিয়েই বললেন, "না বৌমা এ আমার প্রত্যেকদিন খাওয়া চলবে না। এর থেকে দেশে মুরগীর সুরুয়া অনেক ভাল।"

প্রতিমা মাথা নেড়ে বলল, "না বাবা মশায় শরীরের জন্য স্যুপ আপনার প্রত্যেকদিন খেতে হবে। যদি চিকেন স্যুপ ভাল না লাগে তাহলে লেন্টিল বা টমেটো স্যুপ দিতে বলবো।"

রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে বলল, "এ থেকে ভাল স্যুপ বোধহয় আমি নিজেই রান্না করতে পারি। তোমরা জানো না, তোমাদের মা বেঁচে থাকতে রান্না নিয়ে আমি অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছি। ফরাসী রন্ধনবিদদের সব বই ঘেঁটে অনেক রকম স্যুপের এক্সপেরিমেণ্ট করেছিলুম এককালে।"

মার কথা উঠতেই রথীর মুখ করুণ হয়ে উঠল। মা মারা গেছেন আজ প্রায় দশ বছর হোল। এখনও তাঁর শেষ কটা দিনের কথা রথীর পরিষ্কার মনে পড়ে। সেই ট্রেনে করে মার সঙ্গে বোলপুর ছেড়ে শেষ বারের মতো কলকাতার যাওয়া, মৃণালিনী দেবীর বার-বার চোখের জল মোছা, তারপর শেষ কৃত্যের সময় তাঁর মুখে রথীর আগুন দেওয়া ইত্যাদি সবই আজ ছবির মতো তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

স্ত্রীর কথা মনে পড়তে রবীন্দ্রনাথের মনটাও খারাপ হয়ে গেল। আজ এই বিদেশ ভ্রমণে তিনিও তো বড় সঙ্গী হতেন। কতবার তারা আলোচনা করেছেন যে ছেলেমেয়েরা বড় হলে দুজনে মিলে

বিলেত যাবেন। যদিও লণ্ডন রবীন্দ্রনাথের খুব প্রিয় শহর নয়, তাহলেও তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল স্ত্রীকে সব ঘুরিয়ে দেখাবেন, তারপর সেখান থেকে ইউরোপের অন্যান্য রাজ্য পরিভ্রমণ করবেন। হায়, তা আর হোল না। এখন তার পরিচর্যার প্রধান ভার পুত্রবধূকেই বহন করতে হচ্ছে।

আলোচনার গতি দেখে প্রতিমা কথার মোড় অন্য দিকে ঘোরাল। "বাবামশায় আপনি যে সব নতুন গান লিখেছেন, তার দুএকটি আমাদের শোনাবেন? আজকে ডিনার খাবার পর ডেকের এক কোণায় বসে আপনার গান শুনবো।"

রবীন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, "কয়েকটি লেখা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেসব গানের সুরগুলি সব ঠিকমতো তৈরী হয়নি। তোমাদের কী ভাল লাগবে?"

"কি যে বলেন আপনি! আপনার কোন জিনিসটা না আমাদের ভাল লাগে!"

"জানো বৌমা, আমার এখন কবিতা লেখার চাইতে গান লিখতে বেশী ভাল লাগে।"

"কিন্তু বাবামশায়, আপনি বলেছিলেন গীতাঞ্জলির যে কয়টি কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন, তা আমাদের পড়ে শোনাবেন।"

"ওগুলির খসড়ার আর একটু সংশোধন দরকার", কবি উত্তর দিলেন। "কিন্তু বাংলা গীতাঞ্জলির পরে এ আমাদের শোনানো হয়ত ঠিক হবে না। ইংরেজীতে এগুলি হয়েছে সব গদ্য কবিতা।"

রথী উত্তর দিল, "বাবামশায়, আপনি আমাকে যে কয়টি দেখিয়েছেন সেগুলির তো অপূর্ব অনুবাদ হয়েছে। আমার মনে হয় ইংলণ্ডের যদি কোন কবিকে দেখিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে সেগুলিকে কোন ইংরাজী পত্রিকায় প্রকাশ করা অসুবিধে হবে না।"

"দেখি কী হয়। জানতো রোদেনস্টাইন লণ্ডন থেকে আমাকে কিছু কবিতার ইংরেজী তর্জমা করে আনতে অনুরোধ করেছিলেন,

তাঁর কথা শুনেই এগুলি করা। প্রকাশের চেষ্টার আগে ওঁর অভিমত নিতে হবে সর্বপ্রথমে।"

সন্ধ্যাবেলার ডিনার খাবার পর ডেকের ওপরে যখন ওরা বসলেন, তখন রাত ঘন হতে শুরু করেছে। নির্মেঘ আকাশ লক্ষ তারায় ছেয়ে গেছে।

এবার রথীই কথাবার্তা শুরু করলো, "বাবামশায়, আপনি আর শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে শরীর খারাপ করবেন না, জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু ইত্যাদি সবাই আছেন, আপনার অবর্তমানে ওরা ঠিকই সব চালিয়ে নেবেন।"

"সে জন্য আমার ততটা চিন্তা নয় রথী, যতটা আমার চিন্তা অর্থের জন্য। আমাদের এই বিদেশ যাওয়াতে কত খরচা হয়ে গেল! অনেকবার মনে হয়েছে যাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আর ঘরের ভেতর বন্দী হয়ে থাকতেও পারছিলুম না। তারপর অজিত আমার যে সব কবিতা ইংরেজী অনুবাদ করেছিল, তাই পড়ে রোদেনস্টাইন লণ্ডনে আসার জন্য এমন করে লিখলেন যে তখন মনে হোল এসবের পেছন ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় আছে। অন্তরের সেই ডাক শুনেই বেরিয়ে পড়লুম।"

প্রতিমা বলল, "লাবণ্যদির সঙ্গে অজিতবাবুর বিয়ে যেন ভগবানের আশীর্বাদ।"

"দ্যাখো, অমিও প্রথমে বুঝতে পারিনি যে ওদের মধ্যে ভালবাসা জন্মেছে। লাবণ্য তো আমার নিজের মেয়ের মতনই। মীরাই আমাকে একদিন বলল, "বাবামশায়, লাবণ্যদির সঙ্গে অজিতবাবুর বিয়ের ব্যবস্থা করুন না। তখনই আমার চোখ খুলে গেল। জানি এই বিধবা বিবাহে আবার আমি নিন্দাভাগী হবো। তোমাদের বিয়েতেও কত লোক নিন্দা করেছিল, আজ তোমাদের দুজনের মাঝে সেই নিন্দার মেঘ কোথায় উড়ে গেছে।"

প্রতিমা রথীর মুখের দিকে তাকিয়ে সলজ্জে মাথা নিচু করল।

রথী বলল, "অজিতবাবুর শরীরটা যদি একটু ভাল থাকতো, তাহলে শান্তিনিকেতনের কাজে অনেক বেশী লাগতে পারতেন।"

"অজিতের শরীরের জন্য আমারও সবসময় চিন্তা" রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "স্কলারসিপ নিয়ে ম্যাঞ্চেস্টারে গেল, কিন্তু শরীর অসুস্থ বলে তিনমাস পরেই চলে আসতে হোল। কিন্তু ওর লেখার কী ধার, কী প্রখর বুদ্ধিমত্তা! ওর কাছে বাংলা সাহিত্যের অনেক কিছু পাওনা রইল।

প্রতিমা আস্তে আস্তে বলল, "বাবামশায় আপনার এই ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেশীক্ষণ বসা ঠিক হবে না। ও আপনার ঘর থেকে শালটি নিয়ে আসছে।"

রথী তাড়াতাড়ি চাবি নিয়ে উঠে গেল। একটু পরে শুধু কবিরই নয় প্রতিমার জন্যও শালটি এনে দিল।

প্রতিমা গায়ে শালটি জড়িয়ে বলল, "বাবামশায় এইবার একটি গান করুন।"

"কোন গানটি গাইব? আমি গতকাল একটি গান লিখেছি যার সুর এখনও মনের মধ্যে লেগে আছে। সেইটাই গাই?"

প্রতিমা মাথা নেড়ে সায় দিতেই কবি মৃদুস্বরে গাইতে লাগলেন;

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে
মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ!
তব ভুবনে, তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান!
আরো আলো, আরো আলো
মোর নয়নে, প্রভু, ঢালো।
সুরে সুরে বাঁশি পুরে
তুমি আরো আরো আরো দাও তান!

আরো বেদনা, আরো বেদনা,
মোরে আরো আরো দাও চেতনা !
দ্বার ছুটায়ে, বাধা টুটায়ে
মোরে কর ত্রাণ মোরে কর ত্রাণ !
আরো প্রেমে, আরো প্রেমে
মোর আমি ডুবে যাক নেমে ।
সুধাধারে আপনারে
তুমি আরো আরো আরো করো দান ।

রবীন্দ্রনাথের গান শেষ হতে ওরা চুপ করে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল। গানের কথাগুলি যেন ওদের অন্তরের মধ্যে গুঞ্জন করে ফিরছিল। কারুর মুখে কোন কথা নেই। শুধু প্রতিমা একটু পরে অস্ফুটকণ্ঠে বলল, "অপূর্ব !"

পরের দিন দুপুরে নিজের ঘরে বসে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের খাতাটি টেনে নিলেন। ইংরেজীতে যে কবিতা লিখতে বসবেন তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। মার্চ মাসে যখন ইংলণ্ডে যাওয়া হোল না, শারীরিক আরোগ্যের জন্য আশ্রয় নিলেন সেই পদ্মার তীরে শিলাইদহতেই।

মনের মধ্যে এত ক্লান্তি যে নতুন কোন লেখার ক্ষমতা নেই। আবার প্রকৃতির মধ্যে তখন উৎসবের তাণ্ডব চলেছে। চৈত্রমাসের দুপুরগুলি তখন আমের বকুলের গন্ধে আমোদিত। তাঁর সেই কুঠিবাড়ির তেতলার ঘরের জানালা দিয়ে কবি দেখেন একদিকে হলুদ সর্ষের ক্ষেত মাইলের পর মাইল জুড়ে চলেছে ; আর একদিকে পদ্মার ধু ধু চর—সব মিলিয়ে তাঁর মনে এক অদ্ভুত সুরের আবেশ এনে দিল।

কবি তখন [illegible] কাছে তাঁর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ থেকে কিছু কবিতা এক একে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে শুরু করলেন।

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY
AGARTALA, TRIPURA
৪৬৪৭৩
৬ ৩০
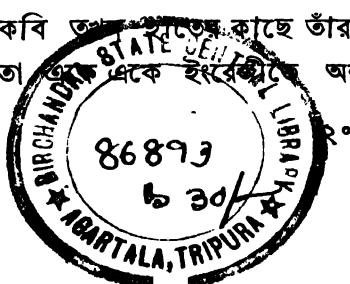
ঈশ্বরের চরণে নিবেদিত এই কবিতাগুলির অনুবাদের মধ্য দিয়ে এক অদ্ভুত প্রশান্তি পেলেন, তাঁর প্রিয় কবিতাগুলি বার বার পড়ার মধ্য দিয়ে আবার নতুন স্বাদ পেলেন। দেখতে দেখতে সেই খাতাটি ইংরেজী কবিতায় ভরে উঠল।

রবীন্দ্রনাথের সেই কুঠিবাড়িতে থাকার সময় এক বৈষ্ণবী তাঁর কাছে তখন আসতো বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের ব্যাখ্যা শোনাতে। সেই আলোচনার মধ্য থেকে কবির মন ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নিবেদনে আরও যেন বেশী করে পরিপূর্ণ হোল। তিনি বুঝলেন যে ঈশ্বর মানুষকে কঠোর নিয়মের মধ্যে রেখেও ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা আবার তিনি প্রেমরূপে দাবী করেন। তিনি মানুষকে নিয়ে লীলা করতে চান। তাই কখনো তিনি মহাভিক্ষুক সেজে আমাদের দ্বারে আসেন। আবার কখনো রাজরাজেশ্বর বেশে তাঁর অংশীদার করার জন্য আমাদের আহ্বান করেন। কখনো তিনি ভক্তের বিরহে কাতর, কখনো তিনি তার আনন্দের অংশগ্রহণের জন্য অধীর।

আস্তে আস্তে কবি তাঁর লেখার শক্তি ফিরে পেলেন। সেই 'গীতাঞ্জলি'র কবিতার সুরেই লিখে ফেললেন 'গীতিমাল্য'। তার থেকেও কয়েকটি কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন, যেমন করলেন তাঁর 'নৈবেদ্য' ও 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থ থেকে। ঈশ্বরের বিচিত্র লীলাই যেন তাঁর কবিতার ছত্রে ছত্রে ঝরে পড়তে লাগল। তাঁর অজান্তে কখন প্রকৃতির প্রেমরূপ ঈশ্বরের বন্দনাগানে পরিণত হয়েছে তার খেয়াল নেই।

জাহাজে বসে এইসব কথা চিন্তা করতে করতে রবীন্দ্রনাথের মন এক অপূর্ব আবেশে ভরে গেল। কাগজ-কলম হাতে নিয়ে তিনি 'গীতাঞ্জলি'র কবিতার আরো কিছু ইংরেজী অনুবাদ করতে বসলেন। বেছে নিলেন "তোরা শুনিস নি কী, শুনিস নি কী তাঁর পায়ের ধ্বনি" কবিতাটি। আস্তে আস্তে লিখতে শুরু করলেন :

"Have you not heard his silent steps? He
comes, comes, ever comes.
Every moment and every age, every day and
every night, he
comes, comes, ever comes——......"

বিকেল হতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের কেবিন থেকে বেরিয়ে ডেকের ওপর এসে বসলেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন কত ইংরেজ স্ত্রী-পুরুষ ডেকের ওপর বসে বসে খেলছে বা গল্প করছে। সবাই কেমন প্রাণবন্ত, আত্মনির্ভরশীল। কবির মনে হোল এরা জাতিগর্বে কত গর্বিত, স্বজাতির শক্তিতে কত বিশ্বাসী। এরা জানে যে শুধু জাহাজের ক্যাপ্টেনের কুশলতাই নয়, সমস্ত ইংরেজ জাতির প্রকৃতি-গত উদ্যম ও নিরলস সতর্কতা সবসময়েই তাদের রক্ষার পেছনে রয়েছে। সত্যিই এরা জীবনকে উপভোগ করতে জানে। যখন খেলার বা গল্প করার সময়, তখন এরা তাই করবে। আবার যখন কাজের ডাক আসবে, তখন একাগ্রচিত্তে তাই করবে। যখন উপাসনা করার সময় আসবে, তখন তাতেই মন সন্নিবেশ করবে। আমরা ভারতীয়রা যেন কোন জিনিসই ভাল করে করতে পারিনি। তাই খেলার সময়েও মন দিয়ে খেলতে পারি না, আবার কাজের সময়েও মন বসিয়ে কাজ করতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথকে আরও বেশী মুগ্ধ করে কাজের প্রতি এদের সুষ্ঠুতা-বোধ দেখে। এই যে জাহাজের দেড়শ-দুশো যাত্রী রয়েছে, তাদের আহার-বিহারের আয়োজন যেন চোখের আড়ালে আশ্চর্যভাবে হচ্ছে। তার জন্য কোন গণ্ডগোল নেই, বাইরে কোথাও খাবারের গন্ধও নেই। ড্রাইনিং রুমের টেবিলে বসলে দেখা যায় সবই সুসজ্জিত, প্রস্তুত হয়ে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, ভোজ্যসামগ্রী যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত হয়ে উপচে পড়ছে।

এর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের খাবারের আয়োজনের কথা চিন্তা

করলেই নিদারুণ বৈপরীত্য চোখে পড়ে। সেখানে এখন ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারী নিয়ে প্রায় দুশো লোক থাকে, যাদের চারবেলার খওয়ার যোগাড় করতে হয়। কিন্তু তার জন্য ভোরবেলা থেকে রাত একটা অবধি হাঁক ডাকের অন্ত থাকে না। অথচ তার মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্তও কিছু নেই। আয়োজন যত কম করা হয়, আবর্জনার ভার যেন ততই বাড়ে। ভাতের ফেন, তরকারির খোসা, অন্যান্য উচ্ছিষ্ট কোথায় ফেলা হবে তাই নিয়ে ভাবনার অন্ত নেই। জড় প্রকৃতির ওপর বরাত দিয়ে কোন রকমে দিন কাটানো হয়। আমরা দুঃখ ও অসুবিধা বহন করবো, কিন্তু দায়িত্বের ভার বইতে চাই না।

কিন্তু ইংরেজ জাতি কাজের সুষ্ঠুতাকে স্বাভাবিক বলেই মনে করে। এই সমুদ্রের মাঝেও কোন কিছু ত্রুটিকে ওজর দিয়ে সহ্য করবে না। সব কিছুই যেন নিজেদের দাবীতে সর্বোচ্চ সীমায় টেনে আনতে চায়। ফলে সেই দাবী মেটেও। আর আমাদের যেন দাবী করার সাহসটুকু নেই। কোনক্রমে অভাবের সঙ্গে আপোস করে দিন কাটানোই আমাদের পরম লক্ষ্য। কথায় কথায় আমরা শ্লোক পড়ি, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাতে এই হয় যে সেই অর্ধের মধ্য থেকেও অর্ধ বাদ পড়ে যায় এবং পণ্ডিত নিজের পাণ্ডিত্যের মধ্যেই ক্রমাগত পণ্ড হতে থাকেন।

ডেকের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সব কথা ভাবছেন, এমন সময় আলাপ হোল এক ভারতীয় রেলওয়ে বিভাগের উচ্চপদস্থ বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে। কথাপ্রসঙ্গে ভারতের শিল্পোন্নতির কথা উঠতেই তিনি বললেন, "জানেন, রেলের জন্য চাবি, তালা ইত্যাদি ছোটখাটো জিনিসপত্র আমাদের ইউরোপ থেকে আমদানি করতে হয়। ভারতীয়দের যে সব কারখানা আছে সেখানকার জিনিসের উৎকর্ষতা এতো কম ও দাম এতো বেশী যে পৃথিবীর বাজার দরের কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না।"

"কিন্তু মজুরি কম বলে ভারতে তৈরী জিনিসের দাম অপেক্ষাকৃত-ভাবে কম হবে না?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"মজুরি হচ্ছে জিনিসের মূল্যের এক দিক", ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। "আর একটি দিক হচ্ছে প্রোডাক্‌টিভি। সেদিক থেকে ভারতীয়দের কারখানায় তৈরী মালের উৎপাদনশীলতা খুবই নিচু, ফলে মজুরী কম হওয়া সত্ত্বেও একই কাজের জন্য অনেক বেশী লোককে নিয়োগ করতে হয়, যার ফলে দাম কমার বদলে বাড়তেই থাকে।"

"কিন্তু এখানে বৃটিশরা যে সব কল-কারখানা স্থাপন করেছে তা দেখে ভারতীয় শিল্পপতিরা কিছু শিখছে না?"

"বিশেষ কিছু নয়। ইউরোপীয় কর্তৃত্বে এদেশে যেমন কারখানা চলছে, স্থানীয় লোকদের ওপর তার প্রভাব অতি সামান্য। অনেক সময় এ দেখে আমার মনে হয় এখানে চলছে এক দ্বৈত-রীতি। দুটো ব্যবস্থাই যেন সমান্তরালভাবে চলছে, কিন্তু দূরত্ব একই থেকে গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ইউরোপে যৌথ কারবারের ব্যবস্থা ও আধুনিকতার জন্যও জিনিসের দাম সেখানে কমছে।"

"তা হতে পারে কিন্তু যৌথ কারবার ব্যবস্থা বলেই যে শিল্পের উৎপন্নহার বাড়বে তার কোন মানে নেই", ভদ্রলোক উত্তর দিলেন। "আমি দক্ষিণ ভারতে অনেক দেশীয় কারবারে যৌথ ব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিলুপ্তি দেখেছি। তার প্রধান কারণ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে আনুগত্য ও নিষ্ঠা থাকলে ব্যবসার সাফল্য আসে, তা খুব বেশী লোকের মধ্যে নেই। অধিকাংশই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। ফলে কোন জিনিসই ভালভাবে গড়ে উঠতে পারে না, বা গড়ে উঠলেও বেশীদিন টিকে থাকে না। নিজেদের ভেতর ঝগড়াঝাটি এক নৈমত্তিক কর্ম হয়ে দাঁড়ায়।"

ভদ্রলোক বিদায় নিতেই রবীন্দ্রনাথ ডেক চেয়ারে বসে কথাগুলি ভাবতে লাগলেন। সত্যি, আমাদের দেশে প্রত্যেক জিনিসের

প্রতি আমাদের আনুগত্য এতো কম! মিলেমিশে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে আমরা জানি না। কয়েকদিন পরে অন্তর্দ্বন্দ্ব এসে দেখা দেবেই। আবার কাজ যত ছোট তার আরম্ভের ঘটা যেন তার চাইতে অনেক বেশী। ফলে আয়োজনের থেকে আবর্জনাই বেশী বাড়ে এবং সেই নৌকোয় ফুটো এতো বাড়তে থাকে যে দাঁড় টানার চাইতে জল-ছেঁচতেই বেশী শক্তি ব্যয় হয়।

রবীন্দ্রনাথের হঠাৎ মনে হোল, এই জাহাজের ডেকটি যদি ভারতীয় যাত্রীতে পূর্ণ হোত তাহলে কেমন অবস্থা হোত! প্রথমেই আমরা আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি যেখানে-সেখানে ছড়িয়ে রাখতাম। কেউ বা দাঁতন করা শুরু করতাম, কেউ বা যেখানে খুশি বিছানা পেতে পথ রোধ করে নিদ্রা দিতাম। কেউ বা হুকোর জল ফেরাতাম ও কলকেটা উপুড় করে ছাই ও পোড়া তামাক যেখানে হোক একটা জায়গায় ঢেলে দিতাম, কেউ বা চাকরকে দিয়ে শরীর দলিয়ে সশব্দে তেল মাখতে বসতাম। ঘটিবাটি জিনিসপত্র কোথায় কী পড়ে থাকত তার ঠিকানা পাওয়া যেত না ও ডেকের মধ্যে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির অন্ত থাকতো না। এর মধ্যে কেউ যদি নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করত তাহলে অত্যন্ত অপমানবোধ করতাম ও মহা রাগারাগির পালা শুরু হোত।

তারপরে অন্য লোকের যে লেখাপড়া কাজক থাকতে পারে, কিংবা মাঝে মাঝে যে অবসর সময় কাটাতে পারে, সে সম্বন্ধে কারও বিন্দুমাত্র চিন্তাভাবনা থাকত না। হঠাৎ দেখা যেত যে বইটা পড়ছি, সেটি আরেকজন টেনে নিয়ে পড়ছে, আমার দূরবীনটা আর পাঁচ জনের হাতে হাতে ফিরছে। অনায়াসেই আমার টেবিলের ওপর থেকে খাতাটা টেনে নিয়ে কেউ পড়ছে, বিনা আহ্বানে আমার ঘরের ভেতর ঢুকে গল্প জুড়ে দিচ্ছে বা সময়-অসময় বিচার না করেই উচ্চস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে—কণ্ঠে সুর থাকুক বা না থাকুক। যেখানে যেটা পড়ে আছে, সেটা সেখানেই পড়ে থাকত। যদি ফল খেতাম, তাহলে তার খোসা ও বিচি ডেকের ওপরেই ছড়ানো

থাকত এবং ঘটিবাটি চাদর মোজা গলাবন্ধ হাজার বার করে খোঁজা-খুজি করতেই দিন যেত। আসলে আমরা কেউ নিয়মকে মানতে চাই না। ভুলে যাই যে শক্তি কর্মের মধ্যে নিয়মকে মেনে সফল হয়, সেই শক্তি আমোদ-আহ্লাদের মধ্যেও নিয়মকে রক্ষা করেই তা সরস ও সুন্দর করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথের এসব চিন্তা কিন্তু বেশীক্ষণ চলল না। ওদের সঙ্গে এই সময়ে শান্তিনিকেতনের একটি ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য আমেরিকার পথে রওনা দিয়েছিল। ভীষণ চঞ্চল। ওর ব্যবহারের জন্য সবাইকে কিছুটা সশঙ্কিত হয়ে থাকতে হোত।

রথী এই সময়ে এসে বলল, "বাবামশায়, দেখুন ও খালি পায়ে ডেকের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর সবাই কি রকম অস্বস্তিবোধ করছে।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "ঠিক আছে, আমি ওকে বলছি যে এ বীরভূমের লাল মাটি নয়, এ শক্ত কাঠের পাটাতন, খালি পায়ে হাঁটলে পা পিছলে যাবার সম্ভাবনা আছে।"

শুধু খালি পায়ে হাঁটাই নয়, একদিন ওদের সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসে কাঁটা-চামচকে খেলার সামগ্রী হিসেবে গ্রহণ করল। তাই নিয়ে হাতে করে সে খেলতে শুরু করল।

রবীন্দ্রনাথ ওকে বোঝালেন, "তুমি মেধাবী ছাত্র, আমেরিকার এক নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছ। মেধাবী না হলে কী ওরা তোমাকে নিতো! কিন্তু বিদেশে আমরা প্রত্যেকেই নিজেদের দেশের প্রতিনিধি। আমদের আচার-ব্যবহারের মধ্য দিয়েই বিদেশীরা আমাদের দেশকে বিচার করবে। সে ক্ষোভ আমাদের টেবিল্ ম্যানারস্থেকে আরম্ভ করে সে দেশের সব রকম সামাজিক রীতিনীতিই মেনে নেওয়া উচিত। কাঁটা-চামচ খাবার জন্য, খেলার জন্য নয়।"

রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে সে তখনকার মতো নিবৃত্ত হোল।

কিন্তু চঞ্চলতা অল্পবয়সের দোষ, কিছুতেই যেতে চায় না।

সে-ই একদিন দুপুরবেলায় রবীন্দ্রনাথের কেবিন থেকে এক বৃটিশ ভদ্রমহিলার আম চুরি আবিষ্কার করল! কবি ভীষণ আম খেতে ভালবাসেন, বলে রথী বোম্বাই থেকে এক ঝুড়ি 'আল্‌ফান্‌সো' আম কিনে এনে তাঁর ঘরে রেখে দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের কেবিনের পাশ দিয়ে গেলেই তার সুবাস সবারই নাকে আসত। একদিন দুপুরবেলা তিনি বিছানায় শুয়ে একটু চোখ বুজেছিলেন। কেবিনের দরজা ছিল খোলা। পাশ দিয়ে এক ইংরেজ ভদ্রমহিলা যখন যাচ্ছিলেন, সেই আমের তীব্র গন্ধে তিনি আর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। উঁকি মেরে দেখলেন যে রবীন্দ্রনাথ উল্টো দিকে কাত হয়ে শুয়ে আছেন। তখন টেবিল থেকে টুক করে একটি আম তুলে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

এ সবই সেই ছেলেটির বর্ণনা। সে নাকি সচক্ষে এটি দেখেছে। রথী ও প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও এটি হেসে উড়িয়ে দিলেন।

কবি ঠাট্টা করে বললেন, "তবে ছাখো, আমের এমন মধুর গন্ধ আছে যে তার টানে লোকে খারাপ কাজ যেমন করে ভাল কাজও তেমনি করে। আম্রপালিও তার জীবন পরিবর্তন করল শুধু বুদ্ধের উপদেশেই নয়, তার নিজের নাম-মাহাত্ম্যেও। তবু তো এগুলি আলফানসো আম, যদি মালদার ল্যাংড়া আম হোত, তাহলে ভদ্র-মহিলাকে যে কতবার আসতে হোত তার ঠিক নেই।"

রথী প্রতিমাকে আড়ালে বলল, "আমি ওর কথা একটুও বিশ্বাস করি না। বাবামশায় ওর সব দোষ স্নেহের হাসি দিয়ে ঢেকে রাখতে চান, কিন্তু ওর আচরণে বেশী বিব্রত বোধ করি আমরাই।"

প্রতিমা বলল, "আর কটা দিন। ওতো আর আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে উঠছে না।"

"ভাগ্যিস উঠছে না, নইলে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় কতদিন থাকতুম তা বলা যায় না।"

"তোমার সব তাতেই একটু বাড়াবাড়ি।"

রথী বিছানায় ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, "একটু না হয় বাড়াবাড়ি হলই। সবকিছু যে মেপেজোপে করতে হবে তার কোন অর্থ নেই।"

প্রতিমা একটু মুচকি হেসে বলল, "শিলাইদহে তোমার চাষের মতো? সেইবার এতো সার দিয়েছিলে যে সব চারাই মরে গেল।"

রথী একটা বড় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। প্রতিমা খুব দুর্বলস্থানে আঘাত করেছে। সত্যি কত আশা ছিল যে আমেরিকা থেকে শেখা কৃষিবিদ্যা ও সেখান থেকে আনা বীজ দিয়ে সেও শিলাইদহের মাঠে অবিশ্বাস্য ফসল ফলাবে। তা না আস্তে আস্তে সব চারা মরে গেল। এ দেশ আবার কোনদিন শস্য শ্যামলা হবে কিনা তাই নিয়ে তার মাঝে মাঝে খুবই সন্দেহ হয়।

জাহাজ যখন লোহিত সমুদ্রের ভেতর দিয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ একদিন রবীন্দ্রনাথের যেন প্রকৃতির সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের আনন্দরূপ দর্শন হোল। ডেকের রেলিং ধরে সকালবেলায় দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে কবি দেখলেন যে আকাশে পাণ্ডুর নীল ও সমুদ্রের নিবিড় নীলিমার মিলনের মধ্যে দিয়ে তাঁর ললাট যেন ঈশ্বরের মাধুর্যের প্রসাদে অভিসিক্ত হোল। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য যেন তাঁর অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করলেন, তার মন যেন এই মুহূর্তে গান গেয়ে উঠল, "না না, এ শুধু বর্ণ বা গন্ধ নয়, এই তো তাঁর বিশ্বব্যাপী প্রসাদের ধারা।"

আকাশ ও সমুদ্রের মাঝখানে প্রভাতের আলোকে এই যে অনির্বচনীয় মাধুর্য স্তরে স্তরে দিকে দিকে বিকশিত হচ্ছে, এই হচ্ছে আনন্দ, এই হচ্ছে ঈশ্বরের প্রসাদ। এই আনন্দই দেশে দেশে কালে কালে অগণ্য প্রাণীর প্রাণ জুড়িয়েছে, মন হরণ করেছে, কবিকে প্রেরণা জুগিয়েছে, শিল্পীকে নতুন সৃষ্টি করার স্বপ্ন জাগিয়েছে, জননীর হৃদয় স্নেহে দ্রবীভূত করেছে, প্রেমিকের চিত্ত প্রেমে ব্যাকুল করেছে।

সীমার মধ্যে অসীমের এই লীলা যে কতলোককে কত ভাবে অনু-প্রাণিত করেছে তার যেন অন্ত নেই।

এই হচ্ছে আনন্দরূপমমৃতম্। রূপ এখানে শেষ কথা নয়, মৃত্যু এখানে শেষ অর্থ নয়। এ হচ্ছে রূপের মধ্যে দিয়ে আনন্দে পৌছনো, মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অমৃতে উৎসরণ। আমাদের অন্তর্নিহিত সত্য ও আনন্দ দিয়ে যখন জগতের দিকে তাকাই, তখন আমরা দেখি যে সময়ের এই তরঙ্গিত সমুদ্রে, এই প্রবাহিত বায়ু, এই প্রসারিত আলোক, এ আর বস্তু নয়, সমস্তই আনন্দ, সমস্তই ঈশ্বরের লীলা, এর সমস্ত অর্থ ঈশ্বরের কাছেই নিহিত আছে, আমরা যার অর্থ বুঝি না, এই আকাশপ্লাবী আনন্দের সহস্রলক্ষ ধারা যেখানে এক মহাস্রোতে মিলিত হয়ে তারই হৃদয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেখানে যদি মুহূর্তকালের জন্য আমরা দাঁড়াতে পারি তাহলেই এই সমস্ত কিছুর অর্থ পরম পরিণামকে দেখতে পেতাম। এই যে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য অপরিসীম সত্য, এই যে অপরিসীমের আনন্দ কেবল মাটি বা জল নয়, আসলে এ হচ্ছে ঈশ্বরের প্রসাদ, তার প্রকাশ, সে আমাদের স্পর্শ করে বেষ্টন করে, চৈতন্যের তারে তারে সুর বাজায়, আমাদের মনকে বিশ্বের নানা দিক দিয়ে ডাক দেয়, আমাদের পলে পলে যুগ-যুগান্তরে পরিপূর্ণ করে। তার শেষ নেই, কুল নেই, অন্ত নেই তবু সে এক, আনন্দময় অমৃতময় এক।

রবীন্দ্রনাথের খেয়াল নেই কখন রথী ও প্রতিমা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে। কবি যখন প্রকৃতির ধ্যানমগ্ন থাকেন তখন ওরা তাকে বিরক্ত করে না। রবীন্দ্রনাথ ওদের দেখে মৃদু স্বরে বললেন, "আজ সকালে প্রকৃতির মধ্যে যেন নতুন কোরে ঈশ্বরের আনন্দরূপ দেখতে পেলুম। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল যখন সদর স্ট্রীটে থাকতে একদিন সকালবেলায় ঈশ্বরের আর এক আনন্দরূপ দেখেছিলুম। সেই সেই উপলব্ধি থেকেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ কবিতাটি লিখেছিলুম।"

"সে কবিতাটি আমাদের শান্তিনিকেতনের সব ছাত্রেরই মুখস্থ, রথী একটু হেসে বলল। আমেরিকায় থাকতে আমি ও সন্তোষ মজুমদার কতদিন নির্জন মাঠে চিৎকার করে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করেছি। সত্যি, বাবামশায়, সন্তোষ এতো সুন্দর আবৃত্তি করে!"

"সে আমি জানি ও যখন 'বিসর্জন' নাটকে গোবিন্দমানিক্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল। আর আশ্রমের পেছনে ওর আত্মত্যাগ তো কম নয়। শুধু ও-ই নয়, কত লোকেই শান্তিনিকেতনের বৃদ্ধি ও কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগ করেছে তা ভাবলেও কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে যায়। তোমরা তো জানো উনিশশ এক সালে যখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রেবাচাঁদ ও পাঁচ-ছটি ছাত্র নিয়ে বোলপুরে আসেন, তখন থেকেই বলতে গেলে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়! তারপর এক বছরের মধ্যেই ওরা বিদায় নিলেন। তখন তোমার মাষ্টার মশায় মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আশ্রমের প্রধান হলেন। তিনিও এক বছরের মধ্যে চলে গেলেন। তারপর এলো সতীশ রায়। সতীশের সাহায্য না পেলে তখন শান্তি-নিকেতনের স্কুল ধরে রাখা কঠিন হোত। তারপরে এলেন মোহিত সেন এক বছরের জন্য। যতদিন না অজিত চক্রবর্তী ও ক্ষিতিমোহন সেন এলো, ততদিন যেন আমাদের বিদ্যাশ্রম খুঁড়িয়েই চলল। শান্তিনিকেতনের জন্য এদের আত্মত্যাগও তো কম নয়।"

রথী আস্তে আস্তে বলল, "ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়কে আমার খুব মনে পড়ে। কী তেজস্বী পুরুষ ছিলেন! আচ্ছা উনি হঠাৎ শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে গেলেন কেন?"

"ব্রহ্মবান্ধবের জীবন বড়ই বিচিত্র। প্রথমে নববিধান ব্রাহ্ম ছিলেন, তারপরে হলেন প্রোটেস্ট্যাণ্ট খৃষ্টান। পরে আবার হলেন রোমান ক্যাথলিক। তাও ভাল লাগলো না, আমাদের কাছে যখন এলেন তখন তিনি গোঁড়া হিন্দু। বলেন যে আমাদের সব পাপের জন্য গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। আসলে তাঁর মন

তখন রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছে। তাই কলকাতায় গিয়ে 'সন্ধ্যা' পত্রিকা বার করে জেলেও গেলেন, সেখানেই তাঁর অকাল মৃত্যু।"

প্রতিমা এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল, এখন বলল, "কিন্তু শান্তিনিকেতনে মেয়েদের বোর্ডিং স্কুলটি উঠে গেল, এটা ভাবতেও আমার খারাপ লাগে।"

"তুমি তো জানো বৌমা যে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমি দুবছর সেটি চালিয়েছিলুম। কিন্তু আর পারলুম না। দেখি ফিরে এসে আবার এটি চালু করতে পারি কিনা তখন তুমিও এর ভার কিছুটা নিতে পারবে।"

প্রতিমা মাথা নিচু করে রইল। সে জানে রথীর মতো তার পরেও বাবামশায়ের অনেক আশা যে ইউরোপ থেকে ঘুরে এসে তারা শান্তিনিকেতনের গুরুভার আরও বেশী করে বহন করবে।

রথী অন্য প্রসঙ্গে যাবার জন্যই যেন বলল, "বাবামশায়, আমেরিকা থেকে ফিরে এসে আমার সবচেয়ে বিস্ময় জেগেছিল আপনার 'গোরা' উপন্যাসটি পড়ে। আমার এখনো মনে পড়ে 'প্রবাসী'র সমস্ত পুরোনো সংখ্যা যোগাড় করে কি রকম গোগ্রাসে সব পড়ে ফেলেছিলুম। জানতুম না কখন কিভাবে এর শেষ হবে। বললে আপনি ভীষণ লজ্জা পাবেন, কিন্তু এমন উপন্যাস যে বাংলা-ভাষায় লেখা সম্ভব তা ভাবতে পারিনি। আপনাকে অনেকদিন জিজ্ঞাসা করবো ভেবেছি, এ কাহিনীর প্রেরণা আপনি কোত্থেকে পেলেন? এটি এমন আন্‌ইউজ্যাল্ প্লট্!"

"জানিনা তোমাদের কোনদিন বলেছি কিনা যে সিস্টার নিবেদিতা যখন শিলাইদহে বেড়াতে এলেন, তখন একদিন আমাকে গল্প বলার জন্য ধরলেন। মুখে মুখে তখন একটি গল্প তৈরী করে বললুম, অনেকটা গোরার মতো, যে নিবেদিতার মতোই জাতিতে আইরিশ, কিন্তু ভারতবর্ষকেই আপনার দেশ বলে জেনেছে। কিন্তু এই চরিত্রের মধ্যে হ্যামারগ্রেন্-এর ছায়াও পড়েছে। তোমরা তো

জানো সুইডিশ যুবক হ্যামারগ্রেন রামমোহন রায়ের জীবন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসেছিলেন এবং অল্পবয়েসে অনেক কষ্টের মধ্যে এ দেশেই প্রাণত্যাগ করেছিলেন। অথচ তাঁকে যখন হিন্দু-মতে শ্মশানে দাহ করা হয়, তখন এ নিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যে অনেক হৈ-চৈ হয়েছিল। আমি এই উপন্যাসের মধ্যে সেই হিন্দুত্বের গোঁড়ামিকেও যেমন আঘাত করতে চেয়েছি, তেমনি পানুবাবুর চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মধর্মের গোঁড়ামিতেও আঘাত করেছি। সমস্যা এ নয়যে কে কতখানি হিন্দু বা ব্রাহ্ম। আসল সমস্যা হচ্ছে এই 'জাতে'র, ধর্মের বাঁধা ভেঙে কিভাবে লোকে নিজেদের মানুষ বলে পরিচয় দেবে এবং সত্যিকারের মানুষের ধর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।"

রথী ও প্রতিমা মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি শুনছিল। প্রতিমা বলল, "আপনি আমাদের বিয়ের উপলক্ষ্য করে ওকে বইটি উৎসর্গ করেছিলেন, কিন্তু আমি তখনপড়ে খুব ভাল বুঝতে পারিনি। তারপর কতবার পড়েছি যে তার ঠিক নেই। সুচরিতা, ললিতা, এদের চরিত্র আমার এতো ভাল লাগে! সবচাইতে ভাল লাগে পরেশবাবুর চরিত্র, পড়ার সময় বার বার আপনারকথা মনে পড়ত।"

রবীন্দ্রনাথ সশব্দে হেসে উঠলেন। "কেন বৌমা, আমি তো অনেকবার বলেছি যে আমার লেখার মধ্যে আমাকে তোমরা খুঁজো না। আমি তো কোন চরিত্রেই দেখাইনি যে সে হতভাগ্য অর্শের ব্যথায়কষ্ট পাচ্ছে আর তার পুত্রবধূর সেবার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে!"

"ওসব কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না বাবামশায়। অপনার সেবা আমি কতটুকুই বা করতে পারি বা কতটুকুই করতে দেন।"

সবাইকেই সেই আলোচনা বন্ধ রেখে তখন উঠে পড়তে হোল। খাবার ঘণ্টা বেজে গেছে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে গেলে আর কোন খাবার পাওয়া যাবে না, তখন শুধু ফল খেয়েই থাকতে হবে।

জাহাজ যখন সুয়েজ খালের মধ্যে প্রবেশ করল তখন রাত অনেক। সকাল থেকে প্রায় সারা দিন ধরেই সে জাহাজ ধীর গতিতে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলল। রবীন্দ্রনাথ ডেকের রেলিং ধরে প্রকৃতির অপূর্ব শোভা দেখছিলেন। চারদিকের বালির সমুদ্র রদ্দুরে চিক্ চিক্ করছে। দূরের পাহাড়ের ওপর রৌদ্রছায়ার মায়া-জাল বেছানো। ঘন নীল সমুদ্রের প্রান্তে বালুকাতীরের রৌদ্র-দুঃসহ গাঢ় পীত রেখা। দুধারে তরুহীন বালি। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট কোঠাঘর গোটাকয়েক গাছপালায় বেষ্টিত হয়ে যেন ইসারা করে যাত্রীদের ডাকছে।

ভূমধ্যসাগরের প্রথম ঘাট পোর্ট সৈয়দ। এখান থেকেই ইউরোপের পারে পাড়ি দিতে হবে। সন্ধ্যের সময় ওরা ওখানে পৌঁছলেন। জাহাজ বন্দরে ভিড়তেই অসংখ্য ছোট ছোট নৌকা ও মোটর-বোট ঝাঁকে ঝাঁকে এসে জাহাজ ঘিরে ধরল। অনেকেই সেই সব নৌকো বা বোটে উঠে শহর দেখতে চলল। রবীন্দ্রনাথ আর তা করলেন না। জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের ভিড় দেখতে লাগলেন।

পোর্ট সৈয়দ থেকে অনেক যাত্রী উঠল। তাদের প্রায় সবাই ফরাসী, ফ্রান্সের মার্সেই বন্দরে নেমে পড়বে। দেখতে দেখতে জাহাজের ডেক মানুষের ভিড়ে ভর্তি হয়ে গেল। তার মধ্য দিয়ে তখন গা-বাঁচিয়ে চলাই বিষম দায়।

পরের দিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ ওপরের ডেকে বসে যাত্রীদের চাঞ্চল্য দেখতে লাগলেন। এই ইউরোপীয়রা যেন চুপ করে এক জায়গায় বসে থাকতে পারে না, সব সময়েই একটা কিছু করা চাই। তাই তাদের শান্ত করার জন্য নানা রকম খেলার আয়োজন করা হয়েছে। ছেলে-বুড়ো সবাইকে সেই খেলার আনন্দে মত্ত থাকতে হবে এটাই যেন স্বাভাবিক, স্বভাবসংগত। এই উদ্যম শুধু ক্রীড়াক্ষেত্রেই নয়, কর্মক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রসারিত। শক্তির এই

প্রাচুর্যই যেন নব নব সৃষ্টির মধ্যে প্রসারিত। এরা যেন কী জীবনে কী বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে-সাহিত্যে কোথাও কোন সীমা মানতে চায় না, দুর্ভেদ্যের রুদ্ধ দ্বারে অহোরাত্র প্রবল বেগে আঘাত করে চলেছে।

মার্সেই বন্দর থেকে ওরা একদিনের জন্য প্যারিস দেখতে ছুটলেন। পথে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মনে হচ্ছে এই একদিনের জন্যই প্যারিস দেখা আমার কপালে আছে। প্রথমবার যখন ইংলণ্ডে এসেছিলুম, সেবারও সেখানে যাবার মুখে এমনি একদিনের জন্য প্যারিস দেখেছিলুম, আবার দ্বিতীয় বারও সেই যাবার মুখে একদিনের জন্য দেখা।"

"প্রথমবার কী কী দেখেছিলেন?" রথী জিজ্ঞাসা করল।

"সেবার প্যারিসে সেই বিখ্যাত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হচ্ছিল যা ভাল করে দেখতে অন্তত একমাস সময় লাগে। বুঝতেই পারছো তার কতটুকু দেখতে পেরেছি। দ্বিতীয়বার কিন্তু একটি সুন্দর জিনিস দেখেছিলুম। আইফেল টাওয়ার, যার তৈরী ঠিক তার আগের বছরই শেষ হয়েছিল। ওখানে উঠে গোটা প্যারিস শহরই দেখতে পাওয়া যায়।"

"আমরা হোটেলে উঠে সেখানেই তাহলে প্রথম যাবো", রথী বলল।

সেই কথা মতো প্যারিসের একটি হোটেলে উঠে দুপুরবেলায় ওরা শহর দেখতে বেরোলেন। আইফেল টাওয়ারের চূড়ায় উঠে প্রতিমার মাথা ঘুরতে লাগল, সে তাড়াতাড়ি অবসারভেশন ডেকের একটি বেঞ্চিতে বসে পড়ল। রবীন্দ্রনাথ সেখানে আগেই বসে-ছিলেন, হেসে বললেন, "কী বলিনি যে এখান থেকে গোটা প্যারিস-কেই দেখা যায়?"

"ভাবতে পারিনি এটি এত উঁচু", প্রতিমা উত্তর দিল।

রথী বলল, "গাইডের কাছে প্রশ্ন করে জেনেছি যে এর উচ্চতা হচ্ছে প্রায় এক হাজার ফিট। এই হচ্ছে পৃথিবীর সব চাইতে উঁচু টাওয়ার।"

ওখান থেকে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে সাঁজ এলিজ্-এর কাছে এসে পড়লেন। এমন সুন্দর বুলেভার্ড বোধহয় পৃথিবীতে নেই। দুদিকে গাছের সারি, তার পেছনে সব সারি সারি সজ্জিত দোকান, মধ্যিখান দিয়ে বিরাট ঝকঝকে চওড়া রাস্তা।

'আর্চ অফ্ ট্রিয়ম্ফ্' দেখার পর রবীন্দ্রনাথ বললেন, "চলো, নত্যর ড্যম্ গীর্জা দেখে আসি। রথী, মনে আছে ভিক্টর হুগোর সেই 'হাঞ্চ ব্যাক অফ্ নত্যর ড্যম্' কাহিনী যা শিলাইদহে থাকতে তোমাদের ছেলেবেলায় পড়িয়ে শুনিয়েছিলুম? অনেকেই বলে এটি একটি সত্যি ঘটনার ছায়া অবলম্বনে লেখা।"

আবার ট্যাক্সি করে ওরা সিন্ নদী পার হয়ে ওপারে গেলেন।

শহরের মাঝখান দিয়ে এই নদী এঁকে বেঁকে গেছে, যেন বিশাল নগরীর প্রাণদাত্রী। সিন নদীকে ছাড়া প্যারিস শহর ভাবা যায় না। নদীর দুপাড়েই বড় বড় গাছের ছায়া, ভেতর দিয়ে অসংখ্য বার্জ, বজরা নৌকো, জেলেদের বোট, সবই বয়ে চলেছে। আর কত ব্রিজ! কয়েক হাত অন্তরই একটা ব্রিজ দিয়ে দুপারকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। নদীর দুপাশের রাস্তা ও অনেক ব্রিজের ওপর দিয়ে দ্রুতগতিতে ভীষণ শব্দ করে দোতলা ট্রাম গাড়ি চলেছে, তার সঙ্গে আছে গাড়ি, বাস, ট্যাক্সি ও অশেষ পদযাত্রী। সমস্ত শহর এই নদীকে ঘিরে দিনের বেলায় যেমন কর্মব্যস্ত, রাতের বেলায় তেমনি প্রমত্ত।

প্যারিসের 'লেফ্ট্ ব্যাঙ্ক্' ঘুরে বেড়াতে কবির সবচাইতে ভাল লাগল। এখানকার 'লুক্সেনবার্গ গার্ডেন' সেই শহরের একমাত্র রেনেসাঁস বাগান। এই উদ্যানের 'মেডিসি ফাউন্টেন'-এর সামনে দাঁড়িয়ে কবি দেখলেন লেখা আছে যে এটি সলোমন ড্য ব্রসি কর্তৃক

তৈরী হয়েছিল নৃপতি চতুর্থ হেনরীর বিধবা মেরী ভ মেডিসির সম্মানার্থে।

এস্‌প্লানেড-এর পার্ক দিয়ে এগিয়ে এসে 'কোর্ট অফ্‌ অনার্‌' পেরিয়ে ওরা নেপোলিয়ানের কবর দেখতে চললেন। এত বড় পৃথিবী-বিখ্যাত বীর, সাম্রাজ্য-বিজয়ী নরপতি আজ মাত্র পাঁচ ফুট জায়গার মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন। জীবন যে অনিত্য, সব বিজয়ই যে কালের গর্ভে ধূলিকণাতে পরিণত হয়, তাই যেন এই সমাধি আর একবার সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল শেক্‌স্‌পীয়ারের সেই বিখ্যাত দুটি লাইনঃ "O mighty Caesar, hast thou sunk so low ? Are all thy thri- thmps, conquests shrunk to this small measure ?"

এই সবার ওপরে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোটের আকৃতি 'আইল্‌ ভ লা সিটি' যেখানে অবস্থিত নত্যর ডম ক্যাথিড্রাল। এর দুই টাওয়ার এবং রোমান ও গথিক স্থাপত্যের সংমিশ্রণ যেন শতাব্দীর গাম্ভীর্য ও আকুতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ ভেতরে ঢুকে দেখতে লাগলেন চার্চের বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত স্টেইন গ্লাসের জানলাগুলি, যেখানে বিকেলের মোলায়েম রোদের আলো এসে এক অপূর্ব মায়াজাল সৃষ্টি করেছে।

শুধু ওরাই নয়, বিভিন্ন দেশ থেকে নানা ট্যুরিস্টের ভিড়ে সেই বিশাল হলঘর প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু অত মানুষের ভিড়েও সেখানে কোন কলরব নেই। সবাই শান্ত মনে জানালায় আঁকা ফ্রেস্কো দেখছে বা হাটুগেড়ে ক্রুসবিদ্ধ যীশুর মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে। অনেকেই রঙিন মোমবাতি জ্বালিয়ে তার আলোর পাশে সমাহিত অবস্থায় ধ্যান করছে।

গির্জা থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের মন পথের ক্লান্তি ভুলে এক অপার্থিব প্রশান্তিতে ভরে গেল। এইরকমই তাঁর হয়। কোন চার্চ বা ধর্মমন্দিরে গেলে ঈশ্বরের প্রতি নীরব প্রার্থনায় তাঁর প্রাণ

এত ব্যাকুল হয়ে পড়ে যে ক্ষণকালের জন্য তিনি স্থান-কাল সব ভুলে যান।

রথী ও প্রতিমার দিকে তাকিয়ে কবি বললেন, "এসো, সিন্ নদীর পাড় দিয়ে একটু হাঁটি।"

নদীর দুপাশে সবুজ ঘাস। পাশে রাস্তা, অনেক স্থানই বাঁধানো। গ্রীষ্মকাল পড়ে গেছে, তাই পথে ঘাটে সব জায়গাতেই মানুষের ভিড়। তারপর সেদিন ছিল খুব উজ্জ্বল দিন। কত লোক নদীর পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে, বাচ্চাদের প্যারাম্বুলেটরে করে ঠেলে নিয়ে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথ একটি বেঞ্চিতে বসে পে বললেন; "আমি যখন ছোট ছিলুম, তখন কলকাতা ও তার আশপাশে হুগলি নদীর পাড়েও ঠিক এমনি করে বেড়ানো যেত। তারপর তার দুধার দিয়ে সব জুটমিল তৈরী হোল। গানিব্যাগের হাতেই আমরা যেন গঙ্গার সব সৌন্দর্য বিসর্জন দিলুম।"

ওরা সবাই একটু বিশ্রাম করার পর রথী বলল, "বাবামশায়, একটা বোট ভাড়া করি, এরা সিন্ নদীর দুপাশ ঘুরিয়ে দেখায়।"

"ঠিক আছে। এতো সুন্দর দিন, তাড়াতাড়ি হোটেলে ফিরতে ইচ্ছে করছে না।"

তাই করা হোল। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন সিন্ নদী হচ্ছে এই সহরের প্রধান ধমনী। বিরাট বিরাট বার্জ নদীর ভেতর দিয়ে নানান পশরা নিয়ে যাচ্ছে যা এখানকার সব বাজারের প্রধান যোগান। চারদিকে কতরকম ফুলের মেলা। তার মধ্যে যত্ন করে অনেক ঝোপেঝাড়ে বুনো ফুল রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে প্রকৃতির অচেতন স্পর্শও যেন লেগে থাকে।

কবি দেখলেন নদীর দুপারে বসে অনেক লোক বর্শি দিয়ে মাছ ধরছে। কিন্তু এ নদীতে সব ছোট ছোট মাছ পাওয়া যায়।

এরা লাভের জন্য ততটা নয়, যতটা বাইরের মুক্ত হাওয়ায় সময় কাটানোর জন্য ছিপ হাতে নিয়ে বসেছে।

বোটে করে বেড়ানোর পর ওরা প্যারিসের বিখ্যাত লুভ্‌র্‌ মিউজিয়াম দেখতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথের মনে হোল, এ মিউজিয়াম ভাল করে দেখতে বোধ হয় এক মাস সময় লাগে। কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে আসছে, হোটেলে ফেরার সময় হয়ে এসেছে।

সন্ধ্যাবেলায় ডিনার খাওয়ার পর ওরা আবার ট্যাক্সি করে প্যারিস শহর ঘুরতে বেরোলেন। রাতের আলোকজ্জ্বল প্যারিসকে দেখে মনে হয় সত্যিই এ হচ্ছে আলোর নগরী, 'সিটি অফ্‌ লাইট্‌'। গ্রাণ্ড ব্যুলেভার্ড-এর ভেতর দিয়ে যেতে যেতে রাস্তায় লোকের ভিড় দেখে ওদের মনে হোল রাত্রেও এ শহরের কর্মব্যস্ততার কোন কমতি নেই, দিনের মতই এ শহর হচ্ছে গুঞ্জনমুখর।

কিন্তু বেশী রাত করে আর ঘোরা হোল না। কালকে সকালেই ক্যালে রওনা দিতে হবে, সেখান থেকে বোটে করে ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ডোভার হয়ে লণ্ডন পৌঁছতে হবে। তারপর সবারই শরীর ভীষণ ক্লান্ত, সারাদিন ছুটোছুটি করে একদিনে প্যারিস দেখার ধকল কম নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আবার একদিন প্যারিসে আসা হবে। তখন হয়ত ভাল করেই 'ইউরোপের প্রমোদকেন্দ্র' এই শহরের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করা যাবে।

ক্যালে থেকে ফেরির জাহাজে করে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন, তখন জাহাজের মধ্যে আবার ইংরেজী কথাবার্তা শুনে তাঁর খুব ভাল লাগল। মনে হোল যেন স্বজাতীয়-দের মধ্যে তিনি ফিরে এসেছেন। কবি বুঝলেন ইংরেজী ভাষা ভারতীয়দের রক্তের মধ্যে কী রকম মিশে যাচ্ছে, বিদেশ-বিভূঁয়ে অন্য ভাষা শুনতে শুনতে যতক্ষণ না আমরা ইংরেজী ভাষা শুনি, ততক্ষণ যেন হাঁপিয়ে উঠি, প্রাণ আই-ঢাই করে। রবীন্দ্রনাথের মনে হোল যদি কোনদিন ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ জাতি বিদায়ও

নেয়, তাহলেও ইংরেজী ভাষা অনেককাল বজায় থাকবে, শুধুমাত্র বিভিন্ন ভাষাভাষী প্রদেশগুলির মধ্যে ঐক্যসূত্র স্থাপনের জন্যই নয়, ভারতের বাইরে বিদেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর বাহন হিসেবেও বটে। ইংরেজ-বর্জিত ভারতবর্ষে ইংরেজী ঠিকই বহাল-তবিয়তে থাকবে।

॥ দুই ॥

রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে লণ্ডনে পৌঁছলেন সন্ধ্যেবেলায়। সেখানেও তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য কেউ উপস্থিত ছিল না। যদিও কবি আগের বার লণ্ডনে এসে চারমাস কাটিয়ে ছিলেন। কিন্তু বাইশ বছর পরে এসে এ শহরকে তাঁর একেবারেই অচেনা মনে হোল। দেখলেন রাস্তায় লোকের ভিড় অনেক বেড়েছে, আর বেড়েছে মোটর গাড়ির সংখ্যা। ঘোড়ার গাড়িরাপ্রায় অদৃশ্য। ঠিক তেমনি নিঃশেষ হয়েছে গ্যাসের বাতি। এখন রাস্তার মোড়ে সব ইলেক্‌ট্রিকের আলো। লোক-চলাচলের জন্য এক নতুন জিনিস তৈরী হয়েছে—আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেন, এরা যাকে বলে 'টিউব'।

ট্রাভেল্‌ এজেন্ট টমাস কুক্‌ কোম্পানী ঠাকুরদের জন্য ব্লুম্‌স্‌বেরী হোটেল ঠিক করেছিল। চেরিং ক্রস্‌ থেকে ব্লুম্‌স্‌বেরীতে ওরা এই 'টিউব'-এ যাওয়াই ঠিক করলেন। কিন্তু সব মোটঘাট নিয়ে অপরিচিতপরিবেশ এবং একেবারেই অপরিচিত আণ্ডারগ্রাউণ্ডস্টেশন দিয়ে রাত্রিবেলায় যেতে সবাই তখন হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিল।

সবচাইতে নাজেহাল হয়েছিল বোধহয় রথী। তার হাতে একটি বড়ো ব্যাগ ছিল যার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে তাঁর 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের খাতাটিও ভরা ছিল। অতো অচেনা পরিবেশ ও লটবহরের মধ্যে রথী যখন ব্লুম্‌স্‌বেরীতে

নামল, তখন তার সিটের কাছে সেই ব্যাগ যে রয়েই গেল, তার সে খেয়াল নেই !

পরের দিন ভোরবেলায় হোটেলের ডাইনিং হলে সবাই ব্রেক্‌ফাস্ট খেতে নেমে এলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য প্রতিমা অর্ডার দিল হাফ-বয়েল ডিম, টোস্ট, পাশে মাখন ও মার্মালেড, আর বড়ো এক পটের চা।

চা-র কাপ কবির দিকে এগিয়ে দিয়ে ও জিজ্ঞাসা করল, "বাবা মশায়, কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়েছিল তো ?"

"না, সত্যি বলতে কী, চোখের পাতা ভাল করে বুঝতে পারিনি কাল রাত্রে। অচেনা জায়গা, তারপর রাস্তার আলো চোখের পরে লেগেছে, অনেকবার তন্দ্রা এসে ভেঙে গেছে। এক সময় জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি আকাশ আস্তে আস্তে পরিষ্কার হতে আরম্ভ করেছে। বুঝলুম ভোর হতে বেশি দেরী নেই, তখন স্নান সেরে একটু ধ্যান করে নিলুম।"

প্রতিমা বলল, "আমি হোটেলের অফিসে বলে আসব আপনার ঘরের জানালায় একটা ভারী পর্দা টাঙিয়ে দিতে।"

রথী জিজ্ঞাসা করল, "বাবামশায়, আজ কী করবেন ?"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "এই শহর এখন আমার কাছে একেবারেই অপরিচিত। বাইশ বছর আগে এসেছিলুম সত্যি, কিন্তু সেই সময়কার পরিচিত লোকেরা কে কোথায় ছড়িয়ে আছে জানি না। আর তারা কী আমাকে মনে রেখেছে ! এখন একমাত্র পরিচিত ব্যক্তি হচ্ছেন শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন। তাঁর সঙ্গে যত তাড়াতাড়ি পারি যোগাযোগ করতে চাই। বিশেষ করে সর্বাগ্রে তাঁকেই আমি ইংরেজী অনুবাদের নোটবইটা দেখাতে চাই।"

ইংরেজী কবিতার কথা শুনেই রথী জিজ্ঞাসা করল, "বাবামশায়, সেই হাতের ব্যাগটা তো আপনার ঘরেই আছে ?"

"কই না তো! আজকে ভোরবেলায় আমিও খোঁজ করেছিলুম। তোমাদের ঘরে আছে বলে আর তোমরা ঘুমোচ্ছো জেনে বিরক্ত করিনি।"

রথীর মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। "বাবামশায়, ওটা তো আমাদের ঘরে নেই। আমি বোধহয় সেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনের কম্পার্টমেণ্টেই ফেলে এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথ স্থিতধী পুরুষ, সহজে বিচলিত হন না। কিন্তু প্রায় ছ মাস ধরে এতো খাঁটুনির ফল, ভেবেছিলেন রোদেনস্টাইনকে দেখিয়ে এগুলি সম্পর্কে তাঁর অভিমত নেবেন। তা আর হোল না। অনুতাপ করে লাভ নেই, সবই অন্তর্যামীর ইচ্ছা।

একটু চুপ করে থেকে কবি বললেন, "যা হবার হয়ে গেছে রথী, ওর জন্য তুমি আর মন খারাপ কোরো না। ছাখো, মার্চ মাসে সেই জাহাজে যদি আমরা আসতুম তাহলে তো এগুলি লেখাই হোত না। আর ইংরেজীতে আমার কতটুকুই বা দখল আছে। শুধু অজিতের করা আমার কবিতার ইংরেজী অনুবাদ পড়ে রোদেন্‌স্টাইন আরো দেখতে চাইছিলেন তাই।"

রথী ততক্ষণে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে।

"কোথায় যাচ্ছো রথী?" রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন।

"বাবামশায়, আমি কোটটা গায় দিয়ে মেট্রো স্টেশনের 'লস্ট্ প্রপার্টি' অফিস থেকে একবার ঘুরে আসি। ব্যাগটা পাওয়া গেলেও যেতে পারে।"

"তুমি অযথা উতলা হয়ে এমন সুন্দর সকালটি নষ্ট করে দিচ্ছো রথী। জানো তো লণ্ডনে সূর্যের দেখা বড় একটা মেলে না। যা যাবার তা ঠিকই গেছে।"

কিন্তু ঈশ্বরের বোধহয় অন্য অভিপ্রায় ছিল, নইলে লণ্ডনে অতো বড় আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেল সিস্টেমে প্রত্যহ কত জিনিসই হারায়, তার কটাই বা ফেরত পাওয়া যায়।

রথী লস্ট্ প্রপার্টি অফিসে যেতেই সেই ব্যাগের হদিস মিলল। ব্যাগের ওপরেই 'R. N. Tagore' খোদাই করা ছিল। গত রাত্রেই ট্রেনের কণ্ডাক্টার ব্যাগটি এই অফিসে এসে জমা দিয়ে গেছে।

প্রমাণ দেখিয়ে রথী ব্যাগটি খালাস করে নিল। তারপর ক্লার্ককে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে যখন হোটেলে ফিরে এল, তখন দেখে প্রতিমা ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই ওর আসার অপেক্ষায় হোটেলের লবিতে বসে আছে।

ব্যাগটি প্রতিমার সামনে রেখে রথী বলল, "এখন থেকে এটি তোমার জিম্মাই রইল।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, তোমার দোষ কী! অতো লটবহর নিয়ে অজানা-অচেনা জায়গায় আসা, তারপর সেই আণ্ডারগ্রাউণ্ড ট্রেনে চলাফেরা তো আমরা কোনদিন করিনি। আমার ব্যাগ কেন, আমাকেই যে তোমরা হারিয়ে ফেলনি তাই রক্ষে।"

প্রতিমা হেসে ফেলল। জানে বাবামশায় তাদের ওপর নির্ভর-শীল বলে জাহির করতে ভালবাসেন, যদিও একটুও তিনি পরনির্ভর-শীল নন। সে বলল, "বাবামশায়, এমন সুন্দর দিন, লণ্ডন ঘুরে দেখবো না? আপনি বলেছিলেন এমন দিন এখানে বড় একটা মেলে না।"

রথী বলল, "চলো, আমরা লাঞ্চ খেয়েই বেরিয়ে পড়ি। বাবা-মশায় চলুন, হোটেলের অফিস থেকে আপনি মিঃ রোদেনস্টাইনকে ফোন করবেন।"

একটু চেষ্টার পর অপারেটরের সাহায্যে রোদেনস্টাইনের স্ট্রিট অ্যাড্রেস বলে তাঁর টেলিফোন নম্বর বার করলো রথী। তারপর রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাসায় ফোন করতেই রোদেনস্টাইন এসে ফোন ধরলেন।

"মিঃ টেগোর, হাউ নাইস্ টু হিয়ার ইয়োর ভয়েস্। ওয়েলকাম্ টু ইংল্যাণ্ড। কবে এলেন?

"গতকাল সন্ধ্যেবেলায় এসে পৌঁছেছি।"

"কোথায় উঠেছেন?"

"এই ব্লুমসবেরী হোটেলে। টমাস কুক্ কোম্পানী ঠিক করে রেখেছিল।"

"আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আমি খুবই উৎসুক। যদি আপনি খুব ক্লান্ত না থাকেন, তাহলে কালকে দুপুরেই আমাদের বাড়িতে চলে আসুন। আমাদের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন।"

রবীন্দ্রনাথ একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "মিঃ রোদেনস্টাইন, আমি একা আসিনি। সঙ্গে আমার ছেলে ও পুত্রবধূ আছে।"

"মিঃ টেগোর, অনুগ্রহ করে আপনি তাদেরও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আমার স্ত্রী ওদের দেখে ভীষণ খুসী হবে। বাই দি ওয়ে, সেই যে আপনাকে লিখেছিলাম, আপনার কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করে এনেছেন তো?"

"হ্যাঁ, সেইগুলি দেখিয়ে আপনার অভিমত জানতে ইচ্ছে করি।"

"ঠিক আছে মিঃ টেগোর। আমার বাড়ির ঠিকানা তো আপনার জানাই আছে! ট্যাক্সিওয়ালাকে বললেই আপনাদের এখানে পৌঁছে দেবে! কাল তাহলে দুপুর বারোটার সময় দেখা হচ্ছে। থ্যাংক্স্ ফর কলিং।"

"থ্যাংক্উ মিঃ রোদেনস্টাইন ফর রাইটিং হ্যাণ্ড ইন্ভাইটিং আস্", রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"আন্টিল্ উই মিট্ দেন্, গুডবাই", বলে রোদেনস্টাইন ফোন ছেড়ে দিলেন।

রোদেনস্টাইনকে ফোন করার পর রবীন্দ্রনাথ ওঁর ঘরে গিয়ে কয়েকটি চিঠি লিখতে শুরু করলেন। তারপর দুপুরবেলায় হোটেলের নিচের রেস্টোরেণ্টে লাঞ্চ খেয়ে ওঁরা শহর দেখতে বেরোলেন।

সেদিন লণ্ডন শহর সত্যিই গ্রীষ্মের উজ্জ্বল রৌদ্রে ঝলমল

করছিল। রাস্তায় কত অসংখ্য লোক, কত গাড়ির ভিড়। রবীন্দ্রনাথের লণ্ডন কোনদিনই বিশেষ ভাল লাগেনি। আগের বার উনত্রিশ বছর বয়েসে যখন সত্যেন্দ্র-দাদার সঙ্গে এসেছিলেন তখন অধিকাংশ সময়ই নিজের ঘরে চুপচাপ বসে কাটাতেন। অথচ মেজদার লণ্ডন সহর কী ভালই না লাগত! দিব্যি হ্যাট কোট পড়ে হয় তিনি পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, না হয় প্রাক্তন ইণ্ডিয়ান সিবিল সার্ভেন্টদের ক্লাবে নিয়মিত হাজির হতেন। রবীন্দ্রনাথ ভেবেই পেতেন না এই ঠাণ্ডা কুয়াসা ও বিশ্রি স্যাঁতসেতে আবহাওয়ায় ভরা সহরের মধ্যে থেকে লোকে কী সুখ পায়!

আজ বাহান্ন বছর বয়সে লণ্ডনে এসে তার এ সব ভবনা মাথায় এলোনা, বিশেষ করে রথী ও প্রতিমা সঙ্গে থাকায়। রথী আগের বারই দেশে যাবার পথে লণ্ডন ঘুরে গিয়েছিল, এবার যেন অন্য চোখ দিয়ে লণ্ডন দেখতে লাগল।

সবচেয়ে বেশী আগ্রহী যেন প্রতিমা। সেই গল্পে শোনা লণ্ডন সহরে আসা। এখানেই যখন কিছুদিন থাকা হবে, তখন এ সহরের সঙ্গে ভাল করেই চেনা জানা হবে।

হোটেল থেকে বেরিয়ে রথী ওদের ঘোরার জন্য একটি ট্যাক্সি ভাড়া করল। তারপর একে একে আর সব ট্যুরিষ্টদের মতো ব্যাকিংহ্যাম প্যালেস, ওয়েস্টমিনিষ্টার অ্যাবি, পার্লমেণ্ট ভবন ইত্যাদি সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন।

লণ্ডনের পথে বেরোলেই যেন এই জাতির চরিত্র বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন ইংরেজ জাতি আজ মদগর্বে কত গর্বিত। এক অবিশ্বাস্য আশাবাদ নিয়ে এই জাতি সামনে এগিয়ে চলেছে। তাদের কাছে কোন কিছুই অসম্ভব নয়। কোন বাঁধাই অলংঘনীয় নয়, কোন পর্বতই অতুাঙ্গ নয়। তাদের ধারনা যে সব দেশ আজ পিছিয়ে আছে, বৃটিশ জাতির পথ অনুসরণ করে তারাও 'জাতে'

উঠতে পারে। কাজ শুধু সবাইকে এই পথ দেখিয়ে দেওয়া, বৃটিশ সভ্যতার বানী পোঁছে দেওয়া। সেই আদর্শে অনুপ্রমানিত হয়েই যেন এই সহরের সমস্ত লোক একাগ্রচিত্তে কাজ করে চলেছে।

ট্যাক্সি হাইড পার্কের কাছেই আসতেই ওরা নেমে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "চলো, হাইড পার্কে একটু ঘুরে বেড়াই, আগের বার যখন এসেছিলুম, তখন যখনই মন খারাপ হোতো, দিন ভাল থাকলে এই পার্কে এসে বসে থাকতুম।

পার্কের ভেতর ঢুকে ওরা দেখলেন অনেক লোক তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। আজ দিন ভাল, তার সুযোগ ছাড়তে কেউই চায়না। বিশেষ করে এই পার্কটি যেন ফুলের সজ্জা নিয়ে সবাইকে আহ্বান করছে।

রথী অনেক রকম বিলেতী ফুল চেনে। প্রতিমাকে দেখিয়ে বলল "এই দ্যাখো এইগুলি হচ্ছে চিগোনিয়া, এইগুলি জেরোনিয়াম, এইগুলি হচ্ছে ইমপেশ্যান্স, যা ছায়াতেই হয়। আর এইগুলি হচ্ছে আইরিস। স্প্রিংএর প্রথমে এলে ডন টিউলিপ-এ দেখতে পার্ক ভরে গেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, তুমি তো দেখছি অনেক বিলেতী ফুল জানো। দেশে ফিরে গিয়ে শান্তিনিকেতনে শীতকালে কিছু কিছু চাষ কোরো।"

হঠাৎ পার্কে কয়েকটী ভারতীয় ছাত্রদের দেখে ওরা থমকে পড়লেন। তারাও শাড়ি-পড়া প্রতিমা ও লম্বা আলখাল্লা পড়া রবীন্দ্রনাথকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছে। এগিয়ে এসে পরিচয় হতেই জানা গেলে কেংসিণ্টন্ এ ভারতীয় ছাত্রদের হোস্টেলে এরা সব থাকে, লণ্ডনে পড়াশুনা করছে। ভারতের প্রায় সব প্রদেশের ছাত্রই আছে, কয়েকজন বাঙালীও সেখানে আছে। ওদের মধ্যেই একজন বাঙালী ছিল, সে বলল, "স্যার দেশে থাকতে আপনার গল্প কবিতা যে কত পড়েছি তার ঠিক নেই। সুকুমার তো সুযোগ

পেলে, এখানেও একটু বৃষ্টি হলে আপনার বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করতে শুরু করবে।"

"কে সুকুমার, সুকুমার রায় চৌধুরী? উপেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরীর ছেলে?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, ও এখানে প্রিনটিং টেক্‌নলজি পড়তে এসেছে।"

"তাই নাকি, তাহলে আমি একদিন ওদের হোষ্টেলে গিয়ে ওকে আপনার কাছে ধরে নিয়ে আসবো," রথী কবিকে বলল। "আপনি এসেছেন শুনে ওযে কী খুশী হবে তা বলার নয়।"

প্রতিমা আস্তে আস্তে বলল, "বাবামশায়, সন্ধ্যে হয়ে আসছে চলুন হোটেলে ফিরে যাই।"

"হাঁ হাঁ চলো, বলে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ওরা একটা ট্যাক্সি ধরলেন হোটেলে ফেরার জন্য।

স্পস্টেড হিথ্‌ এ রোদেনস্টাইনের বাড়ির নম্বর হচ্ছে এগারো এক্‌ হিল পার্ক। লাল রংয়ের ইটের তেতলা বাড়ি।

কলিং বেল টিপতেই রোদেনস্টাইন নিজে এসে দরজা খুলে রবীন্দ্রনাথকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। "ওয়েলকাম টু লণ্ডন মিঃ টেগোর দিস্‌ ইজ মাই ওয়াইফ অ্যালিস, মিঃ টেগোর।"

রবীন্দ্রনাথ ওদের সঙ্গে করমর্দন করার পরই রথী ও প্রতিমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। "মাই সন্‌ রথী এ্যাণ্ড ডটার-ইন-ল প্রতিমা। আপনি তো কলকাতায় আমাদের বাড়িতে ওদের দেখেন নি।"

"না, সে সৌভাগ্য হয়নি। হোয়াট এ চামিং ডটার-ইন-ল ইউ গট মিঃ টেগোর। তাই না অ্যালিস?"

অ্যালিস রোদেনস্টাইন হেসে স্বামীর কথায় সায় দিলেন।

ইতিমধ্যে রোদেনস্টাইনের দুই ছেলে, দুই মেয়েও ভীড় করে

দাঁড়িয়েছে। জন উইলিয়াম মাইকেল, বেটী ও ব্যাচেল। তাদের সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল।

সবাই গিয়ে ড্রইংরুমের শোফায় বসতেই রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আমি যখন মডার্ন রিভিয়ু পত্রিকায় সিস্টার নিবেদিতার অনূদিত আপনার 'কাবুলিওয়ালা' গল্পটি পড়েছিলাম, তখনই মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলাম। তারপর খোঁজ করে জানলাম যে মিঃ অজিত চক্রবর্তী আপনার কয়েকটী কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেছেন। আমার সে গুলিও পড়ে খুব ভাল লেগেছিল। সেইজন্যই আপনাকে লিখেছিলাম কিছু কবিতার অনুবাদ করে আনতে। এনেছেন কিছু ?"

রবীন্দ্রনাথ একটু ইতঃস্তত করে বললেন, "হাঁ, আমার কিছু কবিতার ইংরাজী তর্জমা করেছি বটে, কিন্তু আপনাকে দেখাতে সংকোচ হচ্ছে। ভীষণ কাঁচা অনুবাদ।"

"ওয়েল, আমি আগে দেখে নি সেগুলি।"

রবীন্দ্রনাথ তখন সেই ব্যাগ থেকে নোট বইটি বার করে রোদেনস্টাইনের হাতে দিলেন।

রোদেনস্টাইন নোট বইটি খুলেই প্রথম কবিতাটি অতি নিবিষ্ট সহকারে পড়তে শুরু করলেন। কারুর মুখে কোন কথা নেই। কবির বুকটা একটু দূর-দূর করছিল। এতো কষ্ট করে এগুলি অনুবাদ করা। সবই বোধহয় বিফলে গেল।

একটু পরেই রোদেনস্টাইন বলে উঠলেন, "মিঃ টেগোর, দিজ আর গ্রেট্ স্টাফ্। অপূর্ব হয়েছে। আমি কালকেই কবি ইয়েটস্-এর কাছে এগুলি পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওর মতামত জানা বিশেষ দরকার।"

রবীন্দ্রনাথ একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "ইয়েটস্-এর মতো অত নামী কবির কাছে পাঠাবেন, তাঁর সময়ের যা দাম, আমি ভীষণ সঙ্কুচিত বোধ করছি।"

"আপনি তার জন্য কিছু ভাববেন না। ইয়েটস্ আমার বিশেষ

বন্ধু। ওর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলে দেখবেন যে ওর মতো দরদী মানুষ খুব কম দেখা যায়।"

এর মধ্যে মিসেস্ রোদেনস্টাইন এসে জানালেন যে ডাইনিং রুমে লাঞ্চ সার্ভ করা হয়েছে।

লাঞ্চ পরিবেশন করতে করতে তিনি বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাদের জন্য একটু ইয়োলো রাইস করেছি। উইল্ ইণ্ডিয়া থেকে ঘুরে এসে তার খুব প্রশংসা···করত। রেসিপি-ওসেখানথেকেযোগাড় করে এনেছিল। আপনারা কী বলেন একে, 'পিলাফ্' ?"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আসল নাম পোলাও। মোগল আমলের সময় থেকেই আস্তে আস্তে ভারতে জনপ্রিয় হয়েছে।"

রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আমি আপনাদের কলকাতার বাড়িতে যা খেয়েছি তার তুলনা হয়না। বিশেষ করে সেই ইণ্ডিয়ান সুইট্। তবে আমার কাছে বড্ড বেশী মিষ্টি লেগেছে। বাই দি ওয়ে, মিঃ অবনীন্দ্রনাথ ও মিঃ গননেন্দ্রনাথ কেমন আছেন ?"

"ভালই আছে ওরা। খুব ছবি, এঁকে চলেছে।"

"ওহ্, দে আর স্ট্রং-লি গ্রেট আর্টিস্টস্। মিঃ হ্যাভেল যে ওদের কত প্রশংসা করেন তা বলবার নয়। আমি ওদের অনেকবার বলেছি লণ্ডনে চলে আসতে, এখানে ওদের ছবির প্রদর্শনী খুলতে। ইণ্ডিয়ান আর্ট সম্পর্কে এখানে প্রচার করা খুবই প্রয়োজন। মিঃ হ্যাভেলেরও সেই মত।"

"কিন্তু আপনি তো ওদের জানেন। ওরা এমনিতেই একটু ঘরকুনো, তারপর প্রচারবিমুখ।"

"সেই হচ্ছে ইণ্ডিয়ানদের এক বড় দোষ। তাদের শিল্প-সংস্কৃতি ইংলণ্ড তথা পশ্চিম জগতে প্রচার না করলে লোকে জানবে কী কোরে ? সেইজন্যই তো 'মডার্ন রিভিয়ু'তে যখন আপনার লেখার ইংরেজী অনুবাদ পড়লাম, তখনই মনে হোলো এ সব জিনিষ পশ্চিমে প্রচার করার বিশেষ প্রয়োজন।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "লোকে নিন্দে করলে আমাকে তার জন্য দোষ দিতে পারবেন না। সমস্ত ত্রুটি ও প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য হবে।"

"মিঃ টেগোর, আমি যতটুকু পড়েছি তাতে কোন ত্রুটি আমার চোখে পড়েনি। দেখি ইয়েটস্ কী বলেন। চলুন আমার স্টুডিও আপনাকে ঘুরে দেখাই।"

রোদেনস্টাইনের স্টুডিওটি ভারী সুন্দর। এটি বাড়ির পেছন দিকে অবস্থিত। বিরাট খোলা-মেলা ঘর, পাশে বড়ো বড়ো জানালা। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন অনেক ইজেল অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে।

রোদেনস্টাইন বাড়ির পেছনের বাগানে ওদের নিয়ে গেলেন। কত রকম থোকা থোকা ফুল ফুটে রয়েছে। বাড়িটি উঁচু জায়গার ওপর অবস্থিত বলে ওখান থেকে হেম্পস্টেড হিথ্-এর অনেকটা দেখা যায়। দূরের নিচু ভ্যালি, তারপরে আবার সারি সারি বাড়ি, সব আশ্চর্যভাবে যেন ছবির মতো সাজানো রয়েছে।

বিদায় নেবার সময় রোদেনস্টাইন কবিকে সময় পেলেই তাঁর স্টুডিওতে চলে আসতে বললেন। "মনে রাখবেন মিঃ টেগোর, এ হচ্ছে আপনার হোম অ্যাওয়ে ফ্রম হোম।"

রবীন্দ্রনাথ কিছু না বলে রোদেনস্টাইনের ডানহাতটি দুহাতের মধ্যে নিয়ে করমর্দন করলেন।

রাস্তায় বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল রোদেনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ যেন ঈশ্বর-প্রণোদিত। রোদেনস্টাইন যখন উনিশ শ দশ সালে ভারতে বেড়াতে এসে কলকাতায় গগনেন্দ্র-নাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, তখন ঠাকুর-বাড়ির সেই দক্ষিণের বারান্দায় দেখতেন ধুতি-চাদর পরা এক মধ্য-বয়েসী ভদ্রলোক চুপচাপ বসে ওদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। জিজ্ঞাসা করে জানলেন উনি ওদের কাকা। কিন্তু তারা রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে তাঁকে পরিচয়ও করিয়ে দেয়নি, আর রোদেনস্টাইনও পাশ্চাত্য সভ্যতার মানুষ বলে যেচে আলাপ করেননি।

তারপর যখন 'মর্ডান রিভিয়ু'তে রবীন্দ্রনাথের গল্প পড়ে তাঁর সম্বন্ধে জানতে চেয়ে রোদেনস্টাইন গগনেন্দ্রনাথকে লিখলেন, তখন জানলেন যে তাদের সেই আঙ্কেলই হচ্ছেন এই গল্পের মূল লেখক। যখন তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা সম্বন্ধে আরও জানতে চাইলেন, তখন শান্তিনিকেতনের শিক্ষক অজিত চক্রবর্তী কবির কয়েকটি কবিতা নিজে ইংরেজী অনুবাদ করে পাঠালেন। সেগুলি পড়ে রোদেনস্টাইন আরও মুগ্ধ। তাঁর স্থির বিশ্বাস যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি ইংরেজীতে প্রকাশিত হলে ইংরেজীভাষী জগতে কবি হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধিলাভ করবেন।

মনে হোল রবীন্দ্রনাথকে ইংরেজী জগতে প্রতিষ্ঠিত করাই যেন রোদেনস্টাইনের আর এক ব্রত হয়ে দাঁড়াল। তখন লণ্ডনে নব-বিধান ব্রহ্ম সমাজের প্রমথলাল সেন ছিলেন। তিনি একদিন দার্শনিক ব্রজেন শীলকে নিয়ে রোদেনস্টাইনের বাড়িতে দেখা করতে এলেন। রোদেনস্টাইন তাদের বললেন রবীন্দ্রনাথকে লিখতে যে তিনি যেন তাঁর লেখার ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে সত্বর লণ্ডনে আসেন। ব্রজেন শীল ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি কবিকে লণ্ডনে চলে আসতে ও তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করতে লিখলেন।

তারপর রবীন্দ্রনাথ যখন দেশ থেকে সাগর পাড়ি দেবার জন্য অন্তরের ডাক শুনতে পেলেন, তখন রোদেনস্টাইনের সঙ্গে চিঠি লিখে যোগাযোগ করলেন। রোদেনস্টাইন সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে লণ্ডনে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন আর বার বার লিখলেন তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করতে। রবীন্দ্রনাথ তখনও এ প্রস্তাব খুব একটা গভীরভাবে নেননি। কিন্তু সেবারে যখন অসুস্থ হয়ে লণ্ডন যাওয়া হোল না এবং শিলাইদহে তাঁর সেই সাধের 'কুঠিঘরে আশ্রয় নিলেন, তখন নতুন কোন লেখায় কবির মন গেল না। আস্তে আস্তে 'গীতাঞ্জলি' ও 'গীতিমাল্য'-এর কিছু কবিতা

অনুবাদ করতে শুরু করলেন। নোটবইয়ের বাকি কবিতাগুলি জাহাজে বসেই করেছেন।

নোটবইটি হাতে পেয়ে রোদেনস্টাইনও রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গুলি পড়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়লেন। কবিকে বিদায় দিয়েই তিনি তাঁর স্টুডিও ঘরে গিয়ে এক কউচে বসে পড়তে শুরু করলেন। পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এ যেন বাইবেলের ভাষা দিয়ে লেখা। কী সারল্য, কী মাধুর্য, কী অন্তর্নিহিত মূর্ছনা! ঈশ্বরের প্রতি আকুতি যেন প্রতিটি ছত্রে ঝরে পড়ছে। বার বার তাঁর মনে পড়ছিল 'the psalms of David', সেই একই মিস্টিসিজম, সেই একই অনুভূতি এই কবিতাগুলির মধ্যে ছড়িয়ে আছে।

সেইদিনই তিনি তাঁর সেক্রেটারীকে দিয়ে কবিতাগুলির তিন কপি করালেন। তারপর এক কপি অ্যাণ্ড্রু ব্রাডলি, এক কপি বর্ষীয়ান লেখক স্ট্যাফর্ড ব্রুক্‌স্‌ ও বাকি কপিটি কবি ডব্লিউ বি. ইয়েট্‌স্‌-এর কাছে পাঠালেন।

• রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে এলেন, সেই সময়ে অধ্যাপক উইলিয়াম পিয়ার্সনও সেই শহরে ছিলেন। লণ্ডনের মিশনারী কলেজের কলকাতাস্থ শাখার তিনি তখন ছিলেন জীববিদ্যার অধ্যাপক, গ্রীষ্মের ছুটিতে লণ্ডনে এসেছেন। পিয়ার্সনের যেন ভারত-অন্ত প্রাণ। শুধু যে তিনি সে দেশকে ভালবেসেছেন তাই নয়, বাংলাকে ভাল করে জানার জন্য বাংলা ভাষাও ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছেন।

লণ্ডনের বাঙালী ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক। এবার লণ্ডনে এসেই তাঁর বাড়িতে সব ছাত্রদের ডাকলেন। ঠিক হোল উনিশে জুন সেখানে এক সাহিত্য-সভা হবে। সুকুমার রায় বর্তমান বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পড়বে।

রোদেনস্টাইনের সঙ্গে পিয়ার্সনের পরিচয় ছিল। স্বভাবতই তার

সূত্র ধরে সদ্যাগত রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও বেশ কয়েকজন বৃটিশ ও ভারতীয় জ্ঞানীজনদের আমন্ত্রণ জানানো হোল।

সুকুমার সেখানে উপস্থিত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখে তো অবাক, কারণ তার প্রবন্ধের অনেকটা জায়গায়ই রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের আলোচনা দখল করে আছে। কিন্তু এটি অনেক গবেষণা ও পরিশ্রম করে লেখা। তাই পাঠশেষে উপস্থিত সবাই তাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানালেন।

সভার শেষে পিয়ার্সন জলযোগের আয়োজন করেছিলেন। রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পিয়ার্সনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। পিয়ার্সন বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার অনেক কবিতা তো আমি বাংলাতেই পড়েছি, পড়ে অভিভূত হয়ে গেছি। আপনার এই সব কবিতার ইংরেজীতে অনুবাদ করা একান্ত দরকার যাতে এখানকার লেখকেরাও তার স্বাদ গ্রহণ করতে পারে।"

রোদেনস্টাইন পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি বললেন, "মিঃ টেগোর ওঁর কিছু কবিতার অনুবাদ করে এনেছেন, আমি কবি ইয়েটস্‌-এর কাছে তার অভিমতের জন্য পাঠিয়েছি। এ মাসের শেষের দিকে আমার বাড়িতে মিঃ টেগোরের সম্মানে একটি সাহিত্য-সভার আয়োজন করব ঠিক করেছি। আপনি কী আসতে পারবেন ?"

"আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ মিঃ রোদেনস্টাইন, কিন্তু দুঃখের বিষয় সে সময়ে আমি লণ্ডনের বাইরে থাকবো।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ পিয়ার্সন, আপনাকে আর ধরে রাখবো না, আপনি অন্য অতিথিদের সঙ্গে কথা বলুন। আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে অবশ্যই আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব।"

তারপর এক কোণে সুকুমার রায়কে দেখতে পেয়েই কবি তার কাছে এগিয়ে এলেন, "সুকুমার, তোমাকে দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশী

হয়েছি। তুমি যে এখানে আছো সে খবর ইতিমধ্যেই পেয়েছি। তোমার প্রবন্ধটি ভারী সুন্দর হয়েছে, তবে আমার লেখার অতো উদ্ধৃতি না দিলেই পারতে, বিশেষ করে এই বিদ্বজ্জনদের সামনে।

সুকুমার বলল, "গুরুদেব, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে আপনার অবদানের সামান্য মাত্রই আমি আলোচনা করতে পেরেছি। আপনার ছোট গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ ইত্যাদির পুরো আলোচনা করলে গোটা প্রবন্ধটাই তাতে ভরে যেত।"

রবীন্দ্রনাথ সুকুমারের মুখে 'গুরুদেব' সম্ভাষণ শুনে একটু চমকে উঠলেন। জানেন—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শুরু করার পর শান্তি-নিকেতনের প্রায় সবাই তাঁকে ওই নামে ডাকে, কিন্তু সে ডাক যে এতদূর লণ্ডনে এসে পৌঁছবে তা ভাবতে পারেননি।

অন্য কথায় মোড় ফেরাবার জন্য কবি বললেন, "সুকুমার, তোমার বাবা উপেন্দ্রের শরীর এখন কেমন?"

"দেখে এসেছিলাম ভালই আছেন। তবে অতিরিক্ত খাটুনির জন্য মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়েন।"

"সত্যি, উপেন্দ্র নতুন ধরনের টাইপ-সেটিং-এর প্রতিষ্ঠার জন্য যা পরিশ্রম করছে তার তুলনা হয় না। শোন, আমরা তো এখন হোটেলে আছি, কিন্তু বাড়ি খুঁজছি, পেলেই সেখানে উঠে যাবো। তখন আমাদের বাড়িতে একদিন এসো। রথী তোমার হোস্টেলে গিয়ে ঠিকানা দিয়ে আসবে।"

"নিশ্চয়ই যাবো গুরুদেব। মিসেস ঠাকুরের হাতে দেশের রান্না খাওয়া যাবে।"

"সে বিষয়ে বিশেষ ভরসা কোর না। রান্নার ব্যাপারে বৌমার শিক্ষার পালা চলছে। হয়ত সেই রোস্ট আর পুডিং পাবে।"

রবীন্দ্রনাথের কথায় সুকুমার হেসে উঠল। ও বিদায় নিতেই রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক প্রফুল্ল রায়ের কাছে গেলেন। "প্রফুল্লবাবু, আপনি কবে লণ্ডনে এলেন?"

"এই তো কয়েকদিন হোল। আমি আর দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এম্পায়ার ইউনিভার্সিটি কন্‌ফারেন্সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছি। কিন্তু আপনার না লণ্ডনে কিছুদিন আগে আসার কথা ছিল?"

"হাঁ, কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লাম, তাই যাত্রার দিন পিছিয়ে দিতে হোল। আপনি আর কদিন আছেন?"

"সামান্য কদিনই লণ্ডনে থাকবো, তারপর ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরবো।"

"হাঁ, ইউরোপের বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরীগুলি যদি দেখে যেতে পারেন, তাহলে দেশে কাজ করার অনেক আইডিয়া পাবেন।"

"সেই ইচ্ছেই তো আছে, দেখি কী হয়," প্রফুল্লচন্দ্র উত্তর দিলেন।

পিয়ার্সনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরোনোর সময় রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, চলুন আপনাকে আপনার হোটেলে নামিয়ে দিয়ে আসি। আপনার বাড়ি ভাড়ার জন্য এখনো কোন হদিস পাইনি, তবে কেংসিংটনের দিকে একটি বাড়ির সন্ধান পেয়েছি। আপনার সেখানেথাকতে কোন আপত্তিনেই তো?"

"কিছু মাত্র না। আপনি যেখানে ভাল মনে করবেন, সেখানেই থাকবো।"

গাড়ির ভেতরে উঠে রোদেনস্টাইন বললেন, "বুঝতে পারছি না মিঃ টেগোর, ইয়েট্‌স্‌-এর কাছ থেকে কোন উত্তর আসছে না কেন। আপনার কবিতার কপি তো বেশ কয়েকদিন হোল পাঠিয়েছি।"

"বোধ হয় মিঃ ইয়েট্‌স্‌-এর ভাল লাগে নি বলেই সৌজন্য-বশত কোন উত্তর দিচ্ছেন না," রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"না, না, এ আপনার ভুল ধারণা। যদিও আমি শিল্পী, তবু কবিতার কদর কিছু কিছু বুঝি। আপনার কবিতা আমার অসম্ভব ভাল লেগেছে বলেই আমি এদের কাছে পাঠিয়েছি। লজ্জা পাবেন

বলে আপনাকে আমি আগে বলিনি, অ্যাণ্ড্রু ব্র্যাডলি লিখেছেন, "অনেকদিন পরে আবার আমরা একজন বিখ্যাত কবির সাক্ষাৎ পেলাম।" আর স্ট্যাফর্ড ব্রুক্স্-এর চিঠিটি আমার সঙ্গেই আছে। এই যে আপনিই পড়ে দেখুন।"

রবীন্দ্রনাথ একটু অনিচ্ছা সত্ত্বেও রোদেনস্টাইনের হাত থেকে ব্রুক্সের চিঠিটা নিয়ে পড়তে লাগলেন :

"এই সঙ্গে কবিতাগুলি ফেরত পাঠালাম। আমি এগুলি স্তুতির থেকেও বেশী পড়েছি কৃতজ্ঞতা সহকারে—তাদের আধ্যাত্মিক আবেদন, তারা যে আনন্দ বহন করে আনে, সৌন্দর্যের প্রতি প্রেমে যা গভীরতর করে। আমার পক্ষে আর বেশী বলা সম্ভব নয়। কামনা করি আমি যেন এগুলি পড়ার উপযুক্ত হই।"

চিঠিটি পড়ে লজ্জিতভাবে রোদেনস্টাইনের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ ব্রুক্স্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে ভীষণ ইচ্ছে করে। ওঁর 'সান্সাইন্ অ্যাণ্ড স্যাডো', 'অন্ওয়ার্ড সিটি' ইত্যাদি বই যে কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই। 'অন্ওয়ার্ড সিটি'র উপদেশগুলি নিয়ে বাংলায় আমি একবার প্রবন্ধও লিখেছিলুম।"

"দেখি আমি মিঃ ব্রুক্স্-কে লিখে। তিনি নিশ্চয়ই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে সম্মত হবেন।"

তাই হোল। শুধু ব্রুক্স্ লিখে পাঠালেন, "কবিকে আনবেন, কিন্তু তাঁকে বলবেন যে আমি মহাত্মা নই।"

কিন্তু ব্রুক্স্‌কে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল সত্যিই তিনি মহাত্মা। কী নম্র ধীর চিন্তাপূর্ণ কথাবার্তা! সত্তর বছরের ওপর বয়েস হয়েছে, কিন্তু শরীরে কোন বার্ধক্য নেই, মন একেবারেই নবীন। বৃদ্ধের মধ্যে যদি যৌবনকে দেখা যায় তাহলে স্ট্যাফর্ড ব্রুক্স্ হবেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ওঁকে দেখে কবির তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল।

ব্রুক্স্ সাদরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিঃ

টেগোর, আপনার কবিতাগুলি যে আমাকে কী আনন্দ দিয়েছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কী ঈশ্বরানুভূতি, কী নৈসর্গিক রসে পরিপূর্ণ। আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে যে আপনার এই কবিতাগুলিতে ধর্মের কোন creed-এর গন্ধ নেই।"

"সবই মিঃ রোদেনস্টাইনের প্ররোচনায় অনুবাদ করা। আমার খুব সন্দেহ হয় এগুলি প্রকাশের উপযুক্ত কিনা।"

"না না, আপনি একথা একবারও মনে করবেন না। এ কবিতাগুলি যদি ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়, তাহলে এ দেশের লোকেরাও পড়ে আনন্দিত ও উপকৃত হবে।"

নানা কথার আলোচনার মধ্যে হঠাৎ ব্রুক্‌স্ জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর আপনি জন্মান্তরে বিশ্বাস করেন?"

রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, তাই একটু থেমে বললেন, "আমাদের বর্তমান জন্মের বাইরের অবস্থা সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কল্পনা আমার মনে নেই। কিন্তু যখন আমি এ সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করি, তখন ভাবি এ হতেই পারে না যে আমাদের এই মানবজন্ম একটা খাপছাড়া জিনিস, এর আগেও কিছু ছিল না, পরেও কিছু থাকবে না। আমার বোধহয় যে এই শরীরী জন্ম বার বার প্রকাশিত হয়ে পূর্ণতর হয়। কিন্তু আমি মনে করতে পারি না যে পূর্বজন্মে কেউ পশু ছিল এবং পরজন্মেও সে পশু হয়ে জন্মাবে।"

"এটি আমারও বিশ্বাস মিঃ টেগোর। আমিও জন্মান্তরে বিশ্বাস সঙ্গত মনে করি। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে নানা জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা যখন একটি জীবনচক্র সমাপ্ত করব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে উঠবে।"

"আপনি এই ভাবটি ভারী সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, মিঃ ব্রুক্‌স্। আমারও মনে হয় একটা কবিতা পড়া যখন শেষ করি, তখনই তার সমস্ত ভাবটি পরস্পর গ্রথিত হয়ে আমাদের মনে উদয়

হয় ও শেষ না করলে এর সূত্রটি সবসময়ে পাওয়া যায় না। আমরা প্রত্যেকে যেন একটি অভিপ্রায়কে অবলম্বন করে এক একটি জন্মমালা গেঁথে চলেছি। গাঁথা শেষ হলেই যে একেবারে ফুরিয়ে যাবে তা নয়, তবে একটা পালা শেষ হয়ে যাবে। তখনই সবটা আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়।"

"আপনি প্রকৃত কবি, মিঃ টেগোর, তাই এত সুন্দরভাবে এই ভাবটি প্রকাশ করেছেন। আবার বলি, আপনার কবিতাগুলি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের আসক্তি আরও বাড়িয়ে তুলবে।"

"আমার কবিতাগুলি আপনার ভাল লেগেছে জেনে আমি সত্যই আনন্দিত", রবীন্দ্রনাথ বিদায় নেবার সময় বললেন। এও বললেন যে "তিনি আবার দেখা করার চেষ্টা করবেন।"

ইতিমধ্যে লণ্ডনের 'নেশন' পত্রিকা থেকে লাঞ্চের জন্য নিমন্ত্রণ এলো রবীন্দ্রনাথের কাছে। 'নেশন' বৃটেনের উদারনীতিবাদীদের মুখপত্র বিদগ্ধ সাপ্তাহিক হিসেবে খুব নাম। পত্রিকার সম্পাদক মিঃ এইচ. ডব্লিউ. ম্যাসিংঘাম তাঁর উদারনৈতিক মতবাদের জন্য বিখ্যাত। কবির মতে এই পত্রিকা যারা চালান তাঁরা স্বজাতি ও স্বার্থপরতার পরজাতিকে বাটখারায় মেপে বিচার করেন না, অন্যায়কে কোন ছুতায় প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা নিখিল মানবসমাজের অকৃত্রিম বন্ধু হতে চান, ভারতীয় বলে কারুকে দূরে সরিয়ে দিতে চান না।

রবীন্দ্রনাথ ওঁদের অফিসে যেতেই মিঃ ম্যাসিংঘাম এগিয়ে এসে সাদরে করমর্দন করে তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে বসালেন, "ওয়েল-কাম টু ইংল্যাণ্ড, মিঃ রোদেনস্টাইনের কাছ থেকে আপনার কবিতার ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। শুনলাম আপনি কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ ও করেছেন। যদি আপনি ইচ্ছে করেন, তাহলে নেশন পত্রিকায় ছাপানোর জন্য আমরা বিবেচনা করতে পারি।"

"আপনার এই প্রস্তাবের জন্য অনেক ধন্যবাদ মিঃ ম্যাসিংঘাম"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। কিন্তু কবিতাগুলো মিঃ রোদেনস্টাইন কবি ইয়েটস্-এর কাছে তার মতামতের জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর বিচার না জানা পর্যন্ত এগুলির প্রকাশের জন্য চিন্তা করতে পারছি না।"

"সেটি সঠিক সিদ্ধান্ত আপনি নিয়েছেন মিঃ টেগোর। এব্যাপারে ইয়েটস্ এর মতামত অত্যন্ত মূল্যবান হবে। চলুন কনফারেন্স রুমে আমরা যাই। সেখানে সম্পাদক মণ্ডলীর বাকি সবাই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

এ হচ্ছে 'নেশন' পত্রিকার 'ওয়ার্কিং লাঞ্চ'। খেতে খেতে আলোচনা হয় পরবর্তী সংখ্যায় কোন কোন লেখা যাবে এবং কী বিষয় নিয়ে সম্পাদাকীয় লেখা হবে।

এদের কথোপকথন শুনে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল এরা কী সুন্দর নিজেদের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাজে এগিয়ে আসেন যার পেছনে যোল আনা শক্তি প্রয়োগ করেন, কোন রকমে ফাঁকি দিয়ে কাজ সারেননা। এই যে লেখার গুণাগুণ নিয়ে এত তর্কবিতর্ক হচ্ছে, তাতে মতের অনৈক্য হওয়া সত্ত্বেও কাজ কিছু থেমে থাকছে না, সে বিষয় সম্বন্ধে পরিশেষে একটি সিদ্ধান্ত ঠিকই নেওয়া হচ্ছে। অনেকে মিলে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার অভ্যাস এদের রক্তের ভেতরে কত সহজে প্রবেশ করেছে তাতে বিস্মিত হতে হয়। এদের কাজ গুরুতর, অথচ কাজের প্রনালীর মধ্যে অনাবশ্যক সংঘর্ষ ও অপব্যয় নেই। যেন এদের রথ প্রকাণ্ড, তার গতিও দ্রুত, কিন্তু তার চাকা অনায়াসে যেতে পারে এবং কিছুমাত্র শব্দ করে না।

ইংলণ্ডের ভাবুক সমাজের যে সমস্ত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন তা থেকেই কবির মনে হোল এদের মনের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ। পশ্চিম যে আজ বড় হয়েছে তার প্রধান কারণ অস্ত্রশস্ত্রের আবিষ্কার বা বাণিজ্যের প্রসার নয়, বরং চিন্তার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য গতিময়তা ও মৌলিক ভাবনার প্রয়োগও তার এক প্রধান কারণ। এখানে সব লোকেই যেন ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজেদের লক্ষ্যপথে ছুটে চলেছে। এ

সমাজ কাকেও পিছিয়ে পড়ে থাকতে দেবে না কারণ পিছিয়ে পড়লেই জীবনযুদ্ধে হার মানতে হবে। কী চিন্তার হাটে, কী কাজের ক্ষেত্রে, সর্বত্রই এখানে ভয়ঙ্কর কোলাহল ও ঠেলাঠেলি। কেউ চুপ করে দুদণ্ড বসে আকাশকুসুম কল্পনা করে না।

এই ভাবুক সমাজকে বেশী করে জানবার জন্যই যেন রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে অনুরোধ করলেন লেখক এইচ, জি, ওয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য। রোদেনস্টাইনের সঙ্গে ওয়েল্‌স্‌-এর খুবই হৃদ্যতা, তাই তিনি যখন তাঁকে ডিনারে আসার জন্য অনুরোধ করলেন, ওয়েলস্‌ তখন তা গ্রহণ করলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস্‌ ইংলণ্ডের বিদগ্ধ লেখকদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথ দেশে থাকতেই ওয়েলস্‌-এর 'কিপস্‌' উপন্যাস ও আরো দু'একটি লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করেছিল তাঁকে ওয়েলস্‌-এর উনিশ শ ছয় সালে লেখা "ফিউচার ইন্‌ আমেরিকা" গ্রন্থটি। আমেরিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ওয়েলস্‌-এর আলোচনা তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

ওয়েল্‌স্‌-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আগে রবীন্দ্রনাথের ভয় ছিল যে তিনি হয়ত এক প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত অহঙ্কারী জন হবেন। কিন্তু পরিচয় হতেই দেখা গেল মানুষটি সজারুজাতীয় নন, খুবই অমায়িক ব্যক্তি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ ওয়েলস দেশে থাকতে আমি আপনার লেখা পড়েছি। আমাকে সবচাইতে মুগ্ধ করেছে আপনার 'দি ফিউচার ইন্‌ আমেরিকা' গ্রন্থটি, কী চিন্তাপূর্ণ লেখা, পড়ে মনে হোল আপনার সঙ্গে আমরাও যেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এলাম। আমার সবচাইতে ভাল লেগেছে আপনার মূল বক্তব্যটি যে আমেরিকার চিত্ত অশান্ত, সে খালি ভোগের বেদীতেই জীবন উৎসর্গ করতে চায়। তার জন্য সে খালি অর্থের ধান্ধায় ঘোরে যা দিয়ে সে

যত খুশী অপ্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে পারে। আমেরিকান জীবনের মূল্য কথাই হচ্ছে যেন "spend, spend, spend."

"সেটি আমেরিকায় যে কোন বিদেশী গেলেই বুঝতে পারবে, ওয়েলস্ উত্তর দিলেন। "সবাই সেখানে নিজেদের ভোগের জন্য সঞ্চয়সাধনে ব্যস্ত, অন্যের ভালোর জন্য তাদের সময় নেই।"

"কিন্তু এই ভোগের বস্তুতো সবাই উপভোগ করতে পারছে না। আমেরিকান জীবনের অন্ধকার দিনগুলিও আপনি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। সেই শিশু শ্রমিক, নিগ্রোদের দুঃখের জীবন, নতুন ইমিগ্র্যান্টদের কষ্ট সবই আপনি নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন।

"কিন্তু এ সত্বেও আমি বিশ্বাস করি না যে আমেরিকা কোন দিন সমাজতান্ত্রিক দেশ হবে। অবশ্যি হলে আমিই সবচেয়ে বেশী খুশী হতাম।"

"সে আমি জানি," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন। তিনি জানেন যে বার্নার্ড শর মতো ওয়েলস্-ও ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট।

রবীন্দ্রনাথ আবার শুরু করলেন, "আপনার সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত যে আমেরিকা নিজেই জানে না সে কী করবে, কোন দিকে যাবে। কিন্তু আমারও মনে হয় যে পৃথিবীর ইতিহাসে আমেরিকা বিশেষ স্থান অধিকার করবে, শুধু এক কন্টিনেন্টেই আবদ্ধ থাকবে না।"

"আর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেই ভবিষ্যতের এক প্রধান ভূমিকা নেবে তার প্রধান প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেমন হার্ভার্ড, প্রিন্সটন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়। এগুলি হচ্ছে ওদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আমাদের অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নকল নয়।"

"দুঃখের বিষয় ভারতে কলকাতা, বোম্বাই বা মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বৃটিশ বিদ্যালয়গুলিকে নকল করেই বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধুমাত্র ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক ও কেরানী তৈরী করবার জন্যই। দেশগঠনের দায়িত্ব নেবার জন্য নয়।"

"সত্যই এটি অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার," ওয়েল্‌স্‌ও সায় দিলেন।

ওঠার সময়ে ওয়েল্‌স্ বললেন, "উইল্-এর কাছে শুনলাম আপনি এক প্রসিদ্ধ ভারতীয় কবি এবং আপনার কিছু কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। আশা করি সেগুলি পড়ার সুযোগ একদিন আমাদের হবে।"

এ প্রশ্নের উত্তর রবীন্দ্রনাথের হয়ে রোদেনস্টাইনই দিলেন। "আমি ইয়েট্‌স্-এর অভিমত জানার জন্য সেই নোটবইটি তাঁর কাছে পাঠিয়েছি।"

ওয়েল্‌স্ বললেন, "এর চাইতে আর ভাল কাজ হতে পারে না। ইয়েট্‌স্ যদি এই কবিতাগুলির প্রশংসা করেন, তাহলে ইংলণ্ডে আপনার জন্য অনেক দরজা খুলে যাবে মিঃ টেগোর।"

কিন্তু ইয়েট্‌স্-এর কাছ থেকে আর উত্তর আসে না। রোদেন-স্টাইন আবার ইয়েট্‌স্-এর কাছে চিঠি পাঠালেন। অবশেষে তাঁর উত্তর এলো। লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলি অপূর্ব হয়েছে। বহুদিন পরে এ রকম গীতিকবিতা পড়তে পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। একটু-আধটু ইংরেজী সংশোধন করা যেতে পারে, নইলে কবিতার সুললিত স্রোত যেন নির্ঝরিণীর মতো আপন বেগে ঝরে পড়ছে।

চিঠিটি পেয়েই রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথকে ফোন করে সেই সংবাদ জানালেন। বললেন যে তিনি ভাবছেন জুন মাসের শেষেই তাঁর বাড়িতে এক সাহিত্য-সভার আয়োজন করবেন। ইয়েট্‌স্-এর সঙ্গে ইতিমধ্যেই কথা হয়েছে, তিনি রবীন্দ্রনাথের কিছু বাছাইকরা কবিতা নিজে পড়ে শোনাতে সানন্দে রাজি হয়েছেন। এই সভার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথও ইংলণ্ডের বিদগ্ধসমাজের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ফোন ছেড়ে

দিলেন। তারপর নিজেদের ঘরে এসে রথী ও প্রতিমাকে সুখবরটি দিলেন।

"কবি ইয়েট্‌স্‌ আপনার কবিতা পড়বেন? এ খুবই আনন্দের খবর বাবামশায়", রথী শুনে বলল।

"প্রমথলাল সেন ও ব্রজেন শীলকেও খবর দিতে হবে। ওরা ঠিকই লিখেছিলেন রথী, যে ইংলণ্ডে এলে সমদরদীর সাক্ষাৎ পাবো। কিন্তু আমার খুব ভয় হচ্ছে, কাঁচা ইংরেজী অনুবাদ, ওরা না হাসা-হাসি করেন।"

"তাহলে ইয়েট্‌স্‌ কক্ষনো তা পড়তে রাজী হতেন না। আপনি মিথ্যেই ভয় পাচ্ছেন বাবামশায়", রথী আশ্বাস দেয়।

"কী জানি রথী, এখন মনে হচ্ছে রোদেনস্টাইনকে নোটবইটি দেবার আগে ব্রজেনবাবুকে একবার দেখিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু রোদেনস্টাইন আমার আসা শুনেই এমনভাবে নোটবইটি দেখতে চাইলেন যে আমার আর দেরী করার উপায় ছিল না।"

"আপনি মিথ্যেই এসব ভাবছেন, বাবামশায়। আপনার ইংরেজী-বাংলা সব কবিতাই অসাধারণ।"

রবীন্দ্রনাথ ছেলের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। কৃষিবিজ্ঞানের স্নাতক তাঁর ছেলে কবিতার সূক্ষ্ম গুণাগুণ কতটা বোঝে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে। এমন সময়ে যদি অজিত কাছে থাকত তাহলে তার মতামতের ওপর তিনি খানিকটা ভরসা রাখতে পারতেন।

কিন্তু রোদেনস্টাইনের বাড়িতে এই সাহিত্য-বৈঠকে যাবার আগে আর এক সভায় রবীন্দ্রনাথকে যেতে হোল। কেদারনাথ দাসগুপ্ত তখন লণ্ডনে 'ইউনিয়ান অফ্‌ ইষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েস্ট' নামে এক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, ঠিক হয়েছে তার তরফ থেকে কবিকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

"আমাদের অতীব সৌভাগ্য যে বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। যারা বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত তারা জানেন যে রবীন্দ্রনাথ শুধু কবিতায়ই নয়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও গানেও সমান দক্ষ ও মৌলিক রচনার অধিকারী। কবির প্রতিভা যেন সততই প্রবহমান, তাঁর কাব্য-ভাণ্ডারে নিত্য নতুন রত্ন নিয়তই জমা পড়ছে, আশা করি একদিন পৃথিবীর বিদ্দৎসমাজ সবিশেষভাবে তার পরিচয় পাবে।"

রবীন্দ্রনাথ সংক্ষেপে তাদের ধন্যবাদ দিয়ে কিছু বললেন, বিশেষ করে বিদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনের প্রচেষ্টাকে।

সভাশেষে কেদার দাসগুপ্ত রবীন্দ্রনাথকে বললেন, "রবিবাবু আপনার আসাতে আমরা যে কী রকম গৌরবান্বিত হয়েছি তা বোঝাতে পারবোনা। শুনলাম আপনার কবিতার কিছু ইংরেজী অনুবাদ আপনি করেছেন। এগুলি বই আকারে প্রকাশিত হলে সবাই আপনার প্রতিভার পরিচয় পাবে। আমি ভাবছি আপনার 'দালিয়া' নাটিকাটি ইংরেজী অনুবাদ কোরবো, অবশ্যি আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে।"

"আমার কোন আপত্তি নেই, কিন্তু এখানকার জনসাধারণ কী সে নাটক ভালভাবে গ্রহণ করবে?"

"আমি এর সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি আমার নাট্যকার বন্ধু জর্জ কল্‌ডেরন-কে পড়ে শুনিয়েছিলাম, ওর ভীষণ ভাল লেগেছে। ও আমার অনুবাদকে নাট্যরূপ দেবেন বলেছেন। সম্ভব হলে এখানকার রয়াল অ্যালবার্ট হলে অভিনয় করার চেষ্টা করবো।"

"আপনি এত পরিশ্রম করবেন কেদারবাবু, দেখবেন সবটা না পণ্ডশ্রমে পরিণত হয়।"

"আপনি তার জন্য ভাববেন না। আপনার শুধু ওই নাটকটিই নয়। আমি ভাবছি আপনার 'ডাকঘর' ও 'রাজা'-ও ইংরেজীতে তর্জমা করা উচিত।"

"কিন্তু কে করবে! আমার তো সময় নেই। আমি যেটুকু

সময় পাচ্ছি, তা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করার পেছনেই কাটাতে চাই।"

"আপনি নাটকের অনুবাদ করার জন্য ভাববেন না। আমি শুধু আপনার অনুমতি চাই। এখানকার বেশ কয়েকজন বাঙালী ছাত্র আপনার নাটক অনুবাদ করতে চায়। ভাবছি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষিতিশ সেনকে দিয়ে 'রাজা' ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যলয়ের দেবব্রত মুখার্জিকে দিয়ে 'ডাকঘর' অনুবাদ করাবো।"

"তাহলে খুব ভাল হয়। এ নাটক দুটি আমারও খুব প্রিয়। কিন্তু 'দালিয়া' অনুবাদ করার পর আমাকে দেখাবেন। আমি একটি ইংরেজী গান যোগ করে দেবো ভাবছি।"

"এই সব নাটক অনুবাদ হলেই আপনাকে দেখাবো। আপনার বিনা অনুমতিতে এ কোথাও অভিনীত হবে না।"

তিরিশে জুন, উনিশ শো বারো সাল। রোদেনস্টাইনের হেম্পস্টেড্ হিথ্-এর বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা সাহিত্য-সভা বসেছে।

রোদেনস্টাইন এই বৈঠকের জন্য বাছা-বাছা ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করেছেন যারা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও ব্যক্তিত্বকে উপলব্ধি ও অনুপ্রাণিত করেছেন উইলিয়াম বাটসার ইয়েট্স্, মে সিন্‌ক্লেয়ার, এভ্‌লিন্ আণ্ডারহিল, অ্যানের্স্ট রাইস্, আর্থার ফয স্ট্রাংওয়েস্, চার্লস ট্রেভেলিয়ান, এজরা পাউণ্ড, অ্যালিস মেনেল, হেনরী নেভিনসন ও চার্লস্ ফ্রিয়ার অ্যাণ্ড্রুজ।

রবীন্দ্রনাথ যখন রথী ও প্রতিমাকে নিয়ে রোদেনস্টাইনের বাড়িতে এলেন, তখন কলিং বেল টিপতেই মিসেস রোদেনস্টাইন নিজে এসে দরজা খুলে ওঁদের অভ্যর্থনা করলেন। রবীন্দ্রনাথ ড্রয়িং রুমে ঢুকে দেখেন ঘরভর্তি লোক। পুরুষরা সব টাই-স্যুট পরে এসেছেন আর মহিলারা এসেছেন ইভিনিং গাউন পরে।

রবীন্দ্রনাথকে ঢুকতে দেখেই রোদেনস্টাইন অতিথিদের ছেড়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন। "মিঃ টেগোর, আসুন আপনার সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিই। ইনিই হচ্ছেন কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্। ইনি হচ্ছেন আমেরিকা থেকে আগত কবি এজরা পাউণ্ড, ইয়েট্স্-এর সেক্রেটারী। ইনি হচ্ছেন মে সিনক্লেয়ার, কবি ও নভেলিস্ট। ইনি হচ্ছেন আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েল।"

রবীন্দ্রনাথ একে একে সবার সঙ্গে করমর্দন করলেন। ওর পেছনে রথী ও প্রতিমার সঙ্গেও সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল।

ইয়েট্স্-এর দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ চমকে গেলেন। কী ভাসা-ভাসা চোখ, উঁচু নাক, দীর্ঘ দেহ, সমস্ত মুখমণ্ডল থেকে যেন প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তার পাশে এজরা পাউণ্ডের চেহারাও কম আকর্ষণীয় নয়। উস্কখুস্ক সোনালী লম্বা চুল, ছোচালো দাড়ি, চেহারার মধ্যে এক তরুণ কবির অস্থিরতা যেন ফুটে উঠেছে। আর্নেস্ট রাইসের শ্মশ্রুদেহী চেহারা মনের প্রশান্তি বহন করছে। কবির সবচেয়ে ভাল লাগল রেভারেণ্ড সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজকে যার ভাবমগ্ন চেহারা ও শান্ত চোখদুটি যেন অন্তরের পবিত্রতাকেই ঘোষণা করছে।

মিসেস রোদেনস্টাইন ঘুরে ঘুরে সবাইকে ড্রিঙ্ক সার্ভ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথকে কী দেবেন বলে ট্রেটি আনতে তিনি তা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন। তখন তাঁর জন্য ঠাণ্ডা ফলের রস আনা হোল, যা রথী ও প্রতিমাকেও দেওয়া হোল। মিসেস রোদেনস্টাইন অনেক রকম 'অরডোঙ্' তৈরী করেছিলেন, সেইগুলি থালা সাজিয়ে সবাইকে পরিবেশন করা হোল।

অ্যালিস রোদেনস্টাইন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাদের জন্য বিশেষ করে এই ভেজিটেবিল চপ তৈরী করেছি। অনুগ্রহ করে দু-একটি নিতেই হবে।"

অগত্যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্লেটে একটি তুলে নিলেন। এমন সময় ইয়েট্‌স্ তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন।

"মিঃ টেগোর, আমি আপনার কবিতাগুলি পড়ে কী ভীষণভাবে অভিভূত হয়েছি তা বোঝাতে পারবো না। এগুলি আমি ট্রেনে-বাসে সর্বত্রই বার বার পড়েছি। আমার ধারণাই ছিল না কবিতার এমন সহজ সৌন্দর্য এতো মর্মস্পর্শীভাবে প্রকাশ করা যায়। আপনার সাফল্যের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

রবীন্দ্রনাথ আর কিছু না বলে শুধু ধন্যবাদ জানিয়ে চুপ করে রইলেন।

অবশেষে কবিতা পড়ার সময় ঘনিয়ে এল। সমস্ত প্লেট-গ্লাস সরিয়ে রেখে সবাই প্রায় চক্রাকারে চেয়ার টেনে বসলেন। আস্তে আস্তে সমস্ত কলগুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল।

রোদেনস্টাইন উঠে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে রবীন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন। "রবীন্দ্রনাথ টেগোর আজ বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, বোধহয় ভারতবর্ষেরও। বাংলাদেশের সর্বত্রই তাঁর কবিতা আবৃত্তি হয়, তাঁর লিখিত গান গাওয়া হয়। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি অনেক ছোটগল্প, উপন্যাস ও নাটক লিখেছেন। ইংরেজীতে অনূদিত তাঁর একটি ছোটগল্প পড়ে মুগ্ধ হয়ে আমি তাঁর লেখার প্রতি আকৃষ্ট হই।

মিঃ টেগোর বাংলার এক মহান পরিবার থেকে এসেছেন। তাঁর ঠাকুরদা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এ দেশে এসেছিলেন। তিনি এক রেনেসাঁস পুরুষ ছিলেন এবং যারাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন তারাই তাঁর চরিত্রের মাধুর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর পিতা একজন ঋষিতুল্য পুরুষ ছিলেন এবং বাংলার ব্রহ্মসমাজের এক প্রধান নেতা ছিলেন। মিঃ টেগোরের বড়দাদা একজন খ্যাতনামা দার্শনিক ও তাঁর দুই ভাগিনেয় অতিবিখ্যাত শিল্পী যারা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছেন। তাঁর পরিবারের প্রায় প্রত্যেকেই কোন না কোন

প্রতিভার অধিকারী। বিস্ময়ের কিছু নেই যে এমন পরিবার থেকে এক যথার্থ কবির আবির্ভাব হয়েছে।

আজ আমরা খুবই ভাগ্যবান যে মিঃ টেগোরকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। মিঃ উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্‌স্ এখন মিঃ টেগোরের কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনাবেন। আমি ইতিপূর্বেই তাঁর ইংরেজীতে অনূদিত এই কবিতাগুলি পড়েছি। সেগুলির ভাষা ও অন্তর্নিহিত সঙ্গীতের মূর্ছনা অপূর্ব। আর বিশেষ ভূমিকা দেবার দরকার নেই। মিঃ ইয়েট্‌স্, আপনি অনুগ্রহ করে কবিতা-পাঠ আরম্ভ করুন।"

ইয়েট্‌স্ তাঁর কোটের পকেট থেকে রোদেনস্টাইনের পাঠানো কাগজগুলি বার করলেন। তারপর সেগুলি থেকে 'গীতাঞ্জলি'র প্রথম কবিতাটি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উদাত্ত-গম্ভীরকণ্ঠে পড়তে শুরু করলেন ঃ

"Thou hast made me endless, such is thy pleasure.
This frail vessel thou emptiest again and again, and fillest it ever with fresh life.
This little flute of a seed thou hast carried over hills and dales,
and has breathed through it melodies eternally new.
At the immortal touch of thy hands my little heart loses
its limits in joy and gives birth to utterever ineffable,
Thy infinite gifts come to me only thou very small hands of mine.

Ages pass, and still thou pourest, and still there is room to fill."

ইয়েট্‌স্‌-এর পড়া শেষ হলে সমস্ত ঘর স্তব্ধতায় ভরে গেল। সবাই তার আবেশে মুহ্যমান, কারো মুখে কোন কথা নেই।

আস্তে আস্তে ইয়েট্‌স্‌ দ্বিতীয় কবিতাটি পড়তে শুরু করলেন :

"When thou commandest me to sing
it seems that my heart would break with pride;
and I look to thy face, and tears come to my eyes......"

এমনি করে পর পর এগারটি কবিতা পড়ার পর ইয়েট্‌স্‌ শেষ কবিতাটি পড়ে চললেন :

"Thou hast made me known to friends who I know not.
Thou hast given me seats in homes not my own.
Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger......"

পড়া শেষ হবার পর সবার সাড়া জাগল। এতক্ষন সবাই যেন মুহ্যমান হয়ে ছিলেন, অন্যজগতে চলে গিয়েছিলেন।

কিন্তু কেউ বিশেষ কোন কথা বললেন না। সবাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন।

ট্যাক্সিতে উঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, আমার মনে হচ্ছে কবিতাগুলি ওদের ভাল লাগেনি। কেউ তো বিশেষ কিছু বললেন না।"

রথী চুপ করে রইল। কীই বা বলবে। তারও মনে হয়েছিল কবিতাগুলি এদের বিশেষ পছন্দ হয়নি। কই, কেউ তো একটি প্রশংসা বাক্যও উচ্চারণ করলেন না!

অথচ কবিতাগুলি শুনতে কী ভালই না লাগছিল! ইয়েট্‌স্‌

কী সুন্দর আবেগ কম্পিত গলায় পড়লেন ! সে জানে এই কবিতাগুলির লেখার পটভূমিকা। সে যেখন কবিতাগুলি শুনছিল, তখন তার মনে পড়ছিল পদ্মার সেই রৌদ্রদগ্ধ ধূ-ধূ চর, সেই হলুদ সর্ষের ক্ষেত, আমের বকুলের সুমিষ্ট গন্ধ। সমস্ত কবিতাগুলি থেকে এই প্রকৃতির প্রতি নিবীড় আত্মীয়তা অনির্বচনীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তার নেপথ্যে কবির জীবনদেবতার প্রতি আকুতি সহস্রধারায় ঝরে পড়ছে।

রবীন্দ্রনাথকে যেন সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলল, "বাবা মশায়, আপনি তো জানেন, বৃটিশরা কী রকম রিসার্ভড স্বভাবের। মুখে তো তারা বিশেষ কিছু বলে না।"

"কী জানি রথী। মনে হচ্ছে মিঃ রোদেনস্টাইনকে ভীষণ অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেললুম। আমার জন্য তিনি যদি লজ্জা পান, আমার তাহলে দুঃখের অন্ত থাকবে না।"

প্রতিমা বলল, "বাবামশায় আপনি গাড়ির জানলার অত কাছে বসবেন না, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

"ঠাণ্ডা কোথায় বৌমা, আজ তো দেশের মতো উষ্ণ রাত।

সত্যি, বাইরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়ার লেশমাত্র নেই। যদিও এখন গ্রীষ্মকাল, তবু রাত্রিবেলায় এখানে মাঝে মাঝেই বেশ ঠাণ্ডা পড়ে। রবীন্দ্রনাথকে অনেক সময়েই চাদর গায় দিয়ে ঘুমোতে হয়।

কিন্তু আজ নয়। ট্যাক্সি যখন তাদের গন্তব্যস্থানে এসে দাঁড়াল, তখন রবীন্দ্রনাথ গাড়ি থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলেন ; নির্মেঘ আকাশ তারায় ছেয়ে আছে, দূরের সপ্তর্ষি মণ্ডল যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে নীরব অভয়বাণী প্রেরন করছে।

·

সে রাত্রে কবি ইয়েট্‌স্‌-এর চোখে ঘুম এল না। তাঁর পঠিত কবিতাগুলি তাঁর মনের মধ্যে অপরূপ সুরের মাধুর্য নিয়ে বার বার

অনুরণিত হচ্ছিল। এই 'গীতাঞ্জলি'র পাণ্ডুলিপি তিনি এ কয়দিন সবসময়ে সঙ্গে সঙ্গে বহন করেছেন এবং সুযোগ পেলেই একটু করে পড়ে নিয়েছেন। এখন সবার সামনে সেই কবিতাগুলি উচ্চস্বরে আবৃত্তি করার পর মনের অবচেতন মানসে সেগুলি যেন আরও দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়ে গেছে।

পরের দিন সকালে তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী কবি এজরা পাউণ্ডের সঙ্গে দেখা হতেই ইয়েট্‌স্ বললেন, "টেগোরের এই কবিতাগুলি পড়ার পর মনে হয় কেন আমরা লিখি! এ যেন বিধাতার নিজের হাতে তৈরী করা অনবদ্য সৃষ্টি।"

সে অবস্থা হয়েছে এজরা পাউণ্ডেরও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গুলি তাঁকে ভীষণভাবে উদ্বেলিত করেছে। তাঁর মনে হয়েছে কবিতাগুলিতে যখন তারার বর্ণনা করা হয়েছে, তখন সেগুলি পতাকালাঞ্ছিত তারা নয়, স্বর্গীয় আকাশের উজ্জ্বল তারকা। তিনি ছিলেন শিকাগোর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের বৈদেশিক প্রতিনিধি। সেইদিনই সেই পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যায়িয়েট মনরোকে লিখলেন, "টেগোরের জন্য পত্রিকায় স্থান রাখবেন। তিনি বাংলাকে গান গেয়ে 'জাতি' হিসাবে অভিসিক্ত করেছেন।"

তরুণ কবি টমাস স্টার্জ মোর তাঁর বন্ধু রবার্ট ট্রেভেলিয়ানকে এক চিঠিতে সুররিয়ালিস্টিক ভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনার সেই অভিজ্ঞতা লিখলেন।

"......তারারা যেন একসাথে গান গাইল। প্রত্যেকে চুপ করে শুনছিল, তারার হঠাৎ যেন বাদ্যযন্ত্রের একটি তার ছিঁড়ে গেল। কে যেন চিৎকার করে বলল একটি তারা হারিয়ে গেছে। তারপর সবাই সেই হারানো তারা খুঁজতে লাগল। সভাকক্ষে একটি গুঞ্জন উঠল। তারপর তারারা আবার একে একে গান শোনাতে লাগল। আবার সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা ফিরে এল যা যেন কোনদিনই হারায়নি...... "

আর রেভারেণ্ড চার্লস অ্যাণ্ড্রুজ সে রাত্রে সোজাসুজি বাড়ি ফিরতে পারলেন না। বন্ধু হেনরী নেভিনসনের সঙ্গে হেম্পস্টেড হিল্‌-এর পাশ দিয়ে দুজনে চুপচাপ হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁরা দুজনেই তখন তাঁদের ভাবের গভীরে নিমগ্ন, এই সুন্দর অনুভূতির সলিলে যতক্ষণ পারেন অবগাহন করতে চান। নেভিনসনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আণ্ড্রুজ হিথ্‌ পার হলেন। নির্মল আকাশের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হোল আজ যেন এক ভারতীয় উষ্ণ সন্ধ্যা। তাঁর মনে তখন কেবলই ধ্বনিত হচ্ছিল ইয়েট্‌স্‌-এর পড়া দুটি লাইন ঃ

On the seashore of endless worlds childrcn meet.
On the seashore of endless worlds is the great meeting place of children.

তাঁর মনে হচ্ছিল তিনি যেন তাঁর শিশুজীবনে ফিরে গেছেন, সেই সমুদ্রতীরে পিতা-মাতার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে বালি নিয়ে খেলা করছেন, খেলাঘর তৈরী করছেন আর ভাঙ্‌ছেন। প্রায় সারারাত তিনি সেই ঘোরে একা একা ঘুরে বেড়ালেন, তারপর ভোরের আলো উঠতেই বাড়ি ফিরলেন।

পরের দিনই রবীন্দ্রনাথের কাছে রোদেনস্টাইনের টেলিফোন এলো। "ওহ্‌, মিঃ টেগোর, আপনি ধারণাই [illegible]তে পারবেন না আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার কাছে কত চিঠি এসেছে। প্রত্যেকে আপনার কবিতার প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। অনুগ্রহ করে আজ বিকেলে আমার বাড়িতে আসুন, আমাদের সঙ্গে চা-পান করবেন।"

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের স্টুডিও ঘরে গিয়ে বসতেই তিনি এক গোছা চিঠি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। "এই দেখুন সবাই আমার কাছে লিখেছে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে। বলেছেন এমন কবিতা তারা কোনদিন শোনেন নি। এগুলির সুর এখনও

তাদের মনে লেগে রয়েছে। যে সিন্‌ক্লেয়ার আলাদাভাবে আপনার নামে এক চিঠি দিয়েছেন, এই যে পড়ে দেখুন।"

রবীন্দ্রনাথ খামে বন্ধ-করা চিঠিটা খুলে পড়তে লাগলেন ঃ

"আমি কী এখন বলতে পারি যে আমি যতদিন বেঁচে থাকবো ততদিন এই কবিতাগুলির পাঠের অনুভূতি ভুলবো না, এমনকি যদি আর কোনদিন তা না-ও শুনি। শুধু এই নয় যে এগুলির শ্বাশত সৌন্দর্য আছে যা কবিতা হিসেবে নিঁখুত, কিন্তু এগুলিকে যেন ঐশ্বরিক জিনিস হিসেবে আমার কাছে প্রকাশ করা হয়েছে যা আমি শুধু আলোর ঝলক হিসেবে ও বেদনাময় অনিশ্চয়তার মধ্যে খুঁজে পাই।......আপনি ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা-ই যা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও পূর্ণাঙ্গ। যা ইংরেজী বা যে কোন পশ্চিম দেশীয় ভাষার মধ্যে প্রকাশিত হতে না পেরে এতদিন হতাশ হয়ে পড়েছিল।"

চিঠিটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর হাত বাড়িয়ে রোদেনস্টাইনের হাতে দিলেন। রোদেনস্টাইন পড়া হয়ে গেলে বললেন, "আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি মিঃ টেগোর যে আপনার কবিতা এক ভিন্ন ভাবমণ্ডল তৈরী করেছে। আপনার কবিতার মধ্যে এমন জাদু লুকিয়ে আছে যা লোকের বার বার পড়তে ইচ্ছে করে, পড়ার পরও লাইনগুলি ভুলতে পারে না। এই যে ইয়েট্‌স্‌-এর নোট। আপনাকে চা-পানের জন্য ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন।"

তারপর একটু চুপ করে থেকে রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আমাদের এখানে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' বলে একটি সংস্থা আছে যার কথা আমি আগেই আপনাকে বলেছি। আমি ওদের মাধ্যমে আপনার এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ করার চেষ্টা কোরব। তবে আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে ছাপানোর আগে ইয়েট্‌স্‌কে পুরো ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট একবার দেখিয়ে নিতে চাই।"

"আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই মিঃ রোদেনস্টাইন, "রবীন্দ্রনাথ সজোরে মাথা নাড়লেন। "ইয়েট্‌স্‌-এর মতো কবি যদি আমার কবিতা সংশোধন করে দেন, তাহলে সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য।"

"আমি অবশ্যি ইয়েট্‌স্‌কে বলব যদি তাঁর সময় হয় তাহলে এই বইয়ের একটি ভূমিকা লিখে দিতে," রোদেনস্টাইন যোগ করলেন।

পরের শনিবার রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমাকে নিয়ে বিকেলবেলায় ইয়েট্‌স্‌-এর বাড়িতে গেলেন। ইয়েট্‌স্‌-এর ফ্লাট হচ্ছে রাসেল স্কোয়ারের কাছে ওবার্ন প্লেসে। বেল টিপতেই ইয়েট্‌স্‌ দরজা খুলে রবীন্দ্রনাথ ও রথীর সঙ্গে করমর্দন করে ওদের সোফায় বসালেন। সেখানে তাঁর সেক্রেটারী এজরা পাউণ্ড ছিলেন, তিনিও এগিয়ে এসে ওঁদের সঙ্গে করমর্দন করলেন।

ইয়েটস্‌ বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি জানেন না আপনার কবিতাগুলি আমাকে কীভাবে অভিভূত করেছে! আমি এ কয়দিন প্রায় সারাক্ষণই আপনার কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করেছি। আমি যেখানেই গিয়েছি সর্বত্রই আপনার এই কবিতাগুলি আমার কোটের পকেটে ফিরেছে এবং সুযোগ পেলেই একটু করে পড়ে নিয়েছি। ট্রেনের মধ্যে, দোতলাবাসের ওপরের তলায় বসে, এমনকি রেস্টোরেণ্টে খেতে বসেও পড়েছি। কিন্তু একনাগাড়ে বেশীক্ষণ পড়তে পারিনি, কবিতার অন্তর্নিহিত সুর আমাকে এমন-ভাবে অভিভূত করেছে খাতাটি বন্ধ করে মনে মনে আবৃত্তি করে তার রস আহরণ করেছি।"

এ সব কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ইয়েট্‌স্‌কে প্রথমে দেখেই তাঁর প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হয়েছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল ইনি যেন প্রাচীন ভারতের কোন বৈদিক পুরুষ। তাঁর সেই দীর্ঘ দেহ, মাথার একরাশ চুল ও চোখের চশমার ভেতর

দিয়ে জ্ঞানের সমুদ্ভাসিত আভা যেন ঠিকরে পড়ছে।

দেশে থাকতে রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা বিশেষ পড়েননি। কিন্তু এখানে এসে রোদেনস্টাইন তাঁর আঠার শ উননব্বুই সালে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'Thc Wanderings of Oisin' পড়তে দিয়েছিলেন। পড়ে রবীন্দ্রনাথ ভীষণ মুগ্ধ হয়ে গেছেন। তাঁর মনে হোল ইয়েট্‌স্‌ আসলে হচ্ছেন বিশ্বজগতের কবি, সাহিত্য-জগতের কবি নন। অর্থাৎ কবি সুইনবার্নের মতো কাব্যের কারু-কৃত্যির মধ্যে আবদ্ধ থাকেননি, ওয়ার্ডওয়ার্থ-এর মতো বিশ্বপ্রকৃতিকেই কাব্যের বাহন করেছেন। তিনি আয়র্ল্যাণ্ডের পুরোনো ঐতিহ্য ধরেই এগিয়েছেন, কিন্তু মানবাত্মার অন্তরের কথাই সেখানে বলেছেন যা আয়র্ল্যাণ্ডের মতো সমস্ত মানবজাতির কথাই।

একটু চুপ করে থেকে ইয়েট্‌স্‌ বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম তখন একটু চমকে উঠেছিলাম, কারণ বার বার আমার আর একজন ভারতীয়র কথা মনে পড়ছিল। তাঁর নাম মোহিনী চ্যাটার্জি, জানি না আপনি তাঁর নাম শুনেছেন কিনা।"

"দেশে থাকতে তাঁর নাম শুনেছি। উনি একজন থিয়োজফিস্ট নন কী?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"হ্যাঁ, এককালে মাদাম ব্লাভাৎস্কির অন্যতম শিষ্য ছিলেন তিনি। মাদাম ব্লাভাৎস্কির থিয়োজফি আন্দোলনের কথা নিশ্চয়ই জানেন।"

"তাঁরই এক শিষ্যা এনি ব্যাসাণ্ট ভারতে কংগ্রেস পার্টি গঠনের এক মূল ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমেই আমরা থিয়োজফি আন্দোলনের পরিচয় পেয়েছি।"

"আপনি হয়ত জানেন না যে এককালে আমি এই থিয়োজফি আন্দোলনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলাম। মাদাম ব্লাভাৎস্কির লেখা আমাকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল। তিনি তো ভারতেও গিয়েছিলেন, বলেছেন যে তিব্বতের মহাত্মাদের কাছ

থেকে তিনি সব গূহ্যতত্ত্ব শিখে এসেছিলেন। পৃথিবীর ভূত-ভবিষ্যৎ জানার চাবিকাঠি নাকি পেয়েছিলেন।"

"আমাদের দেশে তন্ত্রসাধনার গূহ্যতত্ত্ব একটি বড় জিনিষ", রবীন্দ্রনাথ বললেন। "কিন্তু প্রকাশ করলে তার গুণ নষ্ট হয়ে যায়।"

"মাদাম ব্লাভাৎস্কি সবার কাছে তা প্রকাশ করেননি, তাঁর শিষ্যদের কাছেই করেছেন। মোহিনী চ্যাটার্জি তাঁর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি আমাদের একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক-দিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে বিছানায় বসে এই প্রার্থনা করবে ঃ "I have lived many lives, I have been a slave and a prince. Many a beloved has sat upon my knees, and I have sat upon the knees of many a beloved. Everything that has been shall be again."

"বাঃ ভারি সুন্দর কথা বলেছেন তো মিঃ চ্যাটার্জি। আমারও মনে হয় যে মানুষের আত্মা যখন এত অমূল্য, তখন এক জন্মেই তা নিঃশেষ হয়ে যায় না। সেদিন মিঃ স্টাফোর্ড ব্রুক্‌স্ সঙ্গে এই নিয়েই কথা হচ্ছিল। তিনিও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেন। তিনি একটি কথা বলেছেন যা আমার ভারী ভাল লেগেছে। তিনি বলেছেন যে নানা জন্মের মধ্য দিয়ে আমরা যখন একটি জীবনচক্র সমাপ্ত করব, তখন আমাদের পূর্বজন্মের সমস্ত স্মৃতি সম্পূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে উঠবে।"

"ভারি সুন্দর ভাবটি। জানেন আপনার প্রতি আমি যে এতো আকৃষ্ট হয়েছি তার এক প্রধান কারণ আপনার কবিতার অন্তর্নিহিত মিস্টিমিজম্। আমাকেই তো অনেকেই অনুযোগ করে যে আমার মধ্যে 'কেল্টিক্ মিস্টীমিজম্' বড় বেশী। এজরা তার মধ্যে একজন। ও তো আমার কবিতাকে অন্য খাতে বহাতে চায়। ওর 'ইমেজিস্‌ম' আন্দোলন!

ইয়েট্‌স্‌-এর কথায় সবাই হেসে উঠলেন। এজরা পাউণ্ড চুপ করে থাকলেন, কোন কথা বললেন না। তিনি জানেন যে তাঁর এই 'ইমেজিস্‌ম্‌' আন্দোলন ইয়েট্‌স্‌-এর জন্য নয়।

ইয়েট্‌স্‌ আবার বলতে শুরু করলেন, "রোদেনস্টাইন আমাকে বলেছেন যে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটির' মাধ্যমে আপনার বইটি প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন। আমাকে আপনার ম্যানুস্‌ক্রিপ্টটি দেখতে বলছেন। কিন্তু মিঃ টেগোর, আপনার অনুবাদ তো অনবদ্য হয়েছে, এগুলি কোন সংশোধনের অপেক্ষা রাখে না এর এক শব্দ পরিবর্তন করলে অর্থবিকৃতি ঘটবে।"

"তবু আমি অনুগৃহীত হবো আপনি যদি এর দোষ ত্রুটি একটু শুধরে দেন।"

"ঠিক আছে আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে আমি সানন্দে দেখে দেবো। রোদেনস্টাইন অনুরোধ করেছেন একটি ভূমিকা লিখে দিতে। এতে আমি গৌরবান্বিতই বোধ করব মিঃ টেগোর। তিনি আরো বললেন যে আপনি নাকি আপনার কয়েকটি নাটকের ইংরেজী অনুবাদ শুরু করেছেন।"

"আমি করছি না, তবে ইস্ট-ওয়েস্ট 'সোসাইটির' মিঃ কেদার দাসগুপ্ত বলেছেন যে এখানকার দুজন বাঙালী ছাত্র তা করতে ইচ্ছুক।"

"তর্জমা হলে আমাকে একবার দেখাতে পারেন। ডাবলিন এ আমাদের 'অ্যাবি থিয়েটার' বলে একটি গ্রুপ আছে সেখানে আমার নাটকও অভিনীত হয়েছে। আমি এই দলের মাধ্যমে আপনার নাটকের অভিনয়ের জন্য চেষ্টা করতে পারি।"

"সেটি হবে আমার পরম সৌভাগ্য, মিঃ ইয়েট্‌স্‌।"

"আপনাকে যে কোন ভাবে সাহায্য করতে পারলে আমিই কৃতার্থবোধ কোরব, মিঃ টেগোর," ইয়েট্‌স্‌ তাঁর স্বাভাবিক সৌজন্যের স্বরে বললেন।

ওঁর ফ্লাট থেকে বেরিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল রোদেনস্টাইনের মতো ইয়েট্‌স্‌-এর সান্নিধ্যে আসতে পারাও ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহ ছাড়া আর কিছু নয়। এই কদিন মাত্র তিনি লণ্ডনে এসেছেন, এরই মধ্যে এই দুজনের সৌজন্যে কত গুণীজনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ধন্য হয়েছেন। দেশে থাকতে যে এঁদের সাক্ষাৎ পাবেন তা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। এখন সর্বত্রই যেন তাঁর জন্য দরজা খুলে যাচ্ছে।

ইয়েট্‌স্‌ ও রোদেনস্টাইন দুজনেই অনুভব করেছেন যে রোদেন-স্টাইনের বাড়ির বৈঠকে মাত্র সামান্য কয়েকজনই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন, কিন্তু অনেক গুণীব্যক্তিরাই তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য সমান উৎসুক। বিশেষ করে 'গীতাঞ্জলি' যদি লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া সোসাইটির' উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, তাহলে তার সভ্যদের সাথেও রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হওয়া উচিত। তাই তাঁরা ঠিক করলেন যে এই সংস্থার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানো হবে।

দশই জুলাই লণ্ডনের ট্রাকেডারো হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে এক নৈশভোজের আয়োজন করা হোল। সভায় ইংলণ্ডের প্রায় সব নামী সাহিত্যিক ও সুধীবর্গই উপস্থিত ছিলেন। রোদেন-স্টাইন, এইচ জি ওয়েলস্‌, মে সিন্‌ক্লেয়ার, নেভিন্‌সন্‌, হ্যাভেল, অর্নেস্ট রাইস্‌, এভেলিন আণ্ডারহিল, আর্থার ফক্সস্ট্র্যাংওয়েল, এজরা পাউণ্ড ও তাঁর ভাবী স্ত্রী ডরোথী শেকস্‌পীয়ার ইত্যাদি সবাই সেখানে উপস্থিত। ইয়েট্‌স্‌ হলেন সেই সভার সভাপতি।

ডিনার খাওয়ার পর ইয়েট্‌স্‌ উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর ভাষণে বললেন, "একজন শিল্পীর জীবনে সেইদিনই সবচেয়ে বড় ঘটনার দিন যেদিন তিনি এমন একজন প্রতিভার রচনা আবিষ্কার করেন, যার অস্তিত্ব তিনি পূর্বে অবগত ছিলেন না। আমার কাব্যজীবনে এই একটি

মহৎ ঘটনা উপস্থিত হয়েছে যে আজ মিঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে সংবর্ধনা ও সম্মান করার ভার আমি পেয়েছি। দশ বছরের মধ্যে তাঁর লিখিত প্রায় একশটি গীতি কবিতার গদ্যানুবাদের একটি খাতা আমি আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছি। আমার সমসাময়িক এমন কোন ব্যক্তিকে আমি জানি না যিনি এমন কোন রচনা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করেছেন যা এই কবিতাগুলির সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।"

এরপর ইয়েট্‌স্‌ 'গীতাঞ্জলির' ইংরেজী অনুবাদ থেকে 'জীবনের সিংহদ্বারে পশিনু যে ক্ষণে' ও 'শ্রাবণ ঘন গহন মোহে' আবৃত্তি করে শোনালেন। ইয়েট্‌স্‌-এর পর আরো দু-তিনজন উঠে রবীন্দ্রনাথের কবিতার প্রশংসা স্তুতি করলেন। একজন বললেন যে ভারত থেকে যদি এরকম অনেক অমায়িক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ইংল্যাণ্ডে আসেন, তাহলে বৃটেনে ভারতের সম্মান অনেক বৃদ্ধি পাবে।

এবার রবীন্দ্রনাথের উত্তর দেবার পালা। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত কণ্ঠে বললেন, "আজ এই সন্ধ্যায় আপনারা আমাকে সম্মানিত করলেন, আমার ভয় হয়, যে ভাষার মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করিনি, সে ভাষায় আপনাদের ধন্যবাদ জানাবার যথেষ্ট ক্ষমতা আমার নেই।......সেই জন্য আমি কেবলমাত্র আপনাদের এইটুকু স্পষ্ট করে বলতে পারি যে, এ দেশে আসা অবধি যে নিরবিচ্ছিন্ন প্রীতি দ্বারা আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন তা আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে আমি প্রকাশ করে বলতে পারি না। আমি একটি শিক্ষালাভ করেছি—এবং সহস্র মাইল পথ সেই শিক্ষালাভের জন্য আমার আসা সার্থক—যে, যদিও আমাদের আচারব্যবহার সমস্তই পৃথক তবু ভেতরে আমাদের হৃদয় এক। নীলনদীর তীর যে বর্ষার মেঘ উৎপন্ন হয় সে যেমন সুদূর গঙ্গার উপত্যকাকে শস্যশ্যামল করে দেয়, তেমনি পূর্বাকাশের সূর্যালোকের অনিমেষ দৃষ্টির নিচে যে আইডিয়া আকারপ্রাপ্ত হয়েছে তাকে হয়ত সমুদ্র পার হয়ে পশ্চিমে

আসতে হবে—সেখানকার মানুষের হৃদয়ের মধ্যে তার সম্ভাষণ লাভের জন্য, সেখানকার সমস্ত সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করবার জন্য। প্রাচী প্রাচীই এবং প্রতীচীও প্রতীচী সন্দেহ নেই এবং ঈশ্বর না করুন যেএর অন্যথা নয়—তবু এই দুইয়েই মিলতে পারে। না, সখ্যে শান্তিতে ও পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ পরিচয়ে এরা একদিন মিলবেই। এদের প্রভেদ আছে বলেই এদের মিলন আরো সফল মিলন হবে, আর সত্যিকারের প্রভেদ কখনো বিলুপ্ত হবার নয়—তা এদের উভয়কেই বিশ্বমানবের সাধারণ বেদিকায় এক পবিত্র বিবাহবন্ধনে মিলিত করবার দিকেই নিয়ে যাবে।"

সবাই সুদীর্ঘ করতালি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাষণকে অভিনন্দিত করলেন।

ভোজসভা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "চলো একটু পার্কে গিয়ে বসি। এতো লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথাবার্তায় হাঁপিয়ে উঠেছি, সোজা বিছানায় গেলে ঘুম আসবে না।"

"ঠিক আছে বাবামশায়," রথী উত্তর দিল। রবীন্দ্রনাথের মতো তাকেও আজকের ব্যাঙ্কোয়েট বিচলিত করেছে। ইংল্যাণ্ডের এতো শিক্ষিত সুধীবর্গ যে ভাবে কবির গুণগান করলেন, তাতে সে বিস্মিত হয়ে গেছে। দেশে এখবর চিঠি লিখে জানাতে হবে কিন্তু দেশবাসী কী এ সব কথায় বিশ্বাস করবে! তাদের অনেকেই ভাববে রবীন্দ্রানুরাগীদের এ সব তৈরী করা খবর।

কিন্তু লণ্ডনের 'দি টাইমস্' পত্রিকাও রবীন্দ্রনাথের এই সম্বর্ধনার খবর লক্ষ্য করেছে এবং এক এক সম্পাদকীয়তে তাঁর ভাষনের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। আর 'ম্যাঞ্চেষ্টর গর্ডিয়ান' পত্রিকা তো সরাসরিই লিখল "রবীন্দ্রনাথের আগমনে এ দেশে যে সম্মান, সম্ভ্রম, প্রশংসা ও কৌতুহলের উদ্দীপনা জেগেছে এবং রসিকসমাজে যে সাড়া পড়ছে, এমনটি এ যুগের লোকের জীবদ্দশায় কখনো প্রাচ্য

অতিথির জন্য দেখা হয়নি।"

দেশের কাগজগুলিতেও যে এ সংবাদ না পৌঁছবে তা নয়। 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রিকায় নাকি বেড়িয়েছে যে একজন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের লোক কবি সংবর্ধনায় রবীন্দ্রাথের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছে। অজিত চক্রবর্তী এ খবরটি কবিকে জানাতেই রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "পৃথিবীর কবির দাবীর উচ্চসীমা কোলাকুলি পর্যন্ত—প্রনামের দ্বারা তার জাত যায়; আমি কবি ছাড়া যে আর কিছু নই সে বিষয়ে কোন সন্দেহমাত্র নেই। আমি তোমাদের হৃদয়ের সমভূমিতে দাড়াতে চাই...আমাকে ভুল আসনে তোমরা বসিয়ো না। আমি তোমাদের বন্ধু, কিছু দেবো, কিছু নেবো।...গুরুর পর্ব আমার নয়, নয়, নয়। আমি নিজে কিছু শিখিনি এবং কাউকে শেখাতেও পারব না......।"

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এও জানেন যে লোকে এসব কথা শুনবে না, তাঁকে 'গুরুদেব' বলে পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে চলবেই। সেই যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সময়ে তাঁকে 'গুরুদেব' বলে আচার্যের আসনে বসিয়েছিলেন, তারপর তাঁর শতচেষ্টাতেও এ সম্বোধন আর গেল না, উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। মনে হচ্ছে তাঁর আমৃত্যু পর্যন্ত লোকে দ্বিগুণ উৎসাহে তাকে এই নামে সম্বোধন করে চলবে।

এই ভোজসভার আগেই রবীন্দ্রনাথ কেম্ব্রিজ গিয়েছিলেন কিংস্ কলেজের অধ্যাপক লোয়েল্ ডিকিন্সনের আমন্ত্রণে। ডিকিন্সন 'জন চীনাম্যানের পত্র' নামে গ্রন্থের লেখক। বইটি যখন প্রথমে বেরোয়, তখন তার পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমালোচনা দেশ-বিদেশে প্রচুর আলোড়ন তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় তার এক বিরাট সমালোচনাও প্রকাশ করেছিলেন। আর সবার মতো তিনিও ভেবেছিলেন যে লেখক চীনদেশীয়। পরে জানতে পারলেন যে তিনি বৃটিশ। তাঁর সঙ্গে তখন পত্রালাপও

হয়েছিল। তাঁর কাছ থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসতে রবীন্দ্রনাথ দুদিনের জন্য কেম্ব্রিজে গেলেন।

অধ্যাপক ডিকিনসনের সঙ্গে আলাপ হয়ে রবীন্দ্রনাথের মন খুসীতে ভরে গেল। এই সময়ে তাঁর বাড়িতে অধ্যাপক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গেও কবির আলাপ হোল। রাসেলের বৈদগ্ধে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। রাত্রে ডিনার খাবার পর কলেজের বাগানের প্রাচীন তরুরাজির মাঝে বসে তাঁরা নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেন। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি কোন বিষয়ই বাদ গেল না।

গণিতের অধ্যাপক রাসেলের জ্ঞানের পরিধি দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল গণিতের তেজ এঁর মনকে শুষ্ক করেনি, বরং আলোকিতই করেছে। এই নিস্তব্ধ উদ্যানে অন্ধকারের মধ্যেও প্রাণের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। কবির মনে হোল যে বৃহৎ বিশ্বের নীরবতা যেন মানুষের মধ্যে বাণী-আকারেই প্রকাশ করছে। এই বাণী-স্রোতের মধ্যেই বিশ্বের আত্মোপলব্ধি, তার নিরন্তর আনন্দ।

ডিকিনসনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে তাঁর নিজের লেখা গান গেয়েও শোনাতে হোল। তাঁর অনিন্দ্য কণ্ঠস্বর ও অশ্রুত সুরের পরশ তাঁদের প্রাণে এক অপূর্ব অনুভূতির স্বাদ এনে দিল। সেই বৈঠক ভাঙতে ভাঙতে সেদিন রাত এগারোটা হয়ে গিয়েছিল।

কেম্ব্রিজ থেকে ফিরে রবীন্দ্রনাথ যথারীতি রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে এসেছেন, এমন সময় তিনি কবিকে একটি চিঠি দেখালেন। লিখেছেন মিসেস ফ্রান্সিস্ কর্নকোর্ড যিনি ছিলেন বিখ্যাত জীব-বিজ্ঞানী চার্লস্ ডারউইন্-এর নাতনী। তিনি লিখেছেন ঃ

"আমি আপনাদের দুজনকেই লিখে জানাচ্ছি যে টেগোরকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আপনারা তাঁর সম্পর্কে যা বলেছিলেন এখন আমি তার অর্থ বুঝতে পারছি। তিনি যথার্থই সাধুপুরুষ, তাঁর দেহের সৌন্দর্য ও চরিত্রের মর্যাদা মনে রাখবার

মতো।...এ দেখে আমার মনে হয় আমরা পশ্চিমবাসীরা প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব ও কোমলতা কাকে বলে তা সামান্যই জানি। আমাদের কাছে এ সব প্রায়ই ভাবপ্রবণতা ও দুর্বলতা বলে প্রতিভাত হয়। কিন্তু তাদের কাছে এগুলি ক্ষমতা ও মর্যাদারই সমতুল্য। আমি এখন শক্তিশালী অথচ কোমলস্বভাব খৃষ্টকে কল্পনা করতে পারি যা আগে কোনদিন পারতাম না। তিনি বললেন যে আপনাকে দেখার আগে ভারতে গত দশ বছরে কোন ইংরেজকে দেখেন নি। ইংরেজরা তাহলে ওখানে কী করছে? অনেক সময়ে নিজেদের অন্ধ বর্বর বলে মনে হয়।”

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের হাতে চিঠিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “মিঃ রোদেনস্টাইন অনুগ্রহ করে আমাকে এ সব চিঠি দেখাবেন না। এগুলি পড়তে আমি ভীষণ লজ্জিত বোধ করি।”

“সে আমি জানি মিঃ টেগোর। আমার আসল কারণ হচ্ছে আপনাকে বলা যে আপনি ইংরেজীতে বক্তৃতা দিতে কোন কুণ্ঠাবোধ করবেন না। শুধু আপনার বলার ভঙ্গীই নয়, আপনার নির্ভুল ইংরেজী ও স্পষ্ট উচ্চারণ সবাইকেই আকৃষ্ট করে। ট্রকেডারো হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েটে আপনার বক্তৃতা শুনেই আমি তা বুঝতে পেরেছি।”

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে শুনলেন। জানেন ইনি প্রকৃত বন্ধু, তাই তাঁর কোন দোষত্রুটি দেখতে পান না।

এমন সময়ে কেদার দাসগুপ্তের কাছ থেকে শুভ সংবাদ এলো। কবির ‘দালিয়া’ নাটকের ইংরেজী অনুবাদ তৈরী হয়ে গেছে, নাম দেওয়া হয়েছে ‘দি কুইন অফ্ আরাকান্’। রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্য গোটা পাণ্ডুলিপিটি কয়েকদিনের মধ্যেই পাঠানো হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ এই নাটকের জন্য একটি ইংরেজী গান রচনা করতে বসলেন। এই ধরনের সনাতন পদ্ধতিতে ইংরেজী গান লেখা এই তাঁর প্রথম:

"The bee is to come and the bee is to hum
Till the heart of the flower comes out.
The bud says 'yea', and the bud says 'nay',
She sways with a fear and a doubt.
O errand of wayward wings,
O great of the sumptuous summer,
Give up the hope, yet keep, yet keep up thy heart,
O sunny day's new-comer !
Whisper in tearful tunas untired
And wait with a faith devout.
For the bud says 'yea', and the bud says 'nay',
She sways with a fear and a doubt."

নাটিকাটি তিরিশে জুলাই লণ্ডনের রয়াল অ্যালবার্ট হলে অভিনীত হোল। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী নাটকের অভিনয়। বিদেশী বিষয়, বিদেশী নাট্যকার। কিন্তু লণ্ডনের থিয়েটারমোদীদের তা খুবই ভাল লাগল। পরের দিন সংবাদপত্রে প্রশংসাময় সমালোচনাই বেরোল।

'ডাকঘর' নাটকের ইংরেজী অনুবাদও প্রায় তৈরী। এই নাটকটি ইয়েট্স্-এর ভীষণ ভাল লেগেছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন নিজে সংশোধন করে দিতে। তারপর আয়র্ল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে ডাবলিনে তাঁর 'অ্যাবি থিয়েটার'-এ ইয়েট্স্ নিজের পরিচালনায় সেই নাটকটি মঞ্চস্থ করালেন।

রবীন্দ্রনাথের মনে হোল ইয়েট্স্-এর কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই। এ রকম সহৃদয় মানুষ এ কালে কেন, সেকালেও দুর্লভ। তাঁর দীর্ঘ দেহ, উঁচু কপাল ও ধীর-স্থির পদক্ষেপ দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হোত যেন প্রাচীন ভারতের কোন আর্য ঋষি তপোবন থেকে বেরিয়ে এসেছেন জীবের কল্যানের জন্য।

॥ তিন ॥

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে ব্লুমস্‌বেরী হোটেল ছেড়ে কয়েকদিন পরেই সাউথ কেংসিংটনের ২ নং হল্‌ফোর্ড রোডের বোর্ডিং হাউজে উঠে এসেছেন। হোটেলের এক ঘেয়ে খাওয়া খেয়ে ওরা আর পেরে উঠছিলেন না। হোটেলে খাওয়া মানেই তো সেই রোস্ট বিফ, বাঁধাকপির সেদ্ধ, ইয়র্কশায়র পুডিং ও গুজবেরী টার্ট। এখন অন্তত প্রতিমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে।

এই বোর্ডিং হাউজটি ক্রমওয়েল রোডের ওপর স্থাপিত ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস্‌ হোস্টেলের কাছে। এটি দুই অবিবাহিতা বেলজিয়ান ভগ্নী চালাত। রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে তারা ভীষণ খুশী, বিশেষ করে প্রতিমার সঙ্গ পেয়ে। এমন বোর্ডার তারা জীবনে দেখেনি। কবিরও এই দুই ভগ্নীর নির্মল অন্তঃকরণের পরিচয় পেয়ে ভাল লাগল।

তাঁর মনে পড়ল বাইশ বছর আগের কথা যখন তরুণ বয়েসে তিনি এই লণ্ডনে ডাঃ স্কটের বাড়িতে বোর্ডার হিসেবে কিছুদিন ছিলেন। তাদের দুই মেয়ে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল, সারাক্ষণ 'রবি', 'রবি', করত। আর মিসেস স্কটতো মায়ের স্নেহ দিয়ে সারাক্ষণ তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। দেশে ফেরার সময় তাদের সকলেরই সে কী কান্না! মিসেস স্কট বার বার বলতে লাগলেন, "যদি এই কয়দিনের জন্যই আসবে, তাহলে এলে কেন?"

রবীন্দ্রনাথের ভয় হোল এই বেলজিয়ান ভগ্নীদ্বয়ের না সেই অবস্থা হয়। যেমন করে তারা ডিনারের পরে মেইন পার্লারে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে থাকে! তখন তাদের মুখে এক কথা "মিঃ টেগোর, আপনি ইণ্ডিয়ার কোন গল্প বলুন।"

রবীন্দ্রনাথও ওদের অনুরোধে মুখে মুখে ইংরেজী অনুবাদ

করে তাঁর গল্পগুচ্ছ-এর কয়েকটি গল্প বলেছেন। শুনে তারা ভীষণ মুগ্ধ। একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর ক্ষুধিত পাষাণ গল্পটি বললেন। সেই শুনে তাদের গল্প শোনার দাবী আরো অনেক বেড়ে গেল। কিছুতেই পিপাসা মিটতে চায় না।

প্রতিমাকে তারা সবচেয়ে বেশী আঁকড়ে ধরেছে। তার কাছ থেকে তারা ইণ্ডিয়ান রান্না শিখবে। বিশেষ করে 'কারি', তারা কিছুতেই বুঝতে পারে না সব কিছুই কী কোরে 'কারি' হয়। চিকেন বা ল্যাম্বও 'কারি' আবার ফুলকপি বা ছানা দিয়েও কারি করা যায়। প্রতিমা হাসি চেপে তাদের বুঝিয়ে বলল যে 'কারি' হচ্ছে রান্নার পদ্ধতি যাতে ঝাল-মসলা দেওয়া ঝোল থাকে। তার উপাদান মাংস বা ভেজিটেবিল যাই হোক না কেন।

ক্রমে ক্রমে রোদেনস্টাইনের স্টুডিও রবীন্দ্রনাথের পরম আড্ডাস্থল হয়ে উঠল। রোদেনস্টাইন বসে বসে ছবি আঁকেন আর রবীন্দ্রনাথ একটি চেয়ারে বসে তা দেখেন। রোদেনস্টাইন তখন ভারতীয় ছবি দিয়ে লণ্ডনের "হাউস অফ কমন্স্" এর একটি অংশ ভরিয়ে তোলার জন্য বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কমিশন পেয়েছেন। তার প্রিয় বিষয় হচ্ছে বারাণসীর ঘাটের দৃশ্য, যার অংশ হিসেবে তিনি কালী মোহন ঘোষের পোর্ট্রেট বেছে নিয়েছেন।

সেই সময় হচ্ছে নতুন দিল্লী গঠনের যুগ। তাই নিয়ে লুট্যেন ও অর্নেস্ট হ্যাভেলের মধ্যে ঘোরতর মতবিরোধ। লুট্যেন চেয়েছিলেন নতুন দিল্লীর স্থাপত্য মুসলমান আদলের হোক, হিন্দু স্থাপত্যের ওপর তাঁর কোন আস্থা নেই। অধ্যাপক হ্যাভেল চেয়েছিলেন প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের ছাঁদে নতুন দিল্লী গড়া হোক। কিন্তু লুট্যেনের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি সরকারী কমিশন থেকে পদত্যাগ করেছেন। তিনিই রোদেনস্টাইকে অবনীন্দ্রনাথ ও ও গগনেন্দ্রনাথের সংবাদ দিয়েছিলেন যার সুত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোদেনস্টাইনের চাক্ষুষ পরিচয় হয় কলকাতায়।

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের ছবি আঁকা দেখতে দেখতে একদিন বললেন, "আপনি কী সহজে ছবি আঁকেন মিঃ রোদেনস্টাইন! জীবনে আমি কোনদিন আপনার মতো সচ্ছন্দগতিতে ছবি আঁকতে পারবো না।"

"কী যে বলেন, মিঃ টেগোর। আপনার অতো উচ্চ কল্পনা, ছবি তো আপনি তুলি ধরলেই ভেসে আসবে।"

"আপনার কাছে স্বীকার করতে বাঁধা নেই, আমি মাঝে মাঝে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছি, কিন্তু মনের ভেতরকার অসুন্দর মুখই যেন বেশী আসে, প্রকৃতির রমণীয় দৃশ্য বেশী আসে না।"

"আপনার যা মনে আসবে তাই আঁকবেন, মিঃ টেগোর। অসুন্দর বলে তা দূরে সরিয়ে রাখবেন না। ইম্প্রেশনিস্টদের ছবির কথা মনে রাখবেন। তারা সব সময়েই সুন্দর মুখ বা দৃশ্যের ছবি আঁকেননি।"

রবীন্দ্রনাথ অন্য কথায় চলে যাবার জন্য বললেন, "মিঃ রোদেনস্টাইন, সাহিত্যিক উইলিয়াম হাডসন্ আমার খুব প্রিয় লেখক। তাঁর সঙ্গে আলাপ হলে ধন্য হতাম। আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে?"

"নিশ্চয়ই। তাঁর লেখা তো আমারও ভীষণ প্রিয়। আমি আজই তাঁকে লিখে দিচ্ছি আমার বাড়িতে একদিন সময় করে চলে আসতে। মিঃ টেগোর, আমি লণ্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলের প্রায় সবাইকেই চিনি। আপনার সঙ্গে যার পরিচিত হতে ইচ্ছে হয় জানাবেন, আমি সম্ভব হলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো।"

উইলিয়াম হাডসনের জীবন বড় করুণ। সাহিত্য ছাড়া তাঁর আর এক প্রিয় বিষয় ছিল সঙ্গীত। যে মহিলাকে ভালবাসতেন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি সুন্দর গাইতেন বলে। মুগ্ধ হয়ে তিনি খালি তাঁর গান শুনতেন। কিন্তু বিয়ের পর হঠাৎ তার স্ত্রীর গলা ভেঙে গেল, তারপর থেকে তিনি ভীষণ ডিপ্রেশনে ভুগতেন

একদম গান গাইতেন না। সেই থেকে এলো নানারকম কঠিন রোগ। ফলে অধিকাংশ সময়ই তিনি শয্যাশায়ী। এই ব্যক্তিগত বেদনার অনুরণন যেন হাডসনের সব লেখার মধ্যেই ছিল, প্রকৃতির মাঝে তিনি যেন সঙ্গীত খুঁজে পেলেন।

এ সব বিষয় রবীন্দ্রনাথেরও পরম প্রিয়। যে দিন তিনি রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে হাডসনের সাক্ষাৎ পেলেন, স্বভাবতই তাদের আলোচনা সাহিত্য ও সঙ্গীতকে ঘিরে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ হাডসন, আপনার 'গ্রিন ম্যানসন' উপন্যাস ও ভ্রমণ কাহিনীগুলি যে আমার কী ভীষণ প্রিয় তা বোঝাতে পারবো না। আমার ছেলেমেয়েরা যখন ছোট ছিল, তখন তাদের বেডটাইম স্টোরী বলতে আপনার 'দি ন্যাচারলিষ্ট ইন্ লা প্ল্যাটা' থেকে গল্প পড়ে শোনাতাম।"

"তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ, মিঃ টেগোর," হাডসন সলজ্জে বললেন। "মিঃ রোদেনস্টাইনের কাছে শুনলাম ইণ্ডিয়াতে আপনিও এক বিখ্যাত কবি।"

"না, না এ হচ্ছে মিঃ রোদেনস্টাইনের অতিরঞ্জন। শুধু বাংলার কবি হিসেবে আমার একটু খ্যাতি আছে।"

"কেন, আপনার যে কবিতাগুলি ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন, সেগুলি রোদেনস্টাইন আমাকে দেখিয়েছেন। এ এক নতুন ধরনের কবিতা। এ গুলি যদি বই আকারে প্রকাশিত হয়, তাহলে কবি হিসেবে আপনার নামও এখানে ছড়াবে।"

"মিঃ হাডসন, আপনার লেখা আমার সবচাইতে ভাল লাগে প্রকৃতির প্রতি আপনার অনুরাগের জন্য। প্রকৃতি যে আমাদের পরম মিত্র, সে যে আমাদের শত্রু নয় আপনার লেখা থেকে এ জিনিষটি খুবই পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে।"

"প্রকৃতির মধ্যে আমি বিশেষ করে সঙ্গীতের লীলা খেলা দেখতে পাই, মিঃ টেগোর। এ যেন এক অদৃশ্য সিম্পনী যার অনুরণন

আমাদের আচ্ছন্ন করে আছে। মিঃ টেগোর, আপনি রোঁমা রোঁলার 'জ্যাঁ ক্রিস্তফ্' পড়েছেন ?"

"না, কিন্তু আমি তো ফরাসী ভাষা জানি না।"

"এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়েছে। যদি সময় পান তাহলে পড়ে দেখবেন। প্রকৃতি ও সঙ্গীতের মধ্যে যে নিবিড় সম্পর্ক আছে, এই ফরাসী লেখক এক যুবকের চোখ দিয়ে তার অপূর্ব ছবি এঁকেছেন।"

"নিশ্চয়ই সুযোগ পেলে এ বইটি পড়ব। কিন্তু আপনার দক্ষিণ আমেরিকার প্যাটাগনিয়ার ভ্রমণ কাহিনী পড়েছি, আপনার চোখ দিয়েই যেন এই মহাদেশটি দেখলাম !"

"আপনাকে বলি মিঃ টেগোর, আমেরিকা হচ্ছে আমার খুবই প্রিয় দেশ। আসলে আমার মধ্যে কিছুটা ইণ্ডিয়ান রক্ত আছে।"

"রেড ইণ্ডিয়ান রক্ত বলুন, ইস্ট ইণ্ডিয়ান নিশ্চয়ই নয়," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন।

"হ্যাঁ, আমেরিকান ইণ্ডিয়ান রক্তই। আমার মার দিক থেকে এসেছে। জানেন আমার সব চাইতে প্রিয় জায়গা হচ্ছে নিউ ইংলণ্ডের ভারমণ্ট, নিউ হ্যাম্পশায়ার ইত্যাদি রাজ্য। নিউ হ্যাম্পশায়রের হোয়াইট মাউণ্টেন দেখার আমার এতো ইচ্ছে !"

"তাহলে সুযোগ পেলে ঘুরে আসুন। আপনার লেখার পরিধিও বাড়বে, আর আমরাও সেই বিবরণী পড়ে লাভবান হবো।"

"ইচ্ছে তো খুবই করে মিঃ টেগোর, কিন্তু বাধা অনেক। স্ত্রী অসুস্থ, তারপর আর্থিক অসচ্ছলতা। আমার ভ্রমণ এখন হচ্ছে ইংলণ্ডের ব্রাইটন্ বীচ বা কাছাকাছি সমুদ্রতীর পর্যন্ত।"

শুনে রবীন্দ্রনাথের খারাপ লাগল। লেখক হিসেবে তিনি জানেন যে বই বিক্রির টাকা দিয়ে জীবন-যাপনই করা কঠিন, দেশ-

বিদেশ ঘোরা তো দূরের কথা। কিন্তু হাডসন তো সামান্য লেখক নন, অসামান্য প্রতিভার অধিকারী। তিনি যদি বিদেশ ঘুরতে না পারেন, তাহলে বিশ্বসাহিত্যই বিশেষভাবে রিক্ত হবে।

বিদায় নেবার সময় "মিঃ হাডসন বললেন, মিঃ টেগোর, প্লিজ কিপ্ ইন্ টাচ্। আর আপনার লেখার ইংরেজীতে অনুবাদ করতে ভুলবেন না। যেগুলি দেখেছি, সেগুলি আমার ভীষণ ভাল লেগেছে।"

"এ কথাটি বলার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ হাডসন", বলে দুহাত দিয়ে হাডসনের ডান হাত চেপে বিদায় দিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আর্নেস্ট হ্যাভেলের সম্পর্ক অন্য রকমের। মিঃ হ্যাভেল যখন কলকাতা স্কুল অফ্ আর্ট-এর প্রিন্সিপ্যাল ও তথাকার আর্টগ্যালারির রক্ষক ছিলেন, তখন থেকেই ঠাকুর বাড়িতে তাঁর যাতায়াত। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনি ছিলেন শিক্ষাগুরু। অবসর গ্রহণ করে তিনি আর তাঁর জন্মস্থান বেলজিয়ামে ফিরে যাননি, লণ্ডনেই এসে বাসা নিয়েছেন। এখন ভারতীয় শিল্পকলার এক প্রধান বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর খুব নাম। তিনিই হলেন লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক।

আসলে রোদেনস্টাইনের উনিশ শ এগার সালে ভারতে যাওয়া ও সেইসূত্রে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচিত হবার মূলে হ্যাভেলের এক বড় অবদান আছে। সমস্ত ঘটনাটাই শুরু হয়েছিল উনিশশ দশ সালের তেরই জানুয়ারী যখন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটি অব্ আর্ট-এর ভারতীয় শাখার সম্মেলন বসেছিল সেইদিন বিকালে। আলোচ্য বিষয় ছিল 'আর্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন্ ইণ্ডিয়া'। সেই সভায় দাঁড়িয়ে স্যার রবার্ট বার্ডউড্ শুধু ভারতীয় শিল্পকলারই নিন্দাবাদ করলেন না ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তিকে 'boiled suet Pudding' বলে বর্ণনা করলেন। সেই সভাতেই হ্যাভেল সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন যার সঙ্গে রোদেনস্টাইনই যোগদান করেছিলেন। সেইদিনই

তাঁরা ঠিক করলেন লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে যার মূল লক্ষ্য হবে ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত-কলার গ্রেট বৃটেন তথা ইউরোপে প্রচার করার। সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে একশ তিরানব্বুই জন সদস্য নিয়ে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হোল যার সভাপতি হলেন পালি ভাষার বিখ্যাত অধ্যাপক টি. ডব্লু. রাইস-ডেভিস্ এবং যুগ্ম সম্পাদক হলেন অর্থার এইচ. ফক্স-স্ট্যাংওয়েস। কিন্তু রোদেনস্টাইনই হলেন এই সোসাইটির প্রধান পুরোহিত, মুখ্য পরিচালক।

সেই থেকে রোদেনস্টাইনকে ভাবিয়ে তুলল ভারতে গিয়ে ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রকলার প্রত্যক্ষ পরিচয় নেওয়ার। তারপর যখন মিসেস খৃশ্চিয়ান হেরিংঘ্যাম-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হোল, তখন তাঁরা ভারতের পথে পা বাড়িয়ে আছেন। হ্যাভেলের কাছ থেকে অবনীন্দ্রনাথের ঠিকানা নিয়ে রোদনস্টাইন তাঁকে চিঠি লিখলেন। অবনীন্দ্রনাথ তখন হ্যাভেলের ছেড়ে দেবার পর কলকাতার স্কুল অফ্ আর্ট-এর অস্থায়ী অধ্যক্ষ। তিনি শুধু রোদেনস্টাইনকে সানন্দে আমন্ত্রণই জানালেন না, লিখলেন যে তাঁর কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকরা রোদেনস্টাইনের কলকাতা পরিদর্শনেব জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই হ্যাভেল এই ঘটনাটি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি বললেন, "লর্ড বার্ডউডের মনোভঙ্গী সেই লর্ড মেকলেরই মতো, যে 'Indian culture is worthless'। ওরা চায় ভারতীয় আর্টকে অ্যাপ্লায়েড আর্ট-এর মধ্যে বন্দী করে রাখতে। তাদের মতে ভারতে ফাইন আর্ট বলে কিছু নেই।"

"কিন্তু এই বিভাগ তো একেবারেই কৃত্রিম ও ক্ষতিকারক", রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদের সুরে বললেন। "শিল্পের মধ্যে আমরা তার সামগ্রিক রূপই খুঁজি, কম্পার্টমেণ্ট করে তাকে দেখি না।"

"সেই কথাই আমি আমার বক্তৃতায় বলেছিলাম, মিঃ টেগোর।"

বলেছিলাম যে, 'aesthetically all arts are the same'। একই নন্দনতত্ত্ব তাঁতির তাঁত, চিত্রকরের তুলি বা ভাস্করের বাটালি পরিচালনা করে, তা সে এশিয়ারই হোক বা ইউরোপেই হোক।"

"বাহ, আপনি ভারী সুন্দর কথা বলেছেন মিঃ হ্যাভেল। শুধু তাই নয়, সত্যিকারের ভারতীয় শিল্পের একটি বিশেষ অংশ আমাদের ধর্মের কীর্তিকলার মধ্যে ছড়িয়ে আছে যা দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের অসংখ্য মন্দিরে মসজিদে।"

"এই কৃত্রিম বিভাগের ফলে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও লাহোরের আর্টস্কুলগুলিতে যে সব ছাত্র আসে তারা অধিকাংশই লক্ষ্যহীন। তারা আর্ট স্কুলে আসে কারণ তাদের এক বড় অংশই জানে না জীবনে তারা কী করবে, তার ফলে তারা আর্টেও বিশেষ কিছু করে না। তার মধ্যেও যাদের শিক্ষার মধ্যে কিছুটা প্রতিভার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, তারাও ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্য ভুলে বিদেশী শিল্পের অনুকরণ করতে ব্যস্ত।"

"তার ফলে ভারতীয় শিল্প তার স্বকীয় ধারা খুঁজে পাচ্ছে না।"

"এদিক দিয়ে আপনার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথের প্রশংসা না করে পারা যায় না", হ্যাভেল বললেন, "তাদের চেষ্টায় প্রাচীন ভারতের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের যে নতুন রূপায়ণ হয়েছে, তাতে অনেক প্রতিভাবান ছাত্রই যোগ দিচ্ছে। কলকাতায় ওদের এই স্কুলটি হয়েছে স্কুল অফ আইডিয়ালিস্ট্‌স্‌, আর আইডিয়ালিস্ট্‌ না হলে তো ভারতীয়ত্ব হবে না, কারণ ভারতীয় আর্টের বর্তমান শাসনকর্তারা চায় কেবলমাত্র ক্রাফট-এর ওপর জোর দিতে।"

"সত্যি, ওরা দুজনে ভারতীয় আর্টের পুনরুত্থানের জন্য যা করেছে তার তুলনা নেই", রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"আমরা কিন্তু ইউরোপীয় বা ভারতীয় আর্টের একটি হোমোজেনাইজড্‌ ভারসন-ও চাই না যা হবে ব্লাণ্ড ও ক্যারেকটার-

লেস," হ্যাভেল বললেন। "আমরা চাই ভারতীয় শিল্প তার নিজস্ব সত্তা খুঁজে পাক, তার ঐতিহ্যের আলোকে মহৎ কিছু সৃষ্টি করুক।"

"মর্ডান রিভিয়ু ম্যাগাজিনে এইসব আলোচনা দেখেছিলুম", রবীন্দ্রনাথ বললেন। "'দি টাইমস' পত্রিকায় রোদেনস্টাইনের লেখা চিঠি ও সেই প্রসঙ্গে সেই পত্রিকার সম্পাদকীয়ও আমার হাতে এসেছে।"

"হ্যাঁ ভারত থেকে আমিও অনেক সমর্থনসূচক চিঠি পেয়েছিলাম। এমন কি মার্গারেট নোবেল, যিনি আপনাদের কাছে সিস্টার নিবেদিতা নামে পরিচিত, তিনিও লর্ড বার্ডউড-এর তীব্র নিন্দা করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন।"

"আর এক মহীয়সী মহিলা যিনি ভারতের উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। আইরিশদের কাছে আমাদের ঋণের অন্ত নেই", রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন।

এ কথায় হ্যাভেলও একটু মুচকি হসেলেন। তিনিও জানেন রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী প্রকাশের ব্যাপারে ইয়েট্‌স্ কী রকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গেই বললেন, "মিঃ টেগোর. আমাকে ক্ষমা করতে হবে যে আপনার পোয়েট্রি রিডিং-এ আমি আসতে পারিনি। তবে শুনেছি যে ইয়েট্‌স্-এর পড়া শুনে সবাই আপনার কবিতার সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে গেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। তারপর তাঁরা যখন পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন, তখন তাঁর মনে হোল, অবন ঠিক কথাই বলেছিল, তার এই 'গুরু' ভারতীয় শিল্পের উন্নতির জন্য জীবনের সব কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত। এই রকম কয়েকজন হ্যাভেল যদি ভারতে আসতেন, তাহলে ভারতীয় শিল্পের ভবিষ্যত সম্পর্কে কারো কোন দ্বিমত থাকতো না।

দুপুরবেলা কবি তাঁর ঘরে বসে চিঠি লিখছেন, এমন সময় শুনতে পেলেন দরজায় টোকা দিয়ে রথী বলছে, "বাবামশায়, দেখুন আপনার সঙ্গে কে দেখা করতে এসেছে।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে রবীন্দ্রনাথ দেখেন সামনে রথীর সঙ্গে সুকুমার রায় দাঁড়িয়ে। "এ কী, সুকুমার, এসো এসো, ভেতরে এসো।"

নীচু হয়ে রবীন্দ্রনাথের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে সুকুমার বলল, "আমি আগেই শুনেছি যে আপনি হোটেল ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু কোথায় উঠেছেন তা জানতুম না। এখন রথী আমার খোঁজে আমাদের হোস্টেলে আসতেই ওর সঙ্গে চলে এলুম।"

"বসো, বসো, তোমাকে দেখে যে আমার কী আনন্দ হচ্ছে তা কী বলবো। তোমার বাবা উপেন্দ্র আমার সত্যিকারের প্রাণের বন্ধু। এখানে কী পড়তে এসেছো?"

"এই প্রিংটিং-এর প্রসেস এনগ্রেভিং শিখতে এসেছি। দেশে গিয়ে যদি বাবার ছাপাখানার কাজে লাগতে পারি।"

"ছাপাখানার কালি কী আর তোমার হাতে লাগবে সুকুমার, তোমার হাতে লাগবে দোয়াতের কালি। উপেনের ছেলে তুমি, সাহিত্য তোমার রক্তের মধ্যে।"

সুকুমার বলল, "গুরুদেব, এখানে আসার সময় আপনার 'চয়নিকা' বইটি সঙ্গে এনেছি। সন্ধ্যেবেলায় যখনই সময় পাই, তখনই আপনার বইটি খুলে আবৃত্তি করে পড়তে শুরু করি।"

নিজের লেখার প্রশংসা শুনে রবীন্দ্রনাথ লজ্জিত হয়ে পড়েন, তাই তাড়াতাড়ি কথাটি অন্যদিকে ঘুরিয়ে বললেন, "তুমি ছাড়া আর কে আছে? তোমাদের ওখানে কী অনেক বাঙালী ছাত্র আছে?"

"হ্যাঁ গুরুদেব, আমরা বেশ কয়েকজন আছি একত্রে এক বাড়িতে। তা ছাড়া হারীন চট্টোপাধ্যায় এখানে আছে। ও হচ্ছে সরোজিনী নাইডুর ভাই।"

সরোজিনী নাইডুর কথা উঠতেই রবীন্দ্রনাথ তার গুণগানে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। এই হচ্ছে তাঁর স্বভাব। নিজের স্তুতি

যেমন শুনতে পারেন না, তেমনি অন্যের সামান্য গুণ দেখলেই তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন।

"সত্যি, সরোজিনীর ইংরেজী কবিতার তুলনা হয় না। কী গীতিময় সুর, কী তার স্বাভাবিক ভাষা! ও যদি কবিতা নিয়ে থাকে, তাহলে এককালে ইংরেজী-ভাষী জগতে অন্যতম কবি হিসাবে প্রসিদ্ধি পাবে।"

"গুরুদেব, আপনি অরু দত্ত ও ওর বোন তরু দত্তের কবিতা পড়েছেন? ওদের লেখারও এখানে খুব সুনাম।"

"হ্যাঁ, ওদের কিছু কিছু কবিতা দেখেছি। রামানন্দবাবুর 'মডার্ন রিভিয়ু'তে তো ওদের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধও বেরিয়েছিল জানো বোধহয়। সেখানে ওদের কিছু চিঠিপত্রের অংশবিশেষও ছাপা হয়েছিল। সত্যি, ইংরেজী ভাষার ওপর ওদের খুবই দখল।"

"কিন্তু গুরুদেব, আপনি কবে আপনার কবিতাগুলির ইংরেজী অনুবাদ করেবেন?" সুকুমার জিজ্ঞাসা করল। "সেগুলি প্রকাশ হলে তো পৃথিবীময় ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।"

রথী বলল, "বাবামশায় কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ নিজেই করেছেন। কবি ইয়েট্‌স্‌ তার খুবই প্রশংসা করেছেন। এখানকার 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' থেকে তা বার করার চেষ্টা হচ্ছে।"

রথী হচ্ছে এখন রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী। পুত্র উপযুক্ত হয়ে শুধু বন্ধুই হয়ে ওঠেনি, রবীন্দ্রনাথের অনেক দরকারী চিঠিপত্র ও টাইপিং করার ভার উত্তরোত্তর তার কাঁধে চাপছে।

সুকুমার একটু ইতস্তত করে বলল, "গুরুদেব, আপনাকে একটি কথা বলব ভেবেছি। জানি না বলা উচিত হবে কিনা।"

"কেন, সুকুমার, তুমি বলো। অপ্রিয় হলেও আমি কিছু মনে করবো না।"

"সেই ভরষাতেই আপনাকে বলতে চাইছি। আমাদের হোস্টেলের অনেক ভারতীয়ই আপনার ওপর একটু ক্ষুব্ধ।"

"কেন, আমি আবার কী দোষ করলুম ?"

"আপনি যে সেই 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি লিখেছিলেন, তাতে অনেকেই বলছে যে আপনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের গুণগানই করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই অভিযোগ শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর শান্তস্বরে বললেন, "কবি ইয়েটস্‌ও আমাকে সেই কথা বললেন। ওঁর বান্ধবী মড্ গন্-এর কাছে হারীন নাকি বলেছে, 'আমরা কী করতে পারি ? আমাদের সাংস্কৃতিক নেতাই রাজা পঞ্চম জর্জের আবাহনে গান লিখেছেন।' আমি ইয়েট্‌স্‌কেও বলেছি, তোমাদেরও বলছি, রাজা পঞ্চম জর্জের, অভিষেক উপলক্ষে জন-গন-মন অধিনায়ক গানটি আমি লিখিনি। মর্তভূমির কোন রাজা মহারাজার গুণগান গাইতে আমি কলম ধরিনি বা ধরবো না। এ গানে আমি ভারত ভাগ্য বিধাতা ঈশ্বরেরই বন্দনাগান করেছি। আর কী উপলক্ষে আমি গানটি রচনা করেছিলুম তাও তুমি নিশ্চয় জান। কলকাতায় সেই সময়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের যে অধিবেশন বসেছিল, তাদের অনুরোধেই আমি গানটি তৈরী করেছিলুম। যদি ভগবানের অভিপ্রায় হয়, তাহলে সবাই সেই সত্য জানতে পারবে। এ গানের আবেদন হয়ত তাদের মর্মমূলে পৌঁছবে।"

এই অপ্রীতিকর আলোচনা বন্ধ করার জন্যই বোধহয় এই সময় পাশের ঘর থেকে প্রতিমা চা ও খাবারের ট্রে নিয়ে ঢুকলো। ওকে দেখেই সুকুমার ও রথী উঠে দাঁড়াল। রথী তাড়াতাড়ি ওর হাত থেকে ট্রেটি নিয়ে টেবিলের ওপর রাখল।

কবি বললেন, "সুকুমার, তোমার সঙ্গে তো বৌমার পরিচয় হয়নি। ওর নাম প্রতিমা।"

সুকুমার নমস্কার করে চেয়ারে বসল।

প্রতিমা চা পরিবেশন করতে করতে বলল, "এই শুধু চা ও কেক।

এখানে তো আর দেশের মতন মিষ্টি পাওয়া যায় না যে আপনাকে তাই দিয়ে আপ্যায়ন করবো।"

রথী বলল, "সুকুমারবাবু আপনিও তো কবিতার চর্চা করেন। সামনের বার আমাদের কয়েকটি শোনাবেন।"

প্রতিমা বলল, "দেশে গেলে এবার আপনাকে আমাদের বাড়িতে ডিনার খেতে আসতে হবে। তখন দেখবেন আপ্যায়ন করা কাকে বলে।"

"বৌমা, তোমার কথা শুনে আমার বৌঠানের কথা মনে পড়ল" রবীন্দ্রনাথ বললেন, "উনি কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতা খুব ভালোবাসতেন। কতদিন যে তাঁকে ডেকে এনে খাইয়েছেন ও তার নিজের মুখ থেকে কবিতা শুনেছেন তার ঠিক নেই। একবার ভারী সুন্দর এক পশমের আসন বুনে দিয়েছিলেন তাঁকে।"

সুকুমার বলল, "ইংলণ্ডে থাকতে আমার বিহারীলালের সেই কবিতাটি খুব মনে পড়ে ঃ

কী কল বানিয়েছে সাহেব কোম্পানী,
কলেতে ধোঁয়া ওঠে আপনি, সজনী।"

সুকুমারের কথায় সবাই হেসে উঠল, কবি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "কেন, সুকুমার, বিহারীলালের সারদামঙ্গল-এর কবিতাগুলি ভুলে যেওনা। ওই ছন্দের অনুকরণে ছেলেবেলায় আমি অনেক কবিতা লিখেছিলুম।"

চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে সুকুমার বলল, "কিন্তু গুরুদেব, আমাদের বাসায় আসছেন কবে বলুন। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলে সব অয়োজন করি, তারপর আপনাকে জানাবো।"

"ঠিক আছে সুকুমার, তুমি যখন বলবে তখনই যাবো। তবে শীঘ্রি আমাকে একদিন অর্শের জন্য ডাক্তার দেখাতে হবে। তারপর কয়েকদিন থেকেই দেশের পথে রওনা দেবো।"

সুকুমার রায় ওদের কাছ থেকে বিদায় নিতেই রথী বলল, "বাবা মশায়, আপনার অর্শের চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ ইতিমধ্যেই করেছি।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "রথী, তুমি শুধু উত্তম সেক্রেটারই নও, আমার জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছ। এরকম কর্মতৎপর হলে তোমাকে ছাড়া আমার জীবন চালানই দায় হয়ে উঠবে দেখছি।"

কিন্তু দুদিন পরে ডাক্তারের কাছে যেতেই খারাপ খবর পেলেন তিনি। অর্শের এই অসুখ অনেক দূর গড়িয়েছে। এখন অপারেশন ছাড়া গতি নেই।

কিন্তু অপারেশন কী করে হবে? সে তো ভীষণ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দেশে লিখলেও অতিরিক্ত টাকা আসতে অনেক সময় নেবে। একেই জমিদারীর আয় অনেক কমে গেছে, তারপর তা থেকে যা পাওয়া যায় শান্তিনিকেতনের স্কুল চালাতেই তার প্রায় সবটা চলে যায়। মাষ্টার মহাশয়রা সেখানে রয়েছেন শুধু তাঁর মুখ চেয়ে এ অবস্থায় নিজের অপারেশনের জন্য এত বড় খরচ বহন করার প্রশ্নই ওঠে না।

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেড়িয়ে রথী ও প্রতিমার মুখ-মরা অবস্থায় দেখে রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আরে, মন খারাপ করছো কেন তোমরা? আমি তো আর মারা যেতে বসছি না। এ কষ্ট সহ্য করার শক্তি আমার আছে। কিছু ভেবো না, দেশে গিয়ে ভাল করে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করবো।"

তারপর একটু থেমে বললেন, "এখনও তো অনেক বেলা আছে। চলো, হাউড, পার্ক থেকে ঘুরে আসি, তাহলে তোমাদের মন-মেজাজও ভাল হয়ে যাবে।

একটি ট্যাক্সি ধরে ওরা যখন হাউড পার্কে এলেন, তখন বিকেল পড়ে গেছে, অনেকেই বায়ু সেবনের জন্য পার্কে বেড়াতে এসেছে।

গ্রীষ্মকালের বিকেলে লণ্ডনের পার্কে বা প্লাজায় সর্বত্রই ভিড়, এখানেও তার কমতি নেই।

সেদিন রাত্রে বিছানায় শুতে এসে রথী প্রতিমাকে বলল, "বোসো, একটি দরকারী কথা আছে।"

"বলো।"

"আমরা যখন দেশ ছেড়েছিলুম, তখন কথা ছিল যে বাবামশায় ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে যাবেন, আর আমি কো-অপারেটিভ মুভ্‌মেণ্ট পড়তে ডেনমার্কে যাবো। তুমিও আমার সঙ্গে ডেনমার্কে থাকবে।"

"আমি যখন তোমার অর্ধাঙ্গিনী, তখন আমাকে ফেলে দিতে পারো না।"

"ঠাট্টা রাখো। আমার মন চাইছে আমেরিকায় যেতে। আমি যদি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই, তাহলে ওখানে কিছুদিন থেকে থিসিস্ লিখে ডক্টরেট ডিগ্রি পেতে পারব। তুমি তো জানো উনিশ'শ নয় সালে আমাকে ফিরতে হয়েছিল বাবামশায়ের জন্যই। উনি চাইলেন যে দেশে ফিরে আমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করি। আমি ও সন্তোষ শিলাইদহে তা করেছিও। এখন আমি চাই আবার ইলিনয়ে ফিরে যেতে। তুমি কী বলো?"

প্রতিমা চুপ করে রইল। জানে এ বিষয়ে স্বামীর একটু ক্ষোভ আছে। অনেকবার সেই কথা শুনেছেও সে। এখন যদি সুযোগ আসে, তাহলে তার সদ্‌ব্যবহার করা উচিত।

মুখ ফুটে বলল, "আমি জানি তুমি ইলিনয়ে আবার যেতে চাও। এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। তোমার উচ্চাশা অসম্পূর্ণ থাকবে আমি তা চাই না।"

"ঠিক আছে, আমি তাহলে কালকে সকালেই বাবামশায়কে বলছি।"

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে রথী কথাটি পাড়ল।

"বাবামশায়, এখানে আসার আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন ডেনমার্কে গিয়ে সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে পড়াশুনো করতে। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে আমেরিকায় ফিরে গিয়ে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে থিসিস দিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রিটা শেষ করি।"

এ সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে একদম অপ্রত্যাশিত। যদিও কথা ছিল যে রথী ও বৌমা ডেন্মার্কে যাবে, তবু ওদের ছাড়তে রবীন্দ্রনাথের একটুও মন চাইছিল না। এখন রথী যদি আমেরিকায় যেতে চায়, তাহলে ওরা আরও দীর্ঘদিন দেশছাড়া হবে। তবু কর্তব্যবুদ্ধি বলে এ ব্যাপারে সায় দেওয়া উচিত। নিজের কষ্ট হবে ঠিকই, তবু সে সব অসুবিধে গা-সওয়া হয়ে যাবে।

একটু চুপ করে থেকে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, তোমাকে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য আমি মাঝে মাঝে অনুতাপ করি তোমার কেরিয়ার-এর পেছনে আমি বোধহয় বাধাস্বরূপ হলাম। কিন্তু আমি চেয়েছিলুম যে ফিরে এসে তুমি বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করে দেশে নতুন পথনির্দেশ করো, আর শমী শান্তিনিকেতনের আশ্রমভার কিছুটা নেবে। কিন্তু সে মারা গেল, তখন তোমাকেই বোলপুরে ডেকে নিয়ে এলুম। এখন তুমি যদি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে পড়াশুনো শেষ করতে চাও, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই। বৌমাও তোমার সঙ্গে যাক। আমি সেপ্টেম্বরে দেশে ফিরে যাবো।"

প্রতিমা বলল, "বাবা মশায়, আপনিও আমাদের সঙ্গে আমেরিকায় চলুন। সেখানে কয়েকমাস থেকে তারপর দেশে ফিরে যাবেন।"

রথী সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল, "হ্যাঁ বাবামশায়, সেটি খুব ভাল্ হবে। আপনি দেশ দেখতে ভাল বাসেন, আমেরিকা তো দেখেননি এ এক নতুন মহাদেশ। ইউরোপ থেকে অনেক বিষয়েই আলাদা।"

রবীন্দ্রনাথের যে আমেরিকা দেখার ইচ্ছে নেই তা নয়। রথীর

মুখে এ দেশের প্রশংসা অনেকবার শুনেছেন, বিশেষ করে ও ফিরে যাবার পর পদ্মার বোটে যখন দুজনে একসঙ্গে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন তখন ওর মুখে খালি আমেরিকার কথা। তারপর তাঁর এখন একা একা দেশে ফেরার ইচ্ছে নেই। তিনি যেন রথী ও প্রতিমার 'পর খানিকটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। ওদের সান্নিধ্য ছাড়তে চাইছিলেন না।

তাই বললেন, "তোমাদের যদি কোন অসুবিধে না হয় তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।"

প্রতিমা হাঁপ ছেড়ে বলল, "অসুবিধে, বাবা মশায়! আমার খুব খারাপ লাগছিল যে আপনি একা একা দেশে ফিরে গেলে কে আপনার রুগ্ন শরীরের যত্ন নেবে।"

রুগ্ন শরীর শুনে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "দ্যাখো, অর্শের জন্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার কথা বলেছিলুম। হঠাৎ মনে পড়ল শিকাগোতে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নেইস্ আছেন, তাঁকে দেখানো যেতে পারে।"

রথী বলল, "ঠিক আছে বাবামশায়। আমি ডাঃ নেইস্-এর ঠিকানা যোগাড় করে তাঁকে লিখে দিচ্ছি। আর ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রফেসার ডঃ সিমুরকেও লিখতে হবে যাতে উনি অ্যাডমিশন ফর্ম ইত্যাদি সব এখানে পাঠিয়ে দিতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "হা হা, প্রফেসর সিমুরের সঙ্গে তো শিক্ষার বিষয় নিয়ে আমার সঙ্গেও পত্রালাপ হয়েছিল। ৺মি লিখে দিও যে আমিও আসছি, সাক্ষাতে তাই নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হবে।"

"নিশ্চয়ই। আমি এও লিখবো যে পারলে আমাদের জন্য একটি বাড়ি ভাড়া করে রাখতে। আর্বানা খুব ছোট জায়গা, হোটেল তো আর বিশেষ নেই। উনি ভীষণ অমায়িক লোক। ওঁর সঙ্গে আলাপ করে আপনার খুব ভাল লাগবে বাবামশায়।

প্রতিমাকে দেখে মিসেস সিমুর যে কী খুসী হবেন তা বলবার নয়।”

আমেরিকায় যাবার কথা শুনে প্রতিমার মনটাও নেচে উঠল। শুধু যে সে স্বামীর উচ্চশিক্ষায় সাহায্যে করতে পারবে তাই নয়, বাবামশায়ও কাছে থাকবেন কিছুদিন, আর তাঁর চিকিৎসারও একটা ব্যবস্থা হবে।

আমেরিকায় যাবার সিদ্ধান্তে রবীন্দ্রনাথের মনটাও প্রসন্নতায় ভরে গেল। এই লণ্ডনের বৃষ্টি-বাদলার হাত থেকে অন্তত কিছু-দিনের জন্য রেহাই পাওয়া যাবে! যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে ঠাণ্ডার দেশ এবং সেখানে যাচ্ছেনও শীতের প্রারম্ভে; তবু রথীর মুখে যা শুনেছেন তাতে মনে হয়েছে অনেক বেশী রদ্দুরের মুখ দেখতে পাবেন। আর নতুন দেশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন লোকেদের সঙ্গেও পরিচয় হবে। লণ্ডনের এই হট্টগোল থেকে দূরে গিয়ে আবার মনের শান্তি খুঁজে পাবেন।

এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাবার সংকল্পের মধ্যে ওঁদের জীবনের যেন এক নতুন দিক্‌নির্দেশ ঘটল। ঠিক যেমন ইংলণ্ডে আসার মধ্যে কবি ঈশ্বরের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছিলেন, তেমনি এবারও তাঁর মনে হোল এই আমেরিকায় যাত্রার পেছনেও ঈশ্বরের কোন অভিপ্রায় হয়ত আছে। সেই মহাদেশ কোনদিন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের সহায় হবে, তাঁর নানা পরিকল্পনার পাথেয় যোগাতে সাহায্য করবে। ভবিষ্যতের গর্ভে কী সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে কে জানে!

এখন রবীন্দ্রনাথের লণ্ডন আর খারাপ লাগছে না। আসলে মানুষ হচ্ছে সামাজিক জীব। যেখানে মনের মতো বন্ধু পাওয়া যায়, সে জায়গা শুকনো মরুভূমি বা বন্য জায়গা হলেও পরম রমণীয় বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথেরও তাই হোলো। এখানে এমন এতো সহৃদয় বন্ধুর সমাবেশ যে তাদের সান্নিধ্যে লণ্ডনের ভিজে স্যাঁতসেতে আবহাওয়াও তত খারাপ লাগলো না। রথীকে কবি একদিন বললেন “এদেশে

এসে যারা বৃটিশদের না দেখেছে, তারা সত্যিকারের বৃটিশ জাতিকে দেখেনি। ভারতে বৃটিশদের দেখে এ জাতিকে বিচার করা উচিত নয়।”

বিশেষ করে কবি ইয়েটস্-এর সান্নিধ্যে আসার পর। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী ‘গীতাঞ্জলি’ যদি ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়, তাহলে তার ভূমিকা লেখার জন্য ইয়েটস্ তৈরী হয়েই আছেন। তাঁর বাড়িতে চা-পানের পরেও রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইয়েটস্-এর দেখা হয়েছে। ওদের কেংসিংটনের ফ্লাটেও তিনি কয়েকবার এসেছেন। তাছাড়া রোদেনস্টাইনের স্টুডিও ঘর তো আছেই, সেখানে সময় পেলে রবীন্দ্রনাথের মত ইয়েটস্ও আড্ডা দিতে আসেন।

শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, রথীও এখন মাঝে মাঝে ইয়েটস্-এর বাড়ি যায়। তাঁর ওবার্ন প্লেসের ফ্লাটটি এক মুচির দোকানের ওপরের চিলে-কোঠায় অবস্থিত। রথী আবার একা যেত না, সঙ্গে কালীমোহন ঘোষ থাকতো। অনেক সন্ধ্যেবেলাই তারা নানা আলোচনায় মত্ত হোত, কথাবার্তায় কত রাত হয়ে যেত তার ঠিক থাকতো না। শুধু সাহিত্যই নয়, তাদের আর এক প্রিয় বিষয় ছিল ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব। কালীমোহন ঘোষ ছিলো ভূতের গল্পের রাজা, শুধু ভুবনডাঙ্গার মাঠের ভূতই নয়, গদ্‌খালির ভূত সম্পর্কেও সবজান্তা। আর ইয়েটস্-তো আয়ার্ল্যাণ্ডের জোলো জায়গার সব নিপীড়িত ভূত সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। তাদের বয়েসও বাংলাদেশের মত বেশ কয়েক শতাব্দী।

ইয়েটস্-এর সঙ্গে আলোচনা করার পর বাড়ি ফেরার পথে রথীর মাঝে মাঝে মনে হোত যে ইয়েটস্ যেন সারাক্ষণই এক কাল্পনিক জগতে বাস করেন, যেখানে শুধু কল্পনা, অনুভব আর স্বপ্নের আবাস। মনে হয় না যে তিনি গভীর বাস্তববাদী পাশ্চাত্যদেশের মানুষ। তিনি যেন তাদেরই মতো এক প্রাচ্যদেশের মানুষ। রুক্ষ কাজের বদলে কল্পনার জাল বুনতে বেশী ভালবাসেন।

শুধু ইয়েটস্‌ই নয়, এজরা পাউণ্ডের সঙ্গেও রথী ও কালীমোহনের খুব ভাব হয়েছে। এজরা পাউণ্ড অনেকবারই ওদের কেংসিংটনের বাসায় এসেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা করতে, বিশেষ করে তাঁর মুখে কবিতার আবৃত্তি শুনতে ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের দুটি ইংরেজী কবিতা শিকাগোর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোর কাছে পাঠিয়েছেন। এতো অল্প বয়েসেই পাউণ্ডের সাহিত্য সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান। ভারতীয় কবিতা ছাড়া চীনা কবিতা ও জাপানী 'নো' নাটক সম্পর্কেও তিনি একজন বিশেষজ্ঞ।

প্রাচীন কবিতার মধ্যে পাউণ্ডকে সবচাইতে মুগ্ধ করেছে ভক্ত কবির-এর দোঁহাগুলি। রবীন্দ্রনাথের কাছে তার কয়েকটি ইংরেজী অনুবাদ শুনে তিনি সেই সব কবিতার সরল মাধুর্যে স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। ঠিক করেছেন সত্বর এগুলির ইংরেজী অনুবাদ করবেন। এ বিষয়ে কালীমোহন ঘোষ তাঁর এক বিশেষ সহায়। তার সঙ্গে কথা হয়েছে যে ওরা দুজনে দোঁহাগুলি ইংরেজী অনুবাদ করে একটি সংকলন বার করবেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথেরও অশেষ উৎসাহ। তিনি নিজেও এভ্‌লিন আণ্ডারহিল্‌-এর সঙ্গে একত্রে কবির-এর অনেক দোঁহার অনুবাদ করেছেন। যদি সম্ভবপর হয় তাহলে তারাও এগুলি বই আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন।

রথীর মতো প্রতিমাও চুপ করে বসে নেই। সেও এক নতুন ধরনের নেশায় মেতেছে। তা হচ্ছে 'সাফ্রেজ্‌ মুভমেণ্ট' বা নারীর ভোটদানের অধিকারের আন্দোলন। এই সময়ে এই আন্দোলনের স্রোত প্রায় তুঙ্গে উঠেছে। শুধু বৃটেনের ট্রেড ইউনিয়ানগুলিই নয় বার্নার্ডশ'র মতো 'ফেবিয়ান' সোস্যালিস্টরাও তাঁদের লেখার মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের পেছনে জনসমর্থন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন।

আসলে ওদের ল্যাণ্ডলেডী সেই বেলজিয়ান ভগ্নিদ্বয়ই প্রতিমাকে

এই আন্দোলনে জড়িয়ে ফেলেছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই বিকেলে লণ্ডনের প্রধান প্রধান স্থানে ওরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ জানায়। সব সময়ই সেই বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণ থাকে না, মাঝে মাঝে দোকান-পাট ভাঙ্গা বা ঢিলছোড়ার অভিযোগে অনেককেই সাময়িকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কিন্তু সারা লণ্ডন যেন এই আন্দোলনকে একটু কৌতুকের সঙ্গেই গ্রহণ করেছে। অনেক লোকেই ভাবতে পারে না যে ঘরসংসার ফেলে মহিলারা সব ভোট দিতে ছুটবে। এ নিশ্চয়ই বিংশ শতাব্দীতে পা দেবার ফলে আর এক সংক্রামক ব্যাধির দ্বারা তারা আক্রান্ত হয়েছে।

একদিন প্রতিমাও আর ওদের কেংসিংটনের বাড়িতে ফেরে না। অনেক রাত হয়ে গেছে, তবু তার দেখা নেই। ওরা জানে প্রতিমা এখন 'সাফ্রেজ' আন্দোলনের শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। সবার ভয় হোল এই বুঝি সে দোকানের জানালা ভাঙার অভিযোগে গ্রেপ্তার হোল। তারপর গভীর রাত্রে সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন সবারই দুশ্চিন্তায় মুখ কালো হয়ে গেছে।

রথীই প্রথম বলল, "কী ব্যাপার, এতো দেরী কেন? আমরা ভাবলাম তোমাকে বোধহয় পুলিশ জেলেই পুরলো।"

প্রতিমাও সেই অভিজ্ঞতায় কিছুটা উত্তেজিত, তাড়াতাড়ি বলল "প্রায় সেই ব্যাপারই। কিন্তু আমরা তো শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের পক্ষপাতি, তাই অনেক পুলিশ থাকা সত্ত্বেও তারা আর হস্তক্ষেপ করেনি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "যাক, তুমি তাহলে ঠাকুরবাড়ির প্রথম কুলবধূই হলে না যে নারীমুক্তির জন্য জেলে গেল।"

প্রতিমা হেসে বলল, "বাবামশায়, আপনাদের দুঃশ্চিন্তায় ফেলার জন্য আমার ভীষণ খারাপ লাগছে। কিন্তু এই বেলজিয়ান বোনদের সঙ্গে গেছি, ওদের ফেলে রেখে তো একা ফিরতে পারি না, ওরা তাহলে কী ভাববে।'

"তুমি ঠিকই করেছো বৌমা," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

"মিটিং-এ একটা ভারী মজার কথা শুনলাম, বাবা মশায়। সেটি জর্জ বার্নার্ড শ'র সম্পর্কে। আজকে নাকি খুব ভোরে একটি লোক এডেল্‌ফাই টেরেস্‌-এ বার্নাড শ'র বাড়িতে এসে তাঁকে জাগিয়ে বলেছে যে তার এক্ষুনি একশ পাউণ্ড চাই, কারণ সাফ্রেজ আন্দোলনের নেতা মিঃ প্যাঙ্কহার্সটকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁকে জামিনে খালাস করতে ওই টাকাটা লাগবে। শ তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে টাকা বার করে দিলেন। পরে যখন জানা গেল যে সবটাই মিথ্যে ও লোকটা শকে ধাপ্পা দিয়ে টাকাটা নিয়েছে, তখন শ'নাকি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন ; ওই লোকটি টাকাটা পাবার যথার্থ অধিকারী, কারণ সে এই কথাই প্রমাণ করেছে যে লণ্ডনে অন্তত এমন একটি লোক আছে যে বার্নার্ড শ'র চাইতেও বেশী বুদ্ধিমান।"

প্রতিমার এই গল্পে রথী ও রবীন্দ্রনাথ দুজনেই খুব হাসলেন। কবি বললেন, "সত্যি, শ'র লেখা যেটুকু পড়েছি, তাতেই তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বার্নার্ড শ'র ব্যবহার সত্যিই অদ্ভুত। রোদেনস্টাইন যখন বার্নার্ড শ'কে ইয়েটস্‌-এর সেই কবিতা পড়ার বৈঠকে আমন্ত্রণ করলেন, তখন তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত বলে এলেন না। তারপর মে সিংক্লেয়ার যখন তাঁর ডিনারের আমন্ত্রণ করলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সস্ত্রীক বার্নর্ড শ'কেও ডেকেছিলেন। ডিনার টেবিলে বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথই নানা রকম কথা বলে সবাইকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। শ একটি কথাও বলেননি। সবাই পরে বলেছে যে শ'নাকি কোথাও এত চুপ করে থাকেননি।

পরের দিন যখন রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে কুইংস্‌ হলে বিখ্যাত বেহালাবাদক হাইফেজ-এর কনসার্ট শুনতে গেছেন, তখন হলঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে শ'

বললেন, "আপনি আমাকে চিনতে পারছেন? আমি বার্নার্ড শ'," বলে আর কোন কথার অপেক্ষা না রেখেই সেখান থেকে চলে গেলেন।

তারপর একদিন স্ত্রী শার্লটকে সঙ্গে নিয়ে শ' রোদেনস্টাইনের বাড়িতে ডিনার খেতে এলেন। সেদিন রোদেনস্টাইন বাড়িতে ছিলেন না অ্যালিসই তাদের অভ্যর্থনা করলেন। সেবারেও ডিনার টেবিলে বার্নার্ড শ' একটি কথা বললেন না, রবীন্দ্রনাথই বলতে গেলে মজার মজার গল্প বলে সবাইকে মাতিয়ে রাখলেন। এমন কি মিসেস্ শ' ও সেই সব কথা খুব উপভোগ করছিলেন। যাবার সময় অ্যালিস রোদেনস্টাইনকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শ' বললেন, "নীল দেড়ে কটা বিয়ে করেছিল?" এ কথাটি অবশ্য রোদেনস্টাইন স্ত্রীর কাছ থেকে পরে জানতে পেরেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ শুনতে পারেন নি।

কিন্তু আর্নেস্ট রাইস্-এর সঙ্গে কবির সাক্ষাতকার অনেক মনো-রম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে ওদের গোল্ডেন গ্রীন-এর কটেজে অনেক দিনই গেছেন। বিকেলে গেলে বাগানে বসে তাঁরা শরবত খেতে খেতে সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করতেন। রাইসের চাপ্ দাড়ি ও গম্ভীর কণ্ঠের আলোচনা সবাইকে মুগ্ধ করে রাখত। রাইস পিয়ানো বাজাতে খুব ভাল বাসতেন। মিসেস্ বাইসও ছিলেন সঙ্গীতে খুব পারদর্শিনী। ওরা ছিলেন ওয়েলস্, কেল্টিক জাতি, সঙ্গীত ওদের রক্তের মধ্যে।

অনেকদিন ডিনারের পর রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে ওরা বসে পড়তেন। তখন আসত গানের অনুরোধ। গানের অনুরোধ এলে কবি তা উপেক্ষা করতে পারতেন না। তাঁর অনন্য কণ্ঠে তিনি যখন একটার পর একটা গান গেয়ে যেতেন, তখন রথী ও প্রতিমার মনে হতো ওরা যেন বাংলা দেশে ফিরে গেছে, সেই ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা দেখছে। কে বলবে তখন তারা জনতাকীর্ণ লণ্ডন

মহনগরীর মধ্যে বসে আছে।

রবীন্দ্রনাথকে দেখে রাইসের একটি ঘটনা মনে পড়ল যা তার ইংরেজ বন্ধু মিঃ মণ্টেগুর কাছ থেকে শুনেছেন। মিঃ মণ্টেগু তখন ভারতে আণ্ডার সেক্রেটারী অফ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া হিসেবে ছিলেন। একদিন গভীর রাত্রে বাংলাদেশের এক বনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একটি পরিষ্কৃত জায়গায় দেখলেন তুজন লোক আগুন জ্বালিয়ে বসে আছে। যেহেতু তিনি সঠিক রাস্তা জানতেন না, ও ঘোড়াও খুব ক্লান্ত, তাই ঘোড়াথামিয়ে তিনি ওদের সাথে যোগদান করলেন। কিছুক্ষণ পরে ধুতি পরা একটি রোগা পাতলা বালক সেখানে এসে হাজির এবং সেও আগুনের সামনে বসে পড়ল। সময় কাটাবার জন্য প্রথমে একজন একটি গান ধরল, তারপর আর একজন। যখন বালকটির গান গাইবার সময় এল, সে তখন এমন এক গান গাইল যা অন্য তুজনের থেকে অনেক সুন্দর। তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হোল কে এই গানটি লিখেছে, সে উত্তর দিল কে লিখেছে তা সে জানে না, কিন্তু সর্বত্রই লোকে এই সব গান গাইছে। কিছুদিন পরে মিঃ মণ্টেগু অন্য এক জায়গাও সেই গান আবার শুনলেন। যখন জিজ্ঞাসা করলেন কে এই গান লিখেছেন, তখন শুনলেন তাঁর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এখন রবীন্দ্রনাথকে দেখে আর্নেস্ট রাইসের সেই কাহিনী মনে পড়ল। তিনি কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সেই ঘটনার কথা বলেননি, জানেন শুনলে কবি ভীষণ লজ্জা পাবেন। যদি সময় হয় তাহলে বিশ্ববাসীকেই সেই ঘটনার কথা শোনাবেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনে ছিলেন, তখন এক বৃহৎ ভারতীয় গোষ্ঠীও সেখানে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যে অবশ্য ডঃ ব্রজেন শীল ও ও প্রমথনাথ সেন তখনও ছিলেন। এরপর ছিল ভারতীয় হোস্টেলের ছাত্রসমাজ। তাদের মধ্যে যারা বাঙালী, তারা সময় পেলেই রবীন্দ্র-

নাথের সঙ্গে দেখা করতে আসত। রথীও সময় পেলে সেখানে ঢু মারত, বিশেষ করে সুকুমার রায়ের সঙ্গ পাবার লোভে।

শান্তিনিকেতনের শিক্ষক কালীমোহন ঘোষ প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতো। সে তখন লণ্ডনে শিক্ষার বিষয়ের ওপর ডিগ্রী করছিলো। অনেক সময় কবি তার সঙ্গে রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে যেতেন। রোদেনস্টাইন তখন বারাণসীর গঙ্গার ঘাটের ছবি আঁকছিলেন। তাতে কালীমোহনকে স্নানার্থী হিসেবে খাড়া করে তাঁর 'সিটিং' নিয়ে শুরু করলেন।

রোদেনস্টাইনের এই স্টুডিওতে আর এক এশিয়াবাসীর সঙ্গে দেখা হোত। তিনি হচ্ছেন সিংহলের আনন্দ কুমারস্বামী। দীর্ঘ ও সৌম্য-দর্শন এই পুরুষ যেখানেই যেতেন, সেখানেই সবাই তাঁকে ঘিরে ধরত। প্রায় সব বিষয়েই তিনি আলোচনা করতে পারতেন। যদিও তাঁর প্রিয় বিষয় ছিল ভারতীয় শিক্ষা।

কুমারস্বামী রবীন্দ্রনাথের মতো প্রায়ই রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে আড্ডা দেবার জন্য আসতেন। দেশে থাকতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ভীষণ হৃদ্যতা ছিল। আলোচনার বিষয় হচ্ছে সেই একই ঃ ভারতীয় শিল্পকলা। সময় পেলে রোদেনস্টাইনও সেই আলোচনায় যোগ দিতেন।

কুমারস্বামী একদিন বললেন, "এটি অত্যন্ত দুঃখের কথা মিঃ টেগোর যে বৃটিশরা ভারতীয় শিল্পকলা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। যারা ভারতে ছিল বা ঘুরে এসেছে, তারাও ভারতীয় শিল্প বলতে বোঝে শুধু আগ্রার তাজমহল। এমনকি ফতেপুর সিক্রিও তারা ঘুরে দেখে না। হিন্দু শিল্পকলার তো কোন পরিচয়ই তারা রাখেন না।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমিও এখানকার কিছু লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেছি। তাদের কাছেও ভারতীয় শিল্প বলতে বোঝায় মোগল আমলের কিছু স্থাপত্য। অথচ আমাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ

শিল্পকলার যে পরম নিদর্শন, সেই অজন্তা-ইলোরার গুহাগাত্রের ছবি বা এলিফান্টা, খাজুরাহো বা কোনারকের স্থাপত্যের কোন খোঁজই এরা রাখে না। মিঃ রোদেনস্টাইন আমাকে মিঃ ল্যুট্যেন-এর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁকে যখন একথা বললাম, তিনি শুধু হাসেন, বলেন, 'এ সব তো গান্ধার শিল্পকলার নিদর্শন, আর তার মূল ধাঁচই তো এসেছে গ্রীকদের কাছ থেকে।"

"এটি খুবই দুঃখের বিষয় যে মিঃ লুট্যেন হিন্দু স্থাপত্যের স্বকীয়তা একদম স্বীকার করতে চান না," রোদেনস্টাইন সেই আলোচনায় যোগ দিলেন। "নতুন দিল্লীর গড়ার ব্যাপারে তিনি বলেন, যে ভারতীয় স্থাপত্যের নমুনা যদি নিতে হয় তা পুরোনো দিল্লীর মুসলিম স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন নিলেই হবে "

"বুঝলাম গান্ধার শিল্পে গ্রীকদের ছাপ এসেছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্যকে কী কোরে অস্বীকার করা যায়?" কুমারস্বামী জিজ্ঞাসা করলেন। "সেখানে তো গান্ধার শিল্পের নিদর্শন বিশেষ নেই।"

এমন সময় জন্ এসে বলল, "ড্যাডি, মা তোমাকে ডাকছে।"

"এক্সকিউজ্ মি," বলে রোদেনস্টাইন উঠে গেলেন।

কুমারস্বামী তখন বললেন, "আপনি জানেন না মিঃ টেগোর, রোদেনস্টাইন ইউরোপে ভারতীয় শিল্পের পুনরুত্থানের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছেন। উনিশশ' দশ সালে উনি যখন ভারতে গিয়েছিলেন, তখন মিসেস খৃশ্চিয়ানা হেরিংঘ্যাম্-এর সঙ্গে দিনের পর দিন অনেক শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে অজন্তা গুহার কাছে থেকে ওরা সেই সব ফ্রেস্কোর কপি করেছেন। বৃটিশরা তো অজন্তা-ইলোরার গুহাচিত্রকে আমলই দিতে চায় না। আজকে ইংলণ্ডে তার যেটুকু কদর, তার জন্য মিঃ রোদেরস্টাইন ও মিসেস হেরিংঘ্যাম অনেকখানিই দায়ী।"

"রোদেনস্টাইন আমাকে বলেছেন যে বারাণসীতেও উনি বেশ

কিছুদিন কাটিয়েছেন ভারতীয়দের মধ্যে।"

"হাঁ, তখন তো আমি ওর সঙ্গে সেখানে ছিলাম। সেখানকার সব সাহেবরা তিনি ভারতীয়দের মধ্যে থাকবেন শুনেই বলল, 'সেকী, তাহলে প্লেগ হয়ে মরবে। ওই নোংরা, ঘিঞ্জি জায়গায় কি কোরে তুমি থাকবে?' কিন্তু তিনি দিনের পর দিন বারাণসীতে ভারতীয়দের মধ্যে থেকে তাদের জীবনেরই ছবি এঁকেছেন। আমি তখন এলাহাবাদ থেকে এসে ওর সঙ্গে যোগ দিলাম। কতদিন ওঁর সঙ্গে সাধুদের আড্ডায় গিয়েছি। আপনি ওঁর আঁকা হট্‌যোগীদের ছবি দেখেছেন? তাদের শুদ্ধ আত্মা যেন সেইসব ছবির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। সত্যি, এমন ভারত-প্রেমিক ইংরেজ বড় একটা হয় না।"

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, "সে কী আর আমি জানি না! আমার জন্য ও যা করেছেন, তার তুলনা নেই।" মুখে বললেন, "রোদেনস্টাইনের মতো বন্ধু-বৎসল ব্যক্তি সত্যিই বিরল।"

এমন সময়ে রোদেনস্টাইন স্টুডিওতে এসে ঢুকলেন। বললেন, "মিঃ টেগোর, মিঃ কুমারস্বামী, অ্যালিস বলেছে এখানে লাঞ্চ খেয়ে যেতে।"

"না, না, মিঃ রোদেনস্টাইন, ওসবের মধ্যে যাবেন না," রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলেন। "আপনি তো জানেন আপনার সঙ্গ সুখ পাবার জন্যই এখানে ঘন ঘন আসি।"

"ভয় নেই মিঃ টেগোর। আপনাকে রোস্ট বিফের স্যাণ্ডুইচ্ খেতে হবে না", রোদেনস্টাইন হেসে বললেন। "অ্যালিস আপনার পুত্রবধূর কাছ থেকে' কারি' রান্না করার রেসিপি নিয়েছে, এখন আপনাদের ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করতে চায়।"

শুনে ওরা তুজনেই হেসে উঠলেন।

চার্লস্ অ্যাণ্ড্রুজ-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা অন্যরকমের। কবির মনে হোল তিনি যেন প্রাণের মিতা, বহুদিনের পুরোনো

বন্ধুকে বিদেশে-বিভুঁইয়ে খুঁজে পেয়েছেন।

সাউথ কেংসিংটনের ওদের বাড়িতে অ্যাণ্ড্রুজ প্রায়ই আসতেন যদিও তিনি বৃটিশ পাদ্রী, তবু অ্যাংলিক্যান চার্চের সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়েছেন্। জীবনের লক্ষ্য তিনি যেন খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলে ও শান্তিনিকেতনে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের কথা শুনে তিনি ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, এ এক নতুন ধরনের স্কুল, মিঃ অ্যাণ্ড্রুজ। এখানে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। শিক্ষক এখানে ছাত্রের পরম বন্ধু ও পথের দিশারী। এখানে স্কুলে কোন বাঁধা-ধরা ক্লাস হয় না। মাঠের মাঝখানে গাছের ছায়ায় এই স্কুল বসে। ক্লাশেরও ঘণ্টা-বাঁধা সময় নেই। একজন ছাত্র যদি একটি বিষয়ে খুব এগিয়ে যায়, তাহলে সে উঁচু ক্লাশের ছেলেদের সাথেও সেই বিষয়ে ক্লাশ করতে পারে।"

"কিন্তু আপনার এই স্কুলের আদর্শ কী?"

"প্রত্যেক ছাত্রের ভেতরকার সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রকাশ করে তোলা তাদের সত্যকারে পরিপূর্ণ মানুষ করে তোলা। শুধু পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে আবদ্ধ না করে তাদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া যাতে জীবন থেকে তারা সব সম্পদ আহরণ করতে পারে।"

"আপনার এই স্কুলের কথা শুনে সেখানে যোগ দিতে ভীষণ ইচ্ছে করছে।"

"তাহলে চলে আসুন আমাদের ওখানে," রবীন্দ্রনাথ বললেন। "শিক্ষক হিসেবে আপনি যোগ দিন। আপনার জ্ঞান ও চরিত্রের মাধুর্যে আমাদের বিদ্যালয় ধন্য হয়ে যাবে, আমাদের দেশ এক মহা সম্পদ পাবে।"

"না, না আপনি ওসব কথা বলবেননা মিঃ টেগোর। আমি যদি আপনাদের সেবা করতে পারি, তাহলে নিজেকেই আমি কৃতার্থ বলে মনে করবো।"

একদিন লণ্ডনে যখন সকাল থেকেই বৃষ্টি, ভিজে স্যাঁতসেতে ভাব, তখন অ্যাণ্ড্রুজ রবীন্দ্রনাথের ফ্লাটে এসে হাজির। এসেই বললেন, মিঃ টেগোর, ঠিক করেছি আমি আপনার স্কুলে যোগদান করবো।"

রবীন্দ্রনাথ সহজে উত্তেজিত হননা, কিন্তু এ সংবাদ তাঁকেও বিচলিত করে তুলল। অ্যাণ্ড্রুজের ডান হাতটি নিজের দুহাতের মধ্যে চেপে ধরে বললেন, "এ আমাদের পরম সৌভাগ্য রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ। আপনাকে কিন্তু অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে। আমাদের দেশে তো ইউরোপের মত এত স্বাচ্ছন্দ নেই।"

"আরামের জন্য তো পাদ্রীর জীবন বেছে নিইনি মিঃ টেগোর। আপনি ও সবের জন্য বিশেষ ভাববেননা। দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার শক্তি ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন।"

"সত্যি, আজ আমার বড় সৌভাগ্যের দিন। আমি আজকেই শান্তিনিকেতনে ওদের সব লিখে দিচ্ছি। আপনি কবে যাবেন?"

"আমার কিছু কাজকর্ম এখানে বাকী আছে। সেগুলি শেষ করে শীতকাল পড়লেই চলে যেতে পারি।"

শান্তিনিকেতনে অ্যাণ্ড্রুজের এই যোগ দানের সিদ্ধান্তে দুজনেই যেন কিছুটা উত্তেজিত। শিক্ষার প্রসার নিয়ে ওদের মধ্যে নানা কথা হোল। কী করে শান্তিনিকেতনকে বড় করা যায় নতুন কী কী বিভাগ খোলা যায় তার জল্পনা কল্পনা।

হঠাৎ অ্যাণ্ড্রুজ বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন। আমি জানি আপনার পিতা ও পিতামহ বাংলাদেশে খুবই সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন। কী রকমভাবে আপনার ছেলেবেলা কেটেছে, কী কোরে কবিতা লেখা শুরু করলেন?"

এ রকম অনুরোধ অ্যাণ্ড্রুজের কাছ থেকে আসবে কবি তা ভাবতে পারেননি। একটু চুপ করে থেকে তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "আমার ছেলেবেলা ভীষণ একা একা কেটেছে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ। বাবা হিমালয়ের পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতেন, তাঁর সঙ্গ বিশেষ পাইনি। মাকেও খুব অল্পবয়সে হারিয়েছি। ছেলেবেলা বলতেই মনে পড়ে চাকরদের শাসনের মধ্যে মানুষ হওয়া। একমাত্র মুক্তি ছিল বাইরের জানালা ধরে আকাশের মেঘ বা দূরের গাছপালা দেখা। সেই সব প্রকৃতির দৃশ্য বোধহয় আমাকে আস্তে আস্তে কবি করে তুলেছে।"

রবীন্দ্রনাথ বলতে লাগলেন, তিনি যখন বিদ্যাপতি ও চণ্ডিদাসের কবিতা পড়ছিলেন, তখন মুগ্ধ হয়ে একদিন বিদ্যাপতির নকল করে মৈথিলী ছন্দে 'ভানুসিংহের পদাবলী' লিখলেন যা বড়রা কেউ বিশ্বাসই করতে পারে না যে এ আসলে এতো অল্পবয়সের বালকের লেখা। কিন্তু 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যখন লিখলেন, তখন থেকেই পুরানো ক্লাসিকাল রীতি ছেড়ে রোমান্টিক কবিতা লিখতে শুরু করলেন। কিন্তু এ সবই তাঁর নিজের স্টাইল। এখানে তিনি যেমন বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণ করেননি, তেমনি কোন ইংরেজী কবিতারও অনুসরণ করে 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' লেখেননি।

কিন্তু প্রকৃত কবি হিসেবে তাঁর জন্ম হোল যখন কলকাতার সদর স্ট্রীটে থাকতে জীবন সম্পর্কে হঠাৎ তাঁর এক নতুন উপলব্ধি হোল। একদিন সকালবেলায় বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন তিনি দূরের ফ্রি স্কুল স্ট্রীটের বাগানের দিকে তাকিয়ে আছেন, যখন আস্তে আস্তে সকালের সূর্য গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে উঠছে, তখন তাঁর চোখের সামনে দিয়ে যেন একটি পর্দা সরে গেল।

"আমি দেখলাম এই জগত যেন আনন্দের সমুদ্রে ভাসমান, তার সৌন্দর্যের জ্যোতি যেন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আমার সকল দুঃখের কাল আবরণ ভেদ করে সেই আনন্দের লহরী যেন আমাকে

ছেয়ে ফেলল।”

“সেইদিনই আমি ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কবিতাটি লিখলুম,” রবীন্দ্রনাথ বলে চললেন, “কবিতাটি লেখার পরেও তার রেশ আমার হৃদয়ের মাঝে আচ্ছন্ন করে রইল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখলুম, লোকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে, কুলিরা মাল বইছে, রিক্সায়ালারা রিক্সা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের সব কিছুই যেন আমার কাছে আনন্দ দিয়ে মাখা বলে মনে হোল। আনন্দলহরীতে তারা যেন ভেসে চলেছে। আমার যেন মনে হোল এদের চলাফেরার মাঝে আমি সমস্ত মানবসভ্যতার আন্দোলন দেখতে পাচ্ছি, যেন সঙ্গীতের মূর্ছনা শুনতে পাচ্ছি, যেন রহস্যময় নৃত্যের ছন্দ শুনতে পাচ্ছি।”

“আমার এই অনুভূতি বেশ কয়েকদিন ছিল। তারপর আমার দাদার সঙ্গে যখন দার্জিলিং বেড়াতে গেলুম, তখন ভেবেছিলুম হিমালয়ের ছায়ায় এসে সেই অন্তরের আলো আরও পরিপূর্ণ ও সমুজ্জ্বল হবে। কিন্তু তা আর হোল না, সেই অনুভূতি আমার একেবারেই হারিয়ে গেল।”

“সেই হচ্ছে আমার ‘প্রভাত সঙ্গীত’ কাব্যগ্রন্থের সূচনা। তারপর শিলাইদহে গিয়ে জমিদারী দেখলুম। তখন অনেক কবিতা লিখেছি, অনেক গল্প রচনা করেছি। কিন্তু তাতে মন ভরল না। বরাবরই আমি চেয়েছিলুম মনের মতো একটি স্কুল স্থাপন করতে। কলকাতায় যখন তা হোল না, তখন বোলপুরের শান্তিনিকেতনে গিয়ে সেটি প্রতিষ্ঠা করলুম। অসংখ্য বাধা পেয়েছি, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে অনেক সময় সেই স্কুল চালাতে হয়েছে। আমার সব বই বিক্রি করেছি তার জন্য, এমনকি কপি-রাইটও অনেক সময়। প্রথমে ভেবেছিলুম এই বিদ্যালয়টি হবে স্বাদেশিকতার আদর্শে উদ্দীপিত, এখন আস্তে আস্তে অনেক আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে গেছে।”

“আমার একচল্লিশ বছর বয়েসে স্ত্রীর মৃত্যু হয় যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনত্রিশ। তারপর আমার মধ্যম কন্যা রেণুকার যক্ষ্মারোগ

ধরে, যা শত চেষ্টাতেও আর সারলো না। সবচেয়ে বেশী দুঃখ পেলুম যখন আমার পরম আদরের কনিষ্ঠ পুত্র শমীন্দ্র হঠাৎ কলেরায় মারা গেল।”

“কিন্তু কী জানেন রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ? এই সব মৃত্যুশোক আমার জীবনে যেন আশীর্বাদও বহন করে নিয়ে এল। আমার মনে হোল মৃত্যুতেই জীবনের শেষ নয়। পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র কণাও যদি হারিয়ে যায়, তাহলেও তার বিনাশ হয় না। মৃত্যুর ভেতর দিয়ে আমি যেন জীবনের পরিপূর্ণতা খুঁজে পেলুম।”

অ্যাণ্ড্রুজ মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের সেই সব কথা শুনছিলেন। ওদের দুজনেরই খেয়াল নেই কখন সকালের সেই বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ কেটে গিয়ে উজ্জ্বল রৌদ্র জানালা দিয়ে এসে সারা ঘর ভরিয়ে দিয়েছে। অ্যাণ্ড্রুজের মনে হোল তিনি যেন এক নতুন সম্ভাবনার সম্মুখীন হচ্ছেন। এ যাত্রা তাঁকে অন্য জগতে নিয়ে যাবে, তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করে দেবে, যা খৃষ্টান চার্চের মধ্যে তিনি পাননি।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের লণ্ডন আর ভাল লাগছিল না। এই দিনরাত বৃষ্টি আর স্যাঁতসেঁতে ভাব ছেড়ে রৌদ্রস্নাত দিনের জন্য তাঁর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছিল। ইংরেজ বন্ধুরাও অনেকে অনুপস্থিত, আগস্ট মাস পড়লেই পারতপক্ষে সব মধ্যবিত্তই শহর ছেড়ে গ্রাম বা সমুদ্রের দিকে পালায়। ফলে কবির শরীর ক্রমাগত কৃশ হতে শুরু করল।

রবীন্দ্রনাথের এই অবস্থা দেখে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজের খুব খারাপ লাগল। তাঁর মনে হোল রবীন্দ্রনাথেরও কয়েকদিন ইংলণ্ডের গ্রাম ঘুরে এলে ভাল লাগবে। বিশেষ করে তিনি চান যে কবির ইংলণ্ডের গ্রামজীবনের সঙ্গে পরিচয় হোক যা শহরের জীবনযাত্রা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

ট্রাফোর্ডশায়ারের মিউনিসিপ্যাল বরো নিউক্যসল-আণ্ডার-লীন্-এর অন্তর্গত বাটার্টন নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে অ্যাণ্ড্রুজের পাদ্রী বন্ধু রবার্ট আউটরাম্ সস্ত্রীক বাস করছিলেন। তাঁর সঙ্গেই চিঠি লিখে তিনি রবীন্দ্রনাথের গ্রাম পরিদর্শনের আয়োজন করলেন।

এই রেভারেণ্ড আউটরাম ছিলেন ভারতে সিপাই বিদ্রোহের যুদ্ধের বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি জেনারেল জেমস্ আউটরামের পুত্র। তখন তিনি ছিলেন বাটার্টন গ্রামের ভিকার।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাকে আনার জন্য তিনি সকালবেলায়ই রেলস্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি নিয়ে হাজির। সেই খোলা গাড়িতে গ্রামের পথ দিয়ে যেতে যেতে পথের ধারের সবুজ দৃশ্যাবলী দেখে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভাল লাগল। চারদিকে যেন ফুলপল্লবের সরসতা ও প্রাচুর্য। মাটির ওপর এমন ঘন ও সবুজ ঘাসের আস্তরণ যেন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের সবচাইতে ভাল লাগল এই সব ক্ষুদ্র গ্রামের সুন্দর শান্ত জীবনযাত্রা। বিকেলবেলায় রেভারেণ্ড আউটরাম যখন তাঁকে নিয়ে গ্রাম পরিদর্শনে বেরোলেন, তখন কবি অবাক হয়ে গেলেন তিনি সাধারণ চাষী-গৃহস্থের সঙ্গে কী রকম অমায়িক ও সাধারণভাবে কথাবার্তা বলছেন, সেখানে একটুও ধর্মের বা শিক্ষার ঔদ্ধত্য নেই। রবীন্দ্রনাথ আরো লক্ষ্য করলেন প্রত্যেক চাষীর বাড়ি ঘর যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, কোথাও অযত্নের চিহ্ন নেই। প্রত্যেকেরই বাড়ির চারপাশে খেত করা হয়েছে, সামনে ফুলের ও পেছনে তরিতরকারির বাগান। এরা যেন প্রত্যেকেই বুঝেছে যে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি শৈথিল্য আসলে আত্ম অবমাননারই শামিল।

রেভারেণ্ড আউটরামকে দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল যে প্রাচীন ধর্মমতের গোঁড়ামি সর্বত্র খসে পড়ছে বলেই ইউরোপের পক্ষে তার অনির্বাণ প্রাণশক্তিকে বহন করা সম্ভব হচ্ছে। চলা ইউরোপের

ধর্ম—গতির বেগে সে নিজের সকল বাধাকে ক্রমাগত আঘাত করে করে ক্ষয় করছে। সেইজন্য খৃষ্টান ধর্মমত যেখানে গতিহীন তার বিরুদ্ধে তথাকার প্রবল প্রানের প্রতিক্রিয়া চলছে। সেখানকার অনেকে খৃষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদ মানে না, যিশুকে অবতার বলে স্বীকার করে না। বাইবেলে বর্ণিত অতিপ্রাকৃত ঘটনায় তাদের কোন আস্থা নেই। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছেন যে ইউরোপের ধর্মপ্রকৃতির মধ্যে খুব একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছে।

কিন্তু যে সব খৃষ্টান মিশনারীরা বিদেশে খৃষ্টধর্ম প্রচার করছেন তার মধ্যে কোন গৌরব নেই, কারণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে স্বজাতির অত্যাচারের বিরুদ্ধে এইসব পাদ্রীরা রুখে ওঠেন না। এই জন্য এইসব পাদ্রীর দল উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক অধিনায়কদের নিদারুণ দস্যুবৃত্তি ও কসাইবৃত্তি করতে লেশমাত্র সংকোচ বোধ হয় না। এইসব পাদ্রীরা সেইসব হীনকর কাজে কোন বাধাই দেন না। তাদের সেই পুণ্যজ্যোতি নেই যার সামনে এই সব বিরাট পাপের কলঙ্ককালিমা সর্বসমক্ষে বীভৎস রূপে উৎঘাটিত হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ জানেন যে ভারতবর্ষে খৃষ্টান পাদ্রীরা কেমন হিন্দু-মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখে যদি না তারা খৃষ্টান হয়। শুধু তাই নয়, তাদের এক প্রধান কাজই যেন অখৃষ্টান জাতির ধর্ম, সমাজ ও আচার-ব্যবহারকে যতদূর সম্ভব কালিমালিপ্ত করা। অথচ এমন কোন জাতি নেই যার হীনতা ও শ্রেষ্ঠতাকে আলাদা করে দেখানো না যায়। কিন্তু অন্য জাতিকে হীন হিসাবে দেখিয়ে এই পাদ্রীরা খৃষ্টান-অখৃষ্টানদের মধ্যে যত বড়ো প্রভেদ ঘটিয়েছেন এমনটি বোধ হয় আর কেউ করেনি।

কিন্তু কোন সম্প্রদায় সম্পর্কেই সাধারণভাবে কোন কথা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন ভারতবর্ষের প্রতি হীনমন্যতায় ভরা পাদ্রী অনেক ভারতে দেখেছেন, তেমনি আবার লণ্ডনে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজের মত পাদ্রীও দেখলেন যিনি পাদ্রীর চাইতে খৃষ্টান বেশি,

অর্থাৎ ধর্ম যার কাছে ব্যবসায়িক মুর্তি ধরে উগ্ররূপে দেখা দেয়নি, সমস্ত জীবনের সঙ্গে সুসম্মত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। খৃষ্টান শাস্ত্রোপদিষ্ট একান্ত নম্রতা, মাধুর্য ও উদারতা যেন এই সব মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত।

যদিও রেভারেণ্ড ও মিসেস আউটরাম ওদের অনেক যত্নে রেখেছিলেন, কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই কবির রোদনস্টাইনের সঙ্গলাভের জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। রোদেনস্টাইনরা যখন গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে গ্লস্টারশায়ারের চ্যাল্‌ফোর্ড গ্রামে এলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ ওদের চিঠি লিখে জানালেন ওরা ওখানে আসতে পারেন কিনা। রোদেনস্টাইন সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখলেন তিনি স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে ওদের নিয়ে আসবেন।

কিন্তু চ্যালফোর্ডে এসে আর রৌদ্রজ্জ্বল দিনের মুখ দেখা গেল না। মনে হলো লণ্ডনের বৃষ্টি ও কুয়াশা তাদের পেছন পেছন ধাওয়া করে এসেছে। প্রায় প্রত্যেক দিনই বৃষ্টি হতে লাগল।

রোদেনস্টাইন ক্ষমা প্রার্থনার স্বরে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাকে এই বিশ্রী আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে আসার জন্য ক্ষমা চাইছি। ভাবতেই পারিনি যে এখানেও আবহাওয়া এত খারাপ হবে।"

"ভ্রমণকারীর সব রকম আবহাওয়ার জন্যই প্রস্তুত থাকা উচিত।" রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন।

এই আবহাওয়ার জন্য কবি যেন তৈরী হয়েই ছিলেন। ওদের কটেজের একটি ঘরে বসে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর নানা রকম বাংলা কবিতার ইংরেজী অনুবাদ করতে লাগলেন যার নাম দিলেন 'দি গার্ডেনার'।

এই সময় তাঁর অন্তরঙ্গ সঙ্গী ছিল রোদেনস্টাইনের বড় ছেলে জন্‌ যার বয়েস তখন এগার বছর। রবীন্দ্রনাথের সে ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। রবীন্দ্রনাথও তাকে খুব স্নেহ করতেন, তার মধ্যে

যেন তাঁর মৃত পুত্র শমীন্দ্রের ছায়া দেখতে পেতেন। একটু আবহাওয়া ভাল হলেই বাড়ির পেছনের গাছের তলায় দুজনে বসে গল্প করতেন।

জনের খালি প্রশ্ন, "মিঃ টেগোর, তুমি স্নেক দেখেছো? বিগ স্নেক?"

"হাঁ, তোমার বয়েসে স্নেক্‌চার্মাররা আমাদের বাড়ির সামনে ঝুড়িতে করে সাপ নিয়ে এসে তার খেলা দেখাতো।"

"কিন্তু তারা কামড়াতো না?"

"আসলে তারা শান্ত ও কিছুটা পোষা। তাছাড়া তাদের বিষ দাঁত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং দু-একটা ছোবল দিলেও তা সাংঘাতিক হয় না।"

"হোয়াট অ্যাবাউট টাইগার?" জনের প্রশ্ন।

"সব চাইতে বড় টাইগার তো এই বেঙ্গলে-এই, 'রয়াল বেঙ্গল টাইগার' নামে তারা ভুবন বিখ্যাত। তারা ভয়নক হিংস্র।"

"আমি কিপ্‌লিং-এর 'জাঙ্গল্‌ বুক' পড়েছি। এ বইটি আমার ভীষণ ভাল লাগে।"

"কিপলিং ভারতের একটা দিকই দেখিয়েছেন, জন। তোমার বাবা তার আর একটা দিক অনুসন্ধান করতে ব্যস্ত। তুমি যখন বড় হবে, তখন ইণ্ডিয়াতে বেড়াতে এসো, দেখবে ইণ্ডিয়ার অতীত শিল্প-সভ্যতার নিদর্শন।"

"আমার বাবা বলেছে তুমি একটা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছো তুমি যার প্রিন্সিপ্যাল।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন, "স্কুল একটি প্রতিষ্ঠা করেছি বটে, কিন্তু আমি তার প্রিন্সিপ্যাল নই। সেখানে ক্লাস রুমের মধ্যে তোমাকে আবদ্ধ থাকতে হবে না। সেখানে ক্লাস বসে মাঠের মাঝখানে, গাছের তলায়, ঠিক এখন আমরা যেমন গাছের তলায় বসে আছি। সেখানে তোমার প্রিয় বিষয় নিয়ে তুমি যতখুসী

পড়াশুনো করতে পারো।"

"রিয়েলি, ক্লাস রুমের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকতে হবে না, আর আমি যত খুসী খেলা করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। সেখানে পড়াই তো খেলা। তোমার যা পড়তে বা করতে ভাল লাগে, তাই যদি তুমি করার সুযোগ পাও, তাহলে সেই কাজটাই তো খেলার মত আনন্দ দেয়। তবে খুব ভোরে উঠতে হবে তোমাকে, প্রত্যূষে ঈশ্বর আরাধনার পর দিন শুরু করতে হবে।"

ভোরে ওঠা শুনে জন্ একটু নিরাশ হয়ে পড়ল। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ বালক-বালিকাই সকালবেলায় একদম উঠতে চায় না। বিশেষ করে লণ্ডনে বসে জানালা দিয়ে জনের মত ছেলেরা যখন দেখে যে বরফ পড়তে শুরু করেছে, তখন মন চলে যায় সটান বিছানায় ফিরে যেতে।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের মনে এল তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির ইংরেজীতে অনুবাদ করার। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় ডিনার খাবার পর তিনি 'শিশু' থেকে অনূদিত কয়েকটি কবিতা ওদের পড়ে শোনালেন। তা শুনে রোদেনস্টাইন দম্পতির তৃপ্তি হোল না। ওরা বার বার কবিকে অনুরোধ করতে লাগলেন আরও সেই সব কবিতার অনুবাদ করতে।

কিন্তু আবহাওয়া সব সময়ে একরকম থাকে না। হঠাৎ একদিন ভীষণ উজ্জ্বল দিন এল। সেদিন লাঞ্চের পর সবাই মিলে বেড়াতে বেরোলেন।

ইংলণ্ডের কান্ট্রি-সাইড সত্যিই সুন্দর। প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ির সামনে পেছনে খানিকটা করে জমি আছে। গ্রীষ্ম পড়তেই সেখানে বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আর বাড়ির পেছনে সবজির চারা পুঁতে সবাই চাষ করতে লেগে যায়।

হাঁটতে হাঁটতে ওঁরা ফার ওক্‌রিজ নামে এক জায়গার একটি খামার বাড়ির সামনে এসে পড়লেন। বাড়িটা দেখেই রোদেন-

স্টাইন তার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। অ্যালিসও তাঁর দেখাদেখি থমকে দাঁড়িয়েছেন।

রোদেনস্টাইন যেন খানিকটা স্বগতোক্তির সুরেই বললেন, "অ্যালিস, দ্যাখো, এই খামার বাড়িটা কী সুন্দর! খুব কিনতে লোভ লাগছে।"

অ্যালিস বললেন, "আমারও খুব ভাল লাগছে। তুমি তো একটা স্থায়ী কান্ট্রি হাউজ খুঁজছিলে? এইটাই খোঁজ করে দেখনা। মিঃ টেগোর, আপনার কী মনে হয়, বাড়িটা কান্ট্রি হাউজ হিসেবে আইডিয়াল হবে না?"

"হাঁ, এর অনেক সম্ভাবনা আছে", রবীন্দ্রনাথ সায় দিলেন। "কিন্তু এর সংস্কারের পেছনে অনেক খাটতে হবে কিন্তু। বাংলার ইন্‌টেরিয়ের-এ আমাদের একটি কুঠিবাড়ি ছিল, তাকে ঠিক করতে আমার অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে।"

অ্যালিস হেসে বললেন, "ওহ্, আপনি জানেন না মিঃ টেগোর উইল্ যখন যার পেছনে লাগে, তখন সেটা শেষ না করে ছাড়ে না। সময় ও অর্থের কোন কিছুই কার্পণ্য করে না তখন।"

"সে আমি জানি। আমার নিজের উদাহরণ দিয়েই আমি তা বুঝতে পারি।"

"আপনি ও রকম কথা বলবেন না, মিঃ টেগোর" রোদেনস্টাইন প্রতিবাদের সুরে বললেন। "আপনি এখন আমার পরম বন্ধু, বন্ধুর কাছে কী কেউ ঋণী থাকে? আপনারা তিনজনে কী কম আমাদের জীবন সমৃদ্ধ করেছেন?"

তারপরে একটু থেমেবললেন, "আসলে গতবার যখন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলাম, সেখানে আমার ছবির প্রদর্শনী থেকে কিছু টাকা পেয়েছিলাম। সেটাই এখানে সদ্‌ব্যবহার করার কথা ভাবছি।"

আগস্ট মাসের শেষে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে ফিরলেন। লণ্ডনে বাসা ভাড়া করে সংসার চালান খুবই খরচের ব্যাপার। তাই আগের বাসা তুলে ওরা ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে গিয়েছিলেন। এবার এসে অ্যালফ্রেড প্লেস-এ একটি ফ্লাট ভাড়া করলেন।

এখন আবার নানারকম লোকের ভিড়ে কবির জীবন ব্যস্তধারায় চলল। তবু তার মধ্যেই কবিতার অনুবাদের কাজ চলেছে। বিশেষ করে তিনি আমেরিকায় যাবার আগে তাঁর 'গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের খসড়া রোদেনস্টাইনের হাতে দিয়ে যেতে চান। তাঁর 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতাও অনুবাদ করা হয়েছে যা তাঁর ইচ্ছে আছে 'দি ক্রেসেণ্ট মুন্' নামে প্রকাশ করার।

ইতিমধ্যে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' থেকে তাঁর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশের সব ব্যবস্থাই ঠিক হয়ে গেছে। ইয়েটস্ আয়র্ল্যাণ্ডের গোর্ট থেকে রোদেনস্টাইনকে লিখেছেন যে দু-একদিনের মধ্যেই তিনি এটির 'ভূমিকা' লিখে পাঠাবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেন কোন কাট-ছাঁট না করেন—"আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট এনিথিং ক্রসট্ আউট বাই টেগোরস্ মডেস্‌টি।"

কয়েকদিন পরেই রবীন্দ্রনাথ ইয়েট্‌স্-এর সেই ভূমিকাটি হাতে পেলেন। পড়ে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেলেন, বিশেষ করে শেষ লাইনগুলি: "The work of a supreme culture, they yet appear as much the growth of the common soil as the grass and the rushes."

কোনদিন ভাবতে পারেন নি তিনি যে ইয়েটস্-এর মত খ্যাতনামা কবিও তাঁর কবিতা পড়ে এমনভাবে মুগ্ধ হবেন।

'ডাকঘর'-এর মতো রবীন্দ্রনাথের বাংলা 'চিত্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদও ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদার' নাম দেওয়া হচ্ছে 'চিত্রা'। আশ্চর্য মানুষের অভিরুচি। কবির 'মালিনী' নাটক অ্যাণ্ড্রুজের এত ভাল লেগেছে যে তাই পড়ে তাঁর

গ্রীক নাটকের কথা মনে পড়েছে। রবার্ট ট্রেভেলিয়ান-এর শেষ একই অভিমত। তিনি কবি ও গ্রীক নাটকের ওপর এক খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ। এই নাটকের ভেতরে তিনি গ্রীক সাহিত্যের রস পেয়েছেন। অথচ 'মালিনী' নাটকটি ইয়েট্‌স্‌-এর একটুও ভাল লাগেনি। এর মধ্যে তিনি ধ্রুপদী সাহিত্যের কোন চিহ্ন দেখতে পাননি।

আবার রবীন্দ্রনাথের জীবন লাঞ্চ-ডিনার পার্টির হট্টগোলে বিপর্যস্ত হতে লাগল। তাঁর কবিখ্যাতি লণ্ডনের গুণী সমাজে ভীষণভাবে ছড়িয়েছে। সবাই তাঁর দর্শন চায়, তাদের বাড়িতে আহ্বান করতে চায়। তারা কবির মুখে তাঁর ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি শুনতে চায়, তার লেখা গান শুনতে চায়। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তাদের কৌতুহলের অন্ত নেই।

আর থাকতে না পেরে কবি শান্তিনিকেতনে অজিত চক্রবর্তীকে চিঠি লিখলেন, "ইচ্ছে করে কোন দূর সমুদ্র পারে আলোর দেশে গিয়ে ঘর বাঁধি।...মানুষকে বিধাতা মন্থরগামী করে সৃষ্টি করেছেন, ...নইলে আজ...সকালে কে আমাকে ধরে রাখতে পারত ?"

একমাত্র শান্তি ছিল রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজের সান্নিধ্য। তাঁর কাছে এলে কবির মনে হোত কতদিনের পুরোনো বন্ধুর সংস্পর্শে এসেছেন। ভারতবর্ষের ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে দুজনে অনেক আলোচনা করেছেন। অ্যাণ্ড্রুজের ভারতে ফিরে যাওয়ার সব ঠিক। কবি আমেরিকায় রওনা দিলেই তিনি লণ্ডন ছাড়বেন ঠিক করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা যাবার দিনও ঘনিয়ে এসেছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি ওঁরা রওনা দেবেন স্থির হয়েছে। রওনা দেবার আগে অনেক প্রস্তুতি, রথীকেই সব ছুটোছুটি করে করতে হচ্ছে। কবির অর্শের রক্ত পড়া কয়েকদিন বেশ বেড়েছে, রাত্রে বেশ কষ্ট পাচ্ছিলেন। লণ্ডনে যখন অপারেশন হোল না, তখন

ভরসা আমেরিকায় গিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করাবেন। বিশেষ কোরে শিগাগোতে ডাঃ নেইস্‌-এর মত বিশেষজ্ঞ যখন আছেন।

এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখে বোলপুরের কাছে সুরুল-এ একটি কুঠিবাড়ি ও তার সংলগ্ন বিস্তৃত বাগান আট হাজার টাকায় কিনে ফেললেন। এটির মালিক ছিলেন কর্নেল নরেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভাই। আদিতে তৈরি হয়েছিল ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ইঞ্জিনিয়ার মিঃ উইলসনের বসবাসের জন্য, পরে রায়পুরের সিংহরা কিনে নেন।

অর্থের টানাটানি সত্ত্বেও এই বাড়ি কেনার পেছনে রবীন্দ্রনাথের একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। সেটি হোল দেশে রথীর জন্য বাড়ি ও ল্যাবরেটরি তৈরি করার ব্যবস্থা করা। তাঁর ইচ্ছে যে এবার আমেরিকা থেকে ফিরে এসে রথীর আর শিলাইদহে নয়, বোলপুরের কাছেই কৃষি-বিজ্ঞানের গবেষণা কাজে নিযুক্ত থাকা। তার ফলে শান্তিনিকেতনের স্কুলের সঙ্গে তার সম্পর্ক যেমন নিবিড় হবে, সেই বিদ্যালয়ও তেমনি রথীর শিক্ষা ও গবেষণার অংশভাগী হবে।

এই বাড়ি কেনার কয়েকদিন পরেই রথী খবর নিয়ে এল যে আমেরিকায় যাবার জাহাজ ছাড়বে উনিশে অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি দেশে চিঠি লিখলেন, "...আমরা সূর্যাস্তের পথ অনুসরণ করতে চললুম। এবার অতলান্তিকের ওপারের ঘাটে পাড়ি দেওয়া হচ্ছে।"

এই সময়ে রোদেনস্টাইন লণ্ডনে ছিলেন না। যাত্রার দিন সকালে কবি তাঁর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। গ্লস্টারশায়ার থেকে লিখেছেন। অপূর্ব বন্ধুপ্রীতিতে ভরা সেই চিঠি। পড়া হয়ে গেলে তিনি চিঠিটি রথী ও প্রতিমার হাতে দিলেন। ওরা পড়তে লাগল:

"প্রিয় রবীন্দ্রবাবু—আমি আপনাকে আর কী বলতে পারি! কয়েকমাস ধরে আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তা কেউ আমাকে

কোনদিন দিতে পারেনি, কিন্তু এখন তা শুধু স্মৃতিই হয়ে থাকবে। আমি বিশ্বাসই করতে পারছি না যে রবিবার যখন বাড়ি ফিরে আসব তখন আপনি সেখানে নেই। আপনি আমার জীবনে নিঃশব্দে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু এমন নতুন উদ্দীপনায় ভরিয়ে তুলেছেন···যার ফলে কোনদিনই আমি আর পুরোনো জীবনে ফিরে যেতে পারবো না। আপনার সঙ্গে কাটানো এই দিনগুলি সত্যিই অপূর্ব। আমার মনে হয় না আমি আর কারোর এত কাছে এসেছি বা কারুর আত্মার এমন স্পর্শ পেয়েছি। আপনার সংস্পর্শে এসে আমি যা পেয়েছি তা আমাকে মানুষকে ভালবাসতে ও শ্রদ্ধা করতে আরও বেশী সাহায্য করবে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব আমার এই দৃষ্টিভঙ্গি যেন অটুট থাকে। এই দিনগুলি সত্যিই আনন্দের দিন ছিল যা আমি কোনদিন ভুলবো না। আপনার কবিতা ও ব্যক্তিত্ব অনেক নরনারীর ভালবাসা ও প্রশংসার কারণ যোগাবে। তবু আমার মনে হয় ভবিষ্যতে আমার থেকে কেউ বেশী আপনাকে চিনবে না।··· আপনাকে আমার অসংখ্য ভালবাসা জানাচ্ছি যা শুধু আপনাকেই নয়, আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকেও যারা সবারই মন কেড়ে নিয়েছে যারা তাদের সংস্পর্শে এসেছে। আপনার নাম চিরদিন আমাদের কাছে ঘরের লোকের মত হয়ে থাকবে এবং আপনি যখন ফিরে আসবেন, তখন দেখবেন আপনার জন্য আমাদের বাড়ির চুল্লি সেইরকমই উত্তপ্ত আছে যা আপনি যাবার সময়ে দেখে গিয়েছিলেন।

আপনার চিরদিনের প্রেমমুগ্ধ বন্ধু।

"উইলিয়াম রোদেনস্টাইন"

॥ চার ॥

এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম আটলান্টিক মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া। অক্টোবর মাস বলে শীত ভাল পড়েনি, তাই সমুদ্র তখনও বেশ বিক্ষুব্ধ। আটলান্টিকের জলের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হোল এই বোধহয় সত্যিকারের 'কালাপানি', এতো গভীর জলের এই হবে উপযুক্ত বিশ্লেষণ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পেছনে রবীন্দ্রনাথের শুধু সেই দেশটি দেখা আর রথী ও প্রতিমার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে কিছুদিন থাকা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। শুনেছেন আর্বানা ছোট্ট সুন্দর জায়গা, সেখানে চুপচাপ অলসতার মধ্যে সময় কাটানোর পক্ষে উপযুক্ত স্থান হবে। এখানে আর লণ্ডনের মতো ল্যাঞ্চ ব্যাঙ্কোয়েটের ঝামেলা হবে না, তাঁর কবিতা পাঠ নিয়ে সবাই তাঁকে টানা হেঁচড়া করবে না। এখানে তিনি একেবারেই অপরিচিত, এক-জন বিদেশী 'টুরিস্ট' মাত্র।

সত্যি, লণ্ডনে তাঁর কবিতা নিয়ে কী হৈ-চৈই না হোল! কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে বিদেশে তাঁর ইংরেজী কবিতা এত সমাদর হবে। রোদেনস্টাইনের বন্ধুত্বেরও যেন তুলনা নেই। তাঁর শত হস্তের সাহায্য না পেলে এ কবিতাগুলি খাতাতেই থেকে যেত, হয়ত বা অনুবাদ করাই হোত না। এখন তাঁরই চেষ্টায় এগুলি এখন ইংরেজীতে বই-আকারে প্রকাশিত হচ্ছে। লোকে যদি তাঁর কবিতা পড়ে আনন্দ পায় তাহলে তার প্রচারে কবির বলার কিছু নেই।

তারপর ইয়েট্স্। অমন বিখ্যাত কবি, কিন্তু কী তাঁর অমায়িক ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে তিনি এত মুগ্ধ যে সর্বত্রই তার প্রচার করতে চান। তাঁর সেক্রেটারী এজরা

প্যাউণ্ডও রবীন্দ্রনাথের কবিতার কম ভক্ত হয়ে ওঠেনি। এই আমেরিকান যুবক কবিতাকে এমন ভালবেসেছে যে সব কিছু ছেড়ে কবিতার পেছনেই জীবন-আহুতি দিয়েছে, আজ অবধি আর কোন জীবিকা গ্রহণ করেনি। ও যদি কোনদিন স্থির হয়ে বসে গভীর বিষয় নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করে, তাহলে জগৎ-বিখ্যাত কবি হবে একদিন।

জাহাজের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এই সব কথা ভাবছিলেন। আর্নেস্টরাইস, আর্থার ফক্স-ট্র্যাংওয়েস, সি. এফ অ্যাণ্ড্রুজ—এদের বন্ধুত্ব ভোলবার নয়। এরা সেই সাম্রাজ্যগর্ধী ভারতীয় ঘৃণাকারী ব্রিটিশ নন, এরা সত্যিকারের ভদ্র ও সংস্কৃতিবান পুরুষ। তিনি তাই দেশের পরিচিতদের চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে বৃটিশ জাতির সত্যিকারের চরিত্র বুঝতে হলে ইংলণ্ডেই আসতে হবে, ভারতে তার পরিচয় মিলবে না।

আমেরিকায় আসা নিয়ে রথীর উৎসাহ ভেবে কবির হাসি পেল। প্রথমবার যখন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে সে দেশে গিয়েছিল, তখন আগেকার সেই লাজুক ছেলেটিকে চেনা দায়। তখন সে কথায়-ব্যবহারে রীতিমত পরিণত যুবক। শিলাইদহে যখন রবীন্দ্রনাথ রথীর সঙ্গে কিছুদিন বোটে ছিলেন, তখন রথীই খালি কথা বলে চলত, আর কবি চুপচাপ সেই সব কথা শুনতেন। রথীর সব আমেরিকার গল্প, তার বিদেশ-অবস্থানের অভিজ্ঞতা।

আজ রথীর জন্যই এই আমেরিকায় যাত্রা করা, ওর ভীষণ ইচ্ছে ; আর্বানায় ফিরে গিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি করা। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারেন যে রথীর ওপর তিনি ক্রমেই বেশী নির্ভর করছেন। রথী এখন তাঁর শুধু স্বাবলম্বী পুত্রই নয়, সত্যিকারের বন্ধু হতে চলেছে।

সবচাইতে পরিবর্তন হয়েছে প্রতিমার। যখন গগনেন্দ্রনাথের এই বাল-বিধবা ভগ্নীকে রথীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন, ঠাকুরবাড়িতে

সেই হোল প্রথম বিধবা বিবাহ। এই নিয়ে কত লোকে বাঁধা দিয়েছে, কত লোকে নিন্দা করেছে। অনেকে আবার বিদ্যাসাগরের ছেলের পরিণতির কথা উল্লেখ করতে ছাড়েনি যেখানে সে অল্প-বয়েসেই মারা গেল। তারা বলেছে এ বিয়ে কখনই সুখের হবে না বিধবা-বিবাহের অভিশাপ লেগে থাকবেই।

আজ তারা একবার রথী ও বৌমার দিকে তাকিয়ে দেখুক। কি সুন্দর মানিয়েছে ওদের দুজনকে! সত্যি, প্রতিমার পরিবর্তন দেখে অবাক হতে হয়। ইংলণ্ডের আসার আগেও সে লাজুক বধূ ছিল। এখন লণ্ডনে এই কয়েক মাস থেকেই তার কী রকম ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। এখন সে মেয়েদের 'সাফ্রেজ' আন্দোলনে যোগ দেয়, রীতিমতো ইংরেজী বই নিয়ে পড়াশুনা করে। তার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ সাগর পরিবর্তনের মতো আশ্চর্যজনক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ চিরদিনই স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এ প্রসঙ্গেই তাঁর নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। তাঁর স্ত্রীকেও তিনি লেখাপড়া শিখিয়ে নতুন ব্যক্তিত্বশালী রমণীতে পরিণত করেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সেই এগার বছরের ভবতারিণীকে তাঁর সঙ্গে যখন বিয়ে দিয়েছিলেন তখন অনেকেই নিন্দাবাদ করেছিল, বলেছিলো মহর্ষির ভিমরতি ধরেছে, নইলে অত সুন্দর বাইশ বছরের ছেলের সঙ্গে কিনা কালো অশিক্ষিতা এক গরীব গোমস্তার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। তাদের বিরুদ্ধে মহর্ষীর ছিল সোজা উত্তর "বিয়েটা হচ্ছে ভাগ্যের, তার পরে স্ত্রীকে তোমরা কী ভাবে পরিবর্তন করে নাও, সে তোমাদের হাতে।"

হয়ত পিতৃদেব সত্যি কথাই বলেছেন। ভবতারিণীকে মৃনালিনীতে পরিবর্তন করতে তিনি কম চেষ্টা করেননি। তার ইংরেজী শেখার জন্য গভর্নেস রেখেছিলেন; সঙ্গীতের তালিম দিয়েছিলেন, এমনকি নিজের নাটকে অভিনয় করতেও নামিয়েছিলেন। আস্তে আস্তে মৃনালিনী তাঁর সত্যিকারের মর্মসঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। যখন

তাকে 'ভাই ছুটি' বলে সম্বোধন করে চিঠি লিখতেন, তখন তাতে তিনি তাঁর মনের অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছিলেন।

হায়, আজ তিনি কোথায়! রবীন্দ্রনাথের পাশে রথী, প্রতিমার সঙ্গে থাকলে তিনিই সবচেয়ে বেশী সুখী হতেন। কিন্তু সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। ভগবান বোধহয় মানুষকে সব সুখ একসাথে দিতে চাননা। নইলে স্ত্রী মৃণালিনী, পুত্র শমী, কন্যা রেনুকা—এরা সবাই এত তাড়াতাড়ি তাঁকে ছেড়ে চলে গেল কেন!

রবীন্দ্রনাথ টেরই পাননি কখন রথী ও প্রতিমা তাঁর পাশে রেলিং ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রতিমা আস্তে আস্তে বলল, "বাবামশায়, কেবিনের ভেতর চলুন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, ঠাণ্ডা লাগতে পারে।"

"আর একটু বাইরে বসে থাকি বৌমা। আমি ভাবছিলুম যে ভগবান বোধহয় মানুষকে সব সুখ একসঙ্গে দেননা। নইলে আজ যদি তোমাদের মা ও শমী আমাদের সঙ্গে থাকত, তাহলে আমাদের এই যাত্রা কত বেশী আনন্দের হোত।"

রথী বলল, "বাবামশায়, ও সব ভেবে আর বেশী উতলা হবেন না। আপনার শরীর অসুস্থ, অর্শের চিকিৎসার তো কিছুই করা হোল না। ডাক্তার অপারেশনের জন্য এতো টাকার ব্যবস্থা করতে বললেন, যা তখন আমাদের দেবার অবস্থা ছিল না। ভাবতেই আমার খারাপ লাগে।"

"না, না, ও নিয়ে তুমি মন খারাপ কোরনা।" রবীন্দ্রনাথ সজোড়ে মাথা নাড়লেন। "আমার মাঝে মাঝে ব্যথা হয় ঠিকই, তা সয়ে যাবে। অতো টাকা খরচা করে অপারেশনের জন্য আমি কিছু-তেই মত দিতে পারি না। জানো জমিদারীর আয় ততো ভাল না, তারপর শান্তিনিকেতনের জন্য অসম্ভব খরচ বেড়ে গেছে। জানিনা কোথা থেকে সেই সব ঘাটতি পূরণ হবে।"

"আমি কী আর সে অবস্থা জানিনা! তবে যে প্রধান উদ্দেশ্যে

অতদিন লণ্ডনে থাকা, সেই অপারেশনই হোলনা বলে খারাপ লাগে।"

"ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে ঠিকই হবে। তুমি ওসব নিয়ে ভেবো না রথী।" তারপর অন্যদিকে কথার মোড় ঘোরাবার জন্য রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ছাখো, আমেরিকায় যাচ্ছি, কিন্তু মনে আছে তোমার রথী যে এক আমেরিকানই আমাদের বিদ্যালয়ের সুকৃতির কথা প্রচার করে তার বিপদের দিনে অশেষ উপকার করেছিলেন? সেই যখন পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকার গত জানুয়ারী মাসে গোপন ইস্তেহার প্রচার করে জাহির করল যে আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্র পড়লে তাদের ভবিষ্যত অন্ধকার, তখন আমেরিকান আইনজীবী মিঃ ম্যারিয়ন ফেল্‌পস্‌-ই শান্তিনিকেতন ঘুরে এসে ঘোষণা করলেন যে ছাত্র-শিক্ষকের এমন মধুর সম্পর্ক তিনি কোথাও দেখেন নি। আমরা শান্তিনিকেতনে সবাইকে যেমন আপন করে দেখি তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। তাঁর এই সময়কালীন ঘোষণায় বেশ কাজ হয়েছিল, নইলে যে ভাবে সব ছেলেরা আশ্রম ত্যাগ করতে শুরু করেছিল, ভাবলুম আমাদের স্কুল বুঝি উঠেই গেল। আমার দোষের মধ্যে কালীমোহন ঘোষ, হীরালাল সেন ও নেপাল রায়কে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত করেছি। পুলিশের কাছে যারা নাকি সন্দেহজনক ব্যক্তি।"

"কালীমোহন বাবু ঢাকা কলেজে পড়ার সময় রাজনীতি করতেন শুনেছি, এখন তো তিনি এসব থেকে অনেক দূরে।" রথী বলল, "এখন শিশু-শিক্ষার ব্যাপারে এমন জড়িত হয়ে পড়েছেন যে দলীয় রাজনীতির ধারে কাছে নেই।"

"কালীমোহন কী রকম লণ্ডনের বিদূষী সমাজকে মুগ্ধ করেছে দেখেছো তো? রোদেনস্টাইন ওকে মডেল করেই বারানসীর ঘাটের ছবি অাঁকলেন।"

"শুধু তাই নয় বাবামশায়, যে কবারই আমি ইয়েটস্‌ এর বাড়ি

গেছি সে কবারই সঙ্গে কালীমোহন বাবু ছিলেন। ইয়েটস্ কালী-মোহন বাবুর ওপর ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কলের ছড়া লোকগীতি, এমন কী ভূতের গল্প অবধি তিনি কালীমোহন বাবুর মুখ থেকে শুনতে চাইলেন।”

“গদ্‌খালির ভূতের গল্প করেনি তো, তাহলে ইয়েটস্ সাহেবও আয়র্ল্যাণ্ডের গ্রামে রাত্রিবেলায় একা থাকতে ভয় পেয়ে যাবেন। আয়র্ল্যাণ্ডে আলুর দুর্ভিক্ষে অকালে কম লোক তো মরে নি!”

রবীন্দ্রনাথের কথায় এরা দুজনেই হেসে উঠল।

রথী বলল, “বাবামশায়, আপনাকে বলব বলব করেও সংকোচে বলতে পারিনি। দেশ থেকে মীরার চিঠি পেয়েছি। দ্বিজুবাবু নাকি আপনার নিন্দায় উঠে পড়ে লেগেছেন। ভাবতেই পারিনা যে এই ডি. এল. রায়ই আপনার কবিতার এমন ভাবে নিন্দা করবেন। রংপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকার সময়ে শিলাইদহে আমাদের বাড়িতে যখন আসতেন, তখন আপনার কবিতার কত প্রশংসাই আমার কাছে করতেন।”

রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সব বিষয় একেবারেই আলোচনার অযোগ্য। তাঁর লেখার প্রশংসা শুনতে তিনি যেমন নারাজ, তেমনি নিন্দার পেছনে সময় নষ্ট করতেও একদম গররাজী।

একটু চুপ করে থেকে কবি বললেন, “ও সব প্রসঙ্গ নাই বা তুললে রথী। আমার লেখা ভাল কী মন্দ, কালই তার বিচার করবে। কেউ ঢাক-ঢোল পিটিয়েও আমার লেখাকে যেমন উঁচুতে তুলতে পারবেনা, তেমনি ভাল হলে শত নিন্দাতেও তা মলিন হবেনা।”

রথী বলল, “সে আমি বুঝি। আমি তো জানি কত কষ্টে, কী গভীর মনোনিবেশের সঙ্গে আপনি এইসব লেখেন। তবু অনেক সমালোচকই ভাবে য আপনার সাহিত্যচর্চা জমিদারী আয়েসের ফলেই সম্ভব হয়েছে।”

কবি একটু দুঃখের সুরে বললেন, "জমিদারী আয়েস! ওরা কী জানে যে শান্তিনিকেতন চালাতে গিয়ে আমি প্রায় দেউলে হতে বসেছি! জানো, উনিশষ চার সালে আমি যখন তুমি ও চারজন ছেলেকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মাশ্রম স্থাপন করলুম, তখন ভাবতেই পারি নি যে দিনে দিনে তা এতবড় বিশাল মহীরুহে পরিণত হবে। এখন সেই বিদ্যালয় যত সফল হচ্ছে, ততই দেনার ভার বড় হয়ে ঘাড়ের ওপর চেপে বসছে।"

এমন সময় ডাঃ দ্বিজেন্দ্র নাথ মৈত্র এসে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনিও আমেরিকায় চলেছেন এই জাহাজে, ঠিক হয়েছে বষ্টনের একটি হাসপাতালে যোগ দেবেন।

পাশের একটি চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি বললেন, "কী রবিবাবু, আপনার শরীর এখন কেমন?"

"এখন অবধি তো ভালই ডাঃ মৈত্র, কিন্তু সমুদ্রের তাণ্ডব অবস্থা হলে 'সী-সিকনেস্' হতে বিলম্ব হবেনা," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

"কিছু ভাববেন না, আমি তো রয়েছিই। কিন্তু জলীয় পদার্থ যতটা কম পারবেন খাবেন। দেখুন, ঈশ্বরের কী বিচিত্র অভিপ্রায়। কথা ছিল কলকাতা থেকে জাহাজে করে ইউরোপে আপনার সঙ্গে আসব, না এখন এক জাহাজে চলেছি আটল্যান্টিক পার হয়ে আমেরিকায়।"

"অথচ আমেরিকায় যাওয়া আমাদের ঠিকই ছিল না", রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ছমাস আগে যদি কেউ বলত এই অক্টোবরে আমেরিকায় আসব, তাহলে তার কথা একটুও বিশ্বাস করতুম না।"

গত মার্চ মাসে কলকাতা থেকে জাহাজে এই ডাঃ মৈত্রের সঙ্গেই এক কেবিনে কবির ইংলণ্ডে আসার কথা ছিল। কেবিনে ঢুকে তিনি দেখেন যে রবীন্দ্রনাথ সেখানে নেই, তাঁর মালপত্র পড়ে রয়েছে। পরে মাদ্রাজ থেকে সেগুলি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ফেরত পাঠানো হোল।

আমেরিকায় যাওয়ার কথা উঠতে প্রতিমা বলল, "বাবামশায়, লণ্ডন থেকে মিসেস রোদেনস্টাইন-এর কাছ থেকে অনেক বিলেতী রান্নার রেসিপি নিয়ে এসেছি। আর্বানায় গিয়ে আমার কাজ হবে তার পরীক্ষা করা।"

রথী সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলল, "রক্ষে করো, ইংরেজী রান্নার এক্সপেরিমেন্ট-এর মধ্যে আমি নেই। ওদের রান্নার মধ্যে তো সেই হাড় সেদ্ধ আর রোষ্ট বিফ্। তুমি বরং সেখানে গিয়ে মিসেস্ সিমুরকে ধরে কিছু আমেরিকান রান্না শিখে নিও।"

ওর কথায় রবীন্দ্রনাথ ও ডাঃ মৈত্র দুজনেই হেসে উঠলেন।

কবি বললেন, "না না, সব দেশের রান্নারই কিছু কিছু ভাল পদ আছে। তবে যখন রোদেনস্টাইনদের কথা ভাবি, তখন মনে হয় ওদের আতিথ্যের দেনা কোনদিন শোধ দিতে পারবো না। মিঃ রোদেনস্টাইনের বাবা ছিলেন জার্মান, তবু বৃটিশ সমাজে কী রকম ওরা মিশে গেছেন, খাঁটি বৃটিশ ছাড়া আর কিছু বলে মনে হয় না।"

রথী বলল, "কেন, ডিসরেলীও তো ইহুদী ছিলেন শুনেছি।"

"হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, তিনি ভাল ঔপন্যাসিকও ছিলেন", রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "এদের পিতা বা পিতামহ বিদেশ থেকে এসে বৃটিশ সমাজে কী রকম ভাবে মিশে গেছেন, অথচ কোন ভারতীয় তিনপুরুষ ধরে ইংলণ্ডে থাকলেও তার বংশধরদের এরা ভারতীয় বলে অবজ্ঞা করবে, প্রকৃত বৃটিশ সমাজে কখনোই গ্রহণ করবে না।"

রথী বলল, "শুধু ইংলণ্ডেই নয়, আমেরিকাতেও আমি 'কালার বার' অনেক দেখেছি। তবে আমেরিকায় সুবিধে হোল যে সেখানে সবাই ইমিগ্র্যাণ্ট, কেউই জাত-কুলীন নয়। তাই নিগ্রোরা ছাড়া আর সব দেশের লোক সে সমাজের মধ্যে আস্তে আস্তে মিশে যেতে পারে। শিকাগোতে দেখেছি এশিয়া থেকে অনেক সিরিয়ান এসেছে, কিন্তু সাদা আমেরিকানদের সঙ্গে তাদের তফাত ধরা মুশকিল।"

ডাঃ মৈত্র এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন, এবার বললেন,

"রবিবাবু, আপনার আর বাইরে থাকা ঠিক হবে না।"

প্রতিমাও সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, "ডাঃ মৈত্র ঠিকই বলেছেন বাবামশায়। এবার ভেতরে চলুন। অন্ধকার হয়ে গেছে, আর ডিনারের ঘণ্টা পড়ারও বেশী দেরী নেই।"

আটলান্টিক সমুদ্র আর শান্ত থাকলনা, অচিরেই বিক্ষোভের ঢেউ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে আবাহন করল। তার সেই অশান্ত কলেবর শুধু জাহাজকেই দোল দেয়নি, কবির শরীর-মন বেশ কাবু করে ফেলল। প্রথম কয়েকদিন শুধু নিজের কেবিনে নামমাত্র আহার ও নিদ্রার মধ্যে নিজেকে বন্দী করে রাখলেন। পরে নিউইয়র্কে পৌঁছে অজিতকুমারকে এক চিঠিতে এই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি লিখলেন, "সমুদ্র প্রথম কয়দিন যে রকম অশান্ত ছিল এমন আর কখনো আমি দেখিনি। এই দেহ-পাত্রের মধ্যে যে-টুকু জীবন ছিল, তাকে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে তার অর্ধেকটা প্রায় বের করে ফেললে—যেটুকু বাকি ছিল তাতে কেবলমাত্র বেঁচে থাকা চলে, তার অতিরিক্ত আর কোনো কাজই চলে না। অন্ধকার ছোট্ট কেবিনের খাঁচার মধ্যে অনাহারে পড়ে পড়ে কেবল ভাবছিলুম করুণদেব করুণ হবেন কবে। মনে মনে মহাসমুদ্রকে একটা চতুর্দশপদী মানৎ করেছিলুম।"

যাত্রার শেষের দিকে কবি একটু সুস্থ বোধ করলেন, ডেকে এসে আবার বসতে শুরু করলেন। এই সময়েই তাঁর পরিচয় হোল মিঃ ব্রায়ান হোগানের সঙ্গে। তিনি নিউইয়র্ক রাজ্যের রাজধানী অলবেনিতে আইন ব্যবসা করেন। সঙ্গে স্ত্রী। ওরা বলতে গেলে পৃথিবী ভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন, এখন দেশে ফিরছেন।

মিঃ হোগান বললেন, "ভারতবর্ষের অনেক জায়গা আমি ঘুরেছি মিঃ টেগোর। আগ্রার তাজমহল দেখেছি যার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না। কিন্তু ভারতের দারিদ্রও আমাকে ভীষণ ক্লিষ্ট করেছে, বিশেষ

করে এই ভিখিরীর ভীড়। একমাত্র সাংহাইতেই আমি এতো বেশী ভিখিরী দেখেছি।"

রবীন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে বললেন, "ভারতের এতো দারিদ্রের অনেক কারণ আছে, মিঃ হোগান। এককালে ভারত সত্যি-কারের সোনার দেশ ছিল। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলেন, তখন তাঁর সঙ্গের ঐতিহাসিকরা লিখেছেন যে উত্তর ভারতের এক স্বর্ণমণ্ডিত সৌধচূড়ো দেখে তারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর এল তুর্কী ও মোগল শাসন। তখনও ভারতের ধন ভারতেই থাকত। কিন্তু ভারতে ইংরেজ শাসন যখন কায়েম হোল, তখন থেকেই শুরু হোল ভারতে দেশীয় শিল্পের পতন ও বৃটিশ মালের বাজার করায়ত্ত্ব করা। ফলে ভারতে আজ রপ্তানী থেকে আমদানী অনেক গুণ বেশী। আর গ্রামীন শিল্পেরও ভগ্নদশার কারণ তারা ল্যাঙ্কাশায়ার বা ম্যানচেষ্টারের মিলের জিনিষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না। আমাদের জমিদারী ব্যবস্থাতেও চাষের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় না। উৎপাদন ক্রমেই কমে যাচ্ছে। এ সবের ফলে দলে দলে লোক জীবিকার অন্বেষণে গ্রাম থেকে সহরে আসছে, অথচ সহরে চাকরির সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। ফলে শুধু বেকারী ও দারিদ্র্যও দেখা যায় না, দেখা যায় রাস্তায় রাস্তায় ভিখিরীর ভীড়।"

মিঃ হোগান বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি কী সুন্দর গুছিয়ে বললেন! আপনি কী কোন পাবলিক্ স্পিকার ?"

"না না, আমাকে একজন শিক্ষক বলতে পারেন। বাংলাদেশে আমি একটি স্কুল স্থাপন করেছি। আর একটু-আধটু সাহিত্য-সাধনা করে থাকি।"

"সাহিত্যিক আপনি ? কী লেখেন ?

"কবিতাই প্রধানত।"

"ওহ, আপনি কবি ? আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, আপনি যেভাবে

তন্ময় হয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন! আপনি ওয়াল্ট্ হুইট্ম্যানের লেখা পড়েছেন? হুইটম্যানের কবিতা আমার ভীষণ প্রিয়।"

"হ্যাঁ, হুইটম্যানের কবিতা তো আমারও ভীষণ প্রিয়। তাঁর প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' কবিতাটি যে আমি কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই।"

মিসেস হোগান এতক্ষণ পাশে বসে ওদের কথাবার্তা শুনছিলেন, এবার বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি জন ফেনিমোর কুপার-এর 'লেদারস্টকিং' সিরিজ পড়েছেন? ওর এই উপন্যাসগুলি আমার ভীষণ প্রিয়।"

"আমি দু-একটি পড়েছি, সেগুলি আমারও খুব ভাল লেগেছে। বিশেষ করে ন্যাটি বাম্পোর চরিত্রটি।"

"আপনি লেখক,তারপর আমেরিকায়প্রথম যাচ্ছেন, আমেরিকার ফ্রন্টিয়ার ইতিহাস নিশ্চয়ই আপনাকে মুগ্ধ করবে," মিঃ হোগান বললেন। "পূর্ব দিকের এই সমস্ত অঞ্চলই ছিল ইরোকয় ইণ্ডিয়ানদের রাজ্য, বলা হোত 'ইরোকয় নেশন'। তারা অসীম সাহসী ছিল এবং সাদা মানুষদের সঙ্গে যুদ্ধও কম করেনি। কিন্তু ইউরোপীয়ানদের 'আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও উচ্চতর রণকৌশলের কাছে তারা আর দাঁড়াতে পারলো না।"

"এটি আমাদের দেশের পলাশি যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয় যেখানে ইংরেজরা প্রায় একই রকম ভাবে জিতেছিল, যদিও মুসলমানরা আগ্নেয় অস্ত্রের ব্যবহার ভাল করেই জানত," রবীন্দ্রনাথ বললেন।

এমন সময়ে রথী ও প্রতিমা রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে ওদের দিকে এগিয়ে এল। ওদের দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। রবীন্দ্রনাথ হোগান দম্পতির সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর চেয়ার টেনে পুনরায় বসে রথীকে বললেন, "মিঃ হোগান

আমাকে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কথা বলছিলেন। খুবই আশ্চর্য-জনক ইতিহাস। রথী, তুমি তো জন ফেনিমোর কুপারের দু-একটি বই পড়েছো ?"

"হ্যাঁ, ইলিনায় থাকতে আমেরিকান সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু বই পড়তে হয়েছে।"

"ইরোকয় নেশন'-এর পতনের আর একটি কারণ হোল যে তারা সতেরশো ছিয়াত্তর সালের আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে বৃটিশদের সঙ্গে আঁতাত করেছিল, ফলে বৃটিশরা যখন হেরে গিয়ে এদেশ ছেড়ে চলে গেল, তাদের রক্ষার এক প্রধান মিত্রও আর সেখানে রইলোনা। আজ সমস্ত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইণ্ডিয়ানদের জনসংখ্যা দু লাখেরও কম। যখন ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল, তখন তা ছিল বার লাখের ওপর।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে মিঃ হোগানের এই কথা শুনলেন। তিনি জানেন যে এমনি করেই পরাজিত জাতি আস্তে আস্তে নিঃশেষিত হয়, তখন ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকে।

মিঃ হোগান বলতে লাগলেন, "আপনারা নিউইয়র্ক সহরে যাচ্ছেন, তার ইতিহাসও কম আশ্চর্যজনক নয়। যখন ডাচরা ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে চব্বিশ ডলারের মতো গিল্ডার দিয়ে ম্যানহাটন দ্বীপ কিনে নিল, তারপর ইণ্ডিয়ানরা সেই জায়গা কম আক্রমণ করেনি। সেই জন্যই তো তাদের বিরুদ্ধে পাঁচিল তুলে রক্ষা করার চেষ্টা করা হোল যার জন্য সেই অংশকে বলা হয় ওয়াল ষ্ট্রীট।"

রবীন্দ্রনাথ রথীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই ঘটনা আমাদের কলকাতায় মারাঠা ডিচ্-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।"

"ডাচরাই কিন্তু নিউইয়র্ক সহরের ভিত্তি স্থাপন করেছিল," মিঃ হোগান বললেন। "এখনো অনেক জায়গায় পুরোনো ডাচ্ আমলের বাড়ি দেখা যায়। সুযোগ পেলে ম্যানহাটনের ডাইক্ম্যান

ষ্ট্রীটে ওদের সময়কার একটি বাড়ি দেখে আসবেন যা আজ মিউজিয়াম হিসেবে রক্ষা করা হয়েছে। ইংরেজরা অধিকার করার পর কিন্তু নিউইয়র্ক আস্তে আস্তে বৃটিশ সহরে পরিণত হলো।"

"ইতিহাসের কী করুণ পরিহাস," রবীন্দ্রনাথ বললেন, "যে লর্ড কর্নওয়ালিশ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের এক উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সেই লর্ড কর্নওয়ালিশই আমেরিকানদের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে বৃটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন এই দেশে।"

"সেটি খুবই সত্যি কথা," মিঃ হোগান বললেন। "কিন্তু দুঃখের বিষয় যুদ্ধ তখনো শেষ হোলনা, তারপর আরো তিন বছর ধরে ইতঃস্ততভাবে তা চলতে লাগল। কিন্তু সাম্রাজ্য হারিয়ে বৃটিশদের রাগ কোনদিন যায়নি। আঠারশো বার সালের যুদ্ধে বৃটিশ নেভী চেসেপিক্‌বে'র মধ্য দিয়ে আমাদের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি. তে ঢুকে প্রেসিডেণ্টের বাসস্থান হোয়াইট হাউজ অবধি পুড়িয়ে দিয়েছিল।"

"একটা কথা আমি কিন্তু ভাবি মিঃ হোগান। আজ যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ভারতের মতোই বৃটিশ কলোনী হয়ে থাকত তাহলে আমাদের মতো ভারতীয়দের এখানে অনেক বেশী দেখতে পেতেন। আমরা আর দর্শনীয় প্রাণী বলে গণ্য হতুম না।"

রথী বলল, "আমি ও সন্তোষ যখন প্রথম আর্বানায় পড়তে গেলুম, তখন প্রথমে কেউ বিশ্বাসই করেনা যে আমরা সত্যিকারের ইণ্ডিয়া থেকে এসেছি। তারা বলে, "হ্যাট ফার অফ্‌ ল্যাণ্ড অফ্‌ এলিফ্যাণ্টস্‌ অ্যাণ্ড রাজাস্‌, আর ইউ রিয়েলি ফ্রম দেয়ার?"

রথীর কথার ধরনে সবাই হেসে উঠল।

মিসেস হোগান প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এক্সকিউজ মি, আমি কী আপনাকে একটি জিনিষ জিজ্ঞাসা করতে পারি? আমি মিঃ হোগানের সঙ্গে যখন ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম তখনই দেখেছি, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পাইনি। সেটি হোল, আপনার

হাতে এই সাদা বাঙ্গল্ ও মাথায় লাল টিপ্-এর অর্থ কী ?

প্রতিমা লণ্ডনে থাকার সময় এই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে হয়রান হয়ে গেছে, তাই তার উত্তর তৈরীই ছিল। একটু হেসে বলল, "আমরা যে বিবাহিতা এগুলি হোল তারই চিহ্ন। আপনাদের বাঁ হাতের মধ্যমাঙ্গুলে আংটি থাকলে যেমন বোঝা যায় যে আপনারা বিবাহিতা, ভারতে হিন্দু মেয়েরাও কপালে সিঁদুর ও হাতে সাদা শাঁখা পড়ে, শুধু বিবাহের চিহ্ন হিসেবেই নয়, স্বামীর মঙ্গল কামনার জন্যও।"

"প্রাচীন কালে ভারতে নারীরা বিকেল হলেই গা ধুয়ে তাদের দেহ পরিচর্যা করত। তখন অবিবাহিত মেয়েরা কপালে পড়ত কুঙ্কুমের টিপ, আর বিবাহিতরা পড়ত সদ্য তৈরী সিঁদুর," রবীন্দ্রনাথ যোগ করলেন।

"হাউ ইন্টারেষ্টিং," মিসেস হোগান বললেন।

কিন্তু তাদের এই আলোচনার শীঘ্রই ক্ষান্তি দিতে হোল, কারণ সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখুনি ডিনার খাবার ঘণ্টা পড়বে। তাই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা উঠে গেলেন।"

"কী ভদ্র, কী অমায়িক ব্যবহার মিষ্টার ও মিসেস হোগানের," রবীন্দ্রনাথ খানিকটা স্বগতোক্তির মতোই বললেন।

"বাবামশায়, আপনি উঠবেন না, ডিনার খাবার সময় হয়ে এলো," প্রতিমা তাড়া দিল।

"চলো উঠি, আমার শরীরটাও বিশেষ ভাল লাগছে না কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম নিতে হবে।"

পরের দিন সকালে জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ব্যস্ততার ভাব দেখা গেল, কারণ নিউইয়র্ক হারবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এসে যাবে। মালপত্র সব প্যাক করে রথী ও প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়াল। ইতিমধ্যে ডাঃ মৈত্রও তৈরী

হয়ে ওদের সঙ্গে যোগ দিলেন। মিঃ ও মিসেস হোগান দূরে দাঁড়িয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়ে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ ডাঃ মৈত্রর সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

ক্রমে ক্রমে নিউইয়র্কের তীর রেখা দূর থেকে অস্পষ্টভাবে দেখা গেল। সকালের কুয়াশা ততক্ষনে সূর্যের আলোয় দূরীভূত হয়েছে। চারদিকে রোদে ঝলমল করছে। সমুদ্র অনেক শান্ত।

একটু পরেই দূর থেকে স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি দেখা গেল। মিঃ হোগান বলতে গেলে ওদের দলের বেসরকারী ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন। তিনি স্ট্যাচুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন, "মিঃ টেগোর, এই স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টি আমেরিকাবাসীদের জন্য ফ্রান্সের দান। আঠারশ ছিয়াশী সালের অক্টোবর মাসে এই স্ট্যাচু উদ্বোধন করা হয়েছে। ফ্রান্সের স্বাধীনতা যুদ্ধে আমেরিকার সাহায্যের জন্য সেখানকার স্কুলের ছেলেমেয়েরা অবধি পয়সা জমিয়ে এই স্ট্যাচুর প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করেছে। এটি এখন হচ্ছে সারা বিশ্বের কাছে মুক্তির প্রতীক। যখনই ইমিগ্র্যাণ্টরা ইউরোপ থেকে এদেশে আসে, তারাই স্ট্যাচু অফ্ লিবার্টির মশাল বহুদূর থেকে দেখতে পায়। আমার বাবা যখন ছোট অবস্থায় ঠাকুর্দার সঙ্গে এদেশে এসেছিলেন, তখন সেই অল্প বয়েসেও তিনি এই অভিজ্ঞতা কোনদিন ভোলেননি। কতদিন আমাদের কাছে গল্প করেছেন তাঁর সেই অভিজ্ঞতার কাহিনী।

রথী বলল, "আমি অবশ্যি ক্যালিফোর্ণিয়ার দিক থেকে প্রথমবার আমেরিকায় এসেছিলুম, আমার তাই সেই অভিজ্ঞতা হয়নি। কিন্তু নিউইয়র্ক থেকে ইউরোপে যাবার সময় এই স্ট্যাচু দেখেছিলুম, দেশে গিয়ে বাবাকে এই কথা বলেছি।"

ততক্ষণে জাহাজ স্ট্যাচুর প্রায় পাশ দিয়ে যেতে শুরু করেছে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, "সত্যি, মুক্তি ও স্বাধীনতার এমন ভাবগম্ভীর প্রতিমা আর কোথাও দেখিনি।

এ শুধু নতুন অভিবাসীদেরই আহ্বান করছেনা মনে হয় পৃথিবীর সব দেশের নিপীড়িত মানুষদেরই আশার বাণী শোনাচ্ছে।”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই মহৎ ভাবটি মনের মধ্যে বেশিক্ষণ থাকলো না, কারণ জাহাজ জেটিতে থামতেই কাষ্টমস্ অফিসের ঘরে তাদের প্রায় দুঘণ্টা অপেক্ষা করতে হোল। আমেরিকায় আসার অভিপ্রায় এদেশে কতদিন থাকা হবে, সঙ্গে প্রয়োজনীয় অর্থ আছে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হোল। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই সব জিনিষটাই অপ্রীতিকর। ইংলণ্ডে তাঁকে এসব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি। এখন আমেরিকায় ভ্রমনের প্রথমেই তাঁকে এই অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হোল।

সব চাইতে আপত্তিকর হচ্ছে কাষ্টমস্ অফিসারের সেই প্রশ্ন—”
“আর ইউ এ বিগেমিষ্ট।”

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে দুঃখের হাসি হাসলেন। এক স্ত্রীকেই রাখতে পারলেন না, এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনার দুই স্ত্রী আছে কি না।

কবি উত্তর দিলেন “না, আমি বিপত্নীক।”

তারপর সেই অফিসারের আবার এক আপত্তিকর প্রশ্ন—“আর ইউ অ্যান অ্যানার্কিস্ট ?”

কবি শান্তভাবে বললেন, “না।”

কাষ্টমস্ অফিস থেকে বেড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে আর এক অবস্থার মধ্যে পড়তে হোল। স্থানীয় পত্রিকায় এক রিপোর্টার কবির জোব্বা-পরিহিত ও দাড়িআলা চেহারা ও মাথায় সিল্কের পাগড়ী দেখে তাঁকে প্রাচ্যের কোন ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা হিসেবে ঠাওড়ালো। এখন সে তাঁকে প্রশ্ন করতে চায় আমেরিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিমত কী। কিন্তু কবি ততদিনে ইংলণ্ডে থেকে রিপোর্টারদের সাক্ষাতকার পদ্ধতিতে পাশ হয়ে গেছেন, তাই নীরব থেকে তার সেই প্রশ্নকে এড়িয়ে যেতে বিশেষ কষ্ট হোল না।

নিউইয়র্ক সহরে নেমে ওরা ম্যানহ্যাটনের একটি হোটেলে ওঠা

ঠিক করলেন। ডাঃ মৈত্র ততক্ষণে ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বষ্টনের ট্রেন ধরতে গেলেন। রথী ও প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যখন হ্যারল্ড স্কোয়ার হোটেলে এলেন, তখন প্রায় বিকেল হয়ে গেছে। ওরা হোটেলের অফিসে নাম-ধাম লিখেই নিজেদের ঘরে বিশ্রামের জন্য গেলেন। সেদিন রাত্রে রবীন্দ্রনাথ আমেরিকা সম্পর্কে তাঁর প্রথম অভিজ্ঞতা রোদেনস্টাইনকে চিঠি লিখে জানালেনঃ "যদিও এত শীঘ্রি এদেশ সম্পর্কে আমার কোন অভিমত জানানো ঠিক হবেনা, তবু আমি বলছি আমার এদেশ ভাল লাগছে না। অপক্ক ফলের মতো আমেরিকা এখনো তার উপযুক্ত আস্বাদ পায়নি। এর একটি তীব্র ও ঝাঁঝালো স্বাদ আছে।"

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ওরা নিউইয়র্ক সহর দেখতে বেরোলেন। ফিপথ্ অ্যাভেন্যুতে এসে ওরা ঘুরে ঘুরে ছুপাশের দোকান পাট দেখতে লাগলেন। কত বিরাট বিরাট দোকান থরে থরে নানা বিচিত্র জিনিষে সাজানো। দিনটি খুব পরিষ্কার থাকাতে ঘুরে বেড়াতে ওদের কষ্ট হচ্ছিল না।

আমেরিকা যে অত্যন্ত ধনীর দেশ ম্যানহাটন তা যেন সগর্বেই সবাইকে জানিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের মনে হোল নিউইয়র্ক সহরের মোটর গাড়ির ভীড় যেন লণ্ডনের চেয়েও অনেক বেশী। আবার ঠিক লণ্ডনের মতই সবার চলার ব্যস্ততা। সবসময়েই যেন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ চলেছে, ঠিক চলার আনন্দেই চলছেনা।

ফিপথ্ অ্যাভেন্যু দিয়ে দিনের বেলায় চলার সময় রবীন্দ্রনাথ এ-ও লক্ষ্য করলেন অনেক মেয়ে-পুরুষই তাঁর জোব্বা ও পাগড়ী পরিহিত চেহারা দেখে আড়ালে মুখ টিপে হাসছে। অবশ্যি কবি এ-সবে কিছু মনে করেন না। লণ্ডনে থাকতেও অনেকে তাঁর পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে হেসেছে। তাঁর মনে পড়ল আগেরবার লণ্ডনে বেড়ানোর সময় একটি লোক গাড়ি চালাতে চালাতে তাঁর ভারতীয় পোষাক দেখে এতো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে গাড়ি ঘুরে

প্রায় অ্যাক্সিডেন্ট হবার উপক্রম হয়েছিল। এবার অবশ্যি সে অবস্থা হয়নি।

হোটেলে ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ রথীকে বললেন, "মনে হচ্ছে এ সহরের ব্যস্ততা লণ্ডনকেও হার মানায়। কাজের মধ্যে মত্ত থাকা ভাল, কিন্তু অত্যাধিকতা ভাল নয়। কিন্তু এর কিছুটাও যদি আমাদের দেশের লোক পেত তাহলে দেশের কতো উপকার হতো।"

"অথচ তিনশ বছর আগেও এসব জায়গা জলা-ভর্তি জঙ্গল ছিল। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা হাতে তীর-ধনুক ও মাথায় পালক পড়ে ঘুরে বেড়াত," রথী উত্তর দিল।

"ঠিক কলকাতার মতো আর কী! সাবর্ন চৌধুরীদের কাছ থেকে সুতোনুটি আর গবিন্দপুর কিনে নিয়ে কলকাতা সহরের পত্তন করার মতো। জমি কিনে নেওয়ার সময় মনে পড়ল রথী, আট হাজার টাকা দিয়ে সুরুলের যে বাড়ি কিনেছি, সে নিয়ে আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। শান্তিনিকেতনের কাছে এখানে কৃষি ও শিল্পের প্রযুক্তিবিদ্যার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করবো ভেবেছি, যেখানে হাতে-কলমে শিক্ষাই নয়, আমাদের অনেক দেশীয় শিল্পের পুনরুত্থানেরও চেষ্টা করতে হবে। আমার ইচ্ছে যে এখানকার পড়াশুনো শেষ করে দেশে ফিরে গিয়ে তুমি তার ভার নাও।"

"ঠিক আছে বাবামশায়। আমারও শিলাইদহে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করছেনা। বিশেষ করে আপনি যদি বোলপুরেই বেশী থাকেন, তাহলে আপনার দেখা-শুনোর জন্য আপনার বৌমারও ওখানে থাকা উচিত।"

"আমার শরীরের জন্য তোমরা আর সারাক্ষণ ভেবোনা।" রবীন্দ্রনাথ বললেন।

প্রতিমা এতক্ষণ নিজের ঘরে বসে বাড়িতে চিঠি লিখছিল, এখন রথীকে এসে বলল, "বাবামশায়ের জন্য সেই হোমিওপ্যাথিক

ডাঃ নেইস্-এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেনা ?"

"তিনি তো শিকাগোতে থাকেন, আর্বানায় গিয়ে করব।"

"আর্বানায় যাবার ট্রেন কবে ঠিক করেছো ?" রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন।

"পরশু সকালে এখান থেকে ছাড়বে, তারপর পরের দিন শিকাগোতে পরিবর্তন করতে হবে", রথী উত্তর দিল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ইংলণ্ড থেকে এসে আমেরিকায় আর এক রকম খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার। জানিনা অভ্যস্ত হতে পারবো কিনা।"

"আমেরিকায় খাওয়া-দাওয়ার অতো কষ্ট নেই বাবামশাই। অন্তত লণ্ডনের মতো অতো রোষ্ট বিফ আর ইয়র্কশায়ার পুডিং খেতে হবে না।"

"এখানে আমরা এই সব মাছ-মাংস খাই, দেশের লোকে ভাবে আমরা একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি। এরা বোঝেনা শাস্ত্রে যে লিখেছে 'যস্মিন দেশে যদাচারঃ', তার একটা উদ্দেশ্য ছিল। বিবেকানন্দ এদেশে এসে যখন এই সব খেয়েছিলেন, তখন দেশে নিন্দার ঢেউ পৌঁছেছিল। বিবেকানন্দ তার উত্তরে কী বলেছিলেন জানো তো ? লিখেছিলেন, 'এরা যদি আমাকে এক রান্নার পাচক ও দেশের শাস-সব্জি পাঠিয়ে দেয়, তবেই যেন আমার খাওয়ার নিন্দা করে।

প্রতিমা বলল, "সিস্টার নিবেদিতা বাগবাজারে অতো কষ্ট করে থাকতেন, তা ভাবতেও আমার খারাপ লাগত বাবামশায়।"

"এ হচ্ছে তাঁর সাধনারই অঙ্গ বৌমা। আমি অনেক বারই তাঁকে বলেছিলাম শান্তিনিকেতনে এসে আমাদের বালিকা বিদ্যালয়ের ভার নিতে। কিন্তু তিনি শেষদিনও রাজী হননি। তার আগেও বলেছিলুম বেলা ও রেনুকাকে পড়ানোর ভার নিতে। দেশের দরিদ্র সাধারণের সেবা করতে চান তাই দরিদ্রের মতই থাকার ব্রত নিয়েছিলেন। ওঁর কাছে ভারতবাসির ঋণের শেষ নেই।

রথী বলল, "বাবামশায়, মিঃ রোদেনস্টাইন নিউইয়র্কে তুজন ভদ্রলোকের নাম দিয়েছিলেন, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, তাদের কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলুম রথী। ফোন করে দেখতো তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি কিনা।'

কিন্তু হোটেল থেকে ফোন করে তাদের তুজনের সঙ্গেই যোগাযোগ করা গেলনা। মিঃ জন্ জে চ্যাপ্‌ম্যান হচ্ছেন নিউইয়র্কের আইনজীবি, যিনি ততদিনে লেখক হবার জন্য আইন-ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি তখন সহরের বাইরে ছিলেন। আর ডাঃ সাইমন্ ফ্লেক্সনা এর অফিসে ফোন করে জানা গেল যে তিনি তখন ইউরোপের পথে।

সমুদ্রের তাণ্ডব অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ যেন কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। সেদিন রাত্রে শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে লিখলেন: "ডাঙ্গায় নেমে এখনো শরীরটা ক্লান্ত হয়ে আছে। দিন রাত্রি নাড়া খেয়ে প্রাণটা যেন শরীর থেকে আলগা হয়ে নড়নড় করছে। সমুদ্র আমাকে যেন তার ঝুমঝুমি পেয়েছিল—তুহাতে করে ডাইনে বাঁয়ে নাড়া দিয়েছিল, ভেবেছিল কবির পেটের মধ্যে ত্রিপদী চতুস্পদী যা-কিছু আছে সমস্তয় মিলে একটা হট্টগোল বাধিয়ে তুলবে—কিন্তু উল্টে পাল্টে খানা তল্লাসি করে জঠরের মধ্য থেকে ছন্দোবন্দের কোন সন্ধানই যখন পাওয়া গেল না, তখন মহাসমুদ্র আমাকে নিস্কৃতি দিলেন।"

নিউইয়র্কের গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ল সকাল বেলায়। এ ট্রেনটি বাফেলো ঘুরে ডেট্রয়েট্ হয়ে শিকাগো যায়। সেখানে পৌঁছবে পরের দিন ভোরবেলায়।

ট্রেনে উঠে জানালার কাছে বসে রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগল। ট্রেনের সঙ্গে তাঁর ছেলেবেলা থেকেই মিতালী। সেই

অল্পবয়েসে পিতৃদেবের সঙ্গে হিমালয়ে বেড়াতে যাওয়া থেকেই। ভাগ্যে সত্যপ্রসাদ ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল যে ট্রেনের ভেতর পা টিপে টিপে হাঁটতে হয়, পা-হড়কে একটু পড়ে গেলেই ভবলীলা-সাঙ্গ !

সে-সব কথা এখন ভাবলেও হাসি পায়। এ সবই তিনি তাঁর 'আত্মস্মৃতি'-তে লিখেছিলেন। ইয়েট্‌স্‌কে যখন এই বইটির কথা বলেছিলেন, তখন তিনি এটিও 'রেমিনিসন্‌স্‌' নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করতে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সব বাংলা লেখা একসঙ্গে অনুবাদ করা যায় না। সময় হলে পরে একথা ভাবা যাবে।

কবির এসব চিন্তাধারায় বাঁধা পড়ল যখন রথী বলল, "বাবামশায়, এ যাত্রায় সময় হোল না, পরের বার এদিকে এলে নায়েগ্রা ফল্‌স দেখে যাবার চেষ্টা করতে হবে।"

রথী ও প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের উল্টো দিকের দুটি সিটে বসেছিল। কবির পাশে একজন আমেরিকান ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি ওদের বিজাতীয় ভাষায় কথা শুনে বললেন, "এক্‌স্‌কিউজ্‌ মি, আপনারা কোন দেশ থেকে আসছেন ?"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন. "ইণ্ডিয়া থেকে। এখন আমরা ইলিনয়ের আর্বানা সহরে যাচ্ছি।"

ভদ্রলোক হেসে বললেন, "রিয়েলি, আমি যাচ্ছি ইণ্ডিয়ানায়। গ্যারি, ইণ্ডিয়ানা। আমার নাম জো টাফ্‌ট্‌। বাট নো রিলেসন উইথ্‌ প্রেসিডেণ্ট টাফ্‌ট্‌। গ্যারির ষ্টিল মিলে আমি চাকরি করি। পেশায় আমি ইঞ্জিনিয়ার।"

রথী বলল, "আমি যখন প্রথম ইলিনয়ে এসেছিলুম, তখন সবাই ভেবেছিল যে আমি ইণ্ডিয়ানা থেকে আসছি, তাই স্টেশনে আমাকে কেউ রিসিভ্‌ করতে আসেনি।"

রথীর কথায় সবাই হেসে উঠল। মিঃ টাফ্‌ট্‌ বললেন, "আপনারা ইণ্ডিয়ানাতেও বেড়াতে আসবেন। গ্যারির স্টিল মিল ঘুরে দেখতে আপনাদের নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের দেশে জামসেদ্‌জী টাটাও বড় স্টিল মিল খুলেছেন, বিহারে, জানিনা আপনি তাঁর নাম শুনেছেন কিনা।"

"না, কিন্তু ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং এডুকেশনের ব্যবস্থা কেমন?" ভদ্রলোক রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন।

"সামান্যই। পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। অথচ আমাদের দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে শেষ করা যায়না।"

"নিশ্চয়ই। আমেরিকা যে আজ অন্যতম ধনী দেশে পরিণত হয়েছে সে তো ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যাকে সত্যিকার কাজে লাগিয়ে। আপনি যদি ইণ্ডিয়ানার পারডু বিশ্ববিদ্যালয়ে যান, তাহলে দেখবেন সেখানে ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি-বিজ্ঞানে ছাত্রদের ভীড় সবচাইতে বেশী। আমি অবশ্যি একটু বাড়িয়ে বলছি, কারণ এটি হচ্ছে আমার আলমামেটর।" ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন।

কিছুক্ষণ পরে কথাবার্তা থেমে গেল, মিঃ টাফ্‌ট্‌ হাতের কাছে তাঁর বইটি নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। রবীন্দ্রনাথ জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ট্রেন ততক্ষণে নিউইয়র্ক রাজ্য পার হয়ে গেছে। এখন সব প্রেহরী ভূমির সমতল ক্ষেত্র। মাঠের সমস্ত ফসল কাটা হয়ে গেছে, পড়ে আছে রুক্ষ প্রান্তর। এই সব দেখে রবীন্দ্রনাথের বারবার বাংলাদেশের কথা মনে হচ্ছিল। সেই ধান কাটা হয়ে গেলে রিক্ত প্রান্তর যেমন পড়ে থাকে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যে হয়ে এল। একটু পরেই মিঃ টাফ্‌ট্‌ ওর সিট থেকে উঠে চলে গেলেন।

রথী বলল, "বাবামশায়, চলুন আমরাও এখন ডাইনিং কারে ডিনার খেতে যাই।"

বাথরুম থেকে একটু হাত-মুখ ধুয়ে ওরা ওদের কম্পার্টমেণ্ট থেকে

করিডোর দিয়ে অন্য কম্পার্টমেণ্টে চলে গেলেন। ওরা যখন ডাইনিং কারে এসে আসন দখল করলেন, তখন কামরাটি প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে, সবার মৃদু কলগুঞ্জনে স্থানটি মুখর।

প্রত্যেক টেবিলেই সাদা টেবিল ক্লথ পাতা, তার মাঝখানে একটি করে ছোট্ট ফুলদানি। সাদা কোট-পরা ওয়েটার এসে 'গুড্ ইভিনিং' বলে ব্রেড ও বাটারের ঝুড়িটি রেখে ওদের প্রত্যেকের হাতে মেনুকার্ড দিল।

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন কতকগুলি পদের নাম আবার ফরাসী ভাষায় লেখা রয়েছে। রথীর হাতে কার্ডটি দিয়ে তিনি বললেন, "রথী, তুমিই সব অর্ডার দাও। আমেরিকান খাবার তুমিই ভাল বুঝবে।"

রথী একটু হেসে সবার জন্য গ্রেভি-সহ চিকেনের অর্ডার দিল। সাইড্ ডিস্ হিসেবে ম্যাস্ড্ পটেটো ও গ্রিন্ পিজ্। তারপর বলল, "এইটিই আমার সবচেয়ে প্রিয় খাদ্য আমেরিকায়। কতদিন কলেজের কাফেটারিয়ায় এই জিনিস খেয়েছি তার ঠিক নেই। যেদিন ম্যাস্ড্ পটেটোর বদলে সাইড অর্ডার হিসেবে রাইস্ মিলত, সেদিন যেন হাতে স্বর্গ পেতুম।"

প্রতিমা ততক্ষণে রুটিগুলিতে মাখন মাখিয়ে ওদের প্লেটে এগিয়ে দিচ্ছিল। এবার বলল, "আর্বানায় গিয়ে খুব একটা ভাল খাবে বলে মনে কোরনা। মনে রেখো রান্না-বান্নায় আমি এখনও খুব কাঁচা।"

ওর কথা শুনে ওরা দুজনেই হেসে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ও কথা বোলনা বৌমা। লণ্ডনের বোর্ডিং হাউজে থাকতে তোমার রান্না অনেক খুলে গেছে। তুমি যে এত তাড়াতাড়ি রান্না শিখে ফেলবে তা ভাবিনি। তোমার শাশুড়ীও যখন আমাদের সংসারে প্রথম আসেন, তখন কীই বা তাঁর বয়েস, রান্নার কিছুই জানতেন না। কিন্তু কী তাড়াতাড়িই যে সব রান্না শিখে গেলেন তা ভাবতেই পারিনা। আর রান্না করতে ভালও

বাসতেন। শান্তিনিকেতনের আশ্রমের প্রথম দিকে বিকেলের সব রান্না তো তিনি নিজের হাতেই করতেন। কিন্তু কদিনই বা ছিলেন সেখানে, মাত্র ন-দশ মাস হবে।”

ওরা দুজনে চুপ করে রইল। রবীন্দ্রনাথ জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। স্ত্রী আজ প্রায় দশ বছর হোল মারা গেছেন, তবু মনে হয় এই সেদিনও ওদের মধ্যে ছিলেন। আজ ওদের সঙ্গে থাকলে তিনি কত খুসিই না হতেন, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ের প্রসারলাভ দেখে।

ইতিমধ্যে ওয়েটার খাবার পরিবেশন করে গেছে। খেতে খেতে রথী বলল, “আশাকরি অধ্যাপক সিমুর ও মার্গান আমাদের চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছেন। ওরা আর্বানায় আমাদের নিতে না এলে একটু অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে।”

রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে বললেন, “কিছু ভেবোনা। প্রথম কয়েকদিন একটু অসুবিধে হবে ঠিকই, তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বঙ্কিম ও সোমেন তো ওখানে আছে। ওরাও সাহায্য করতে পারবে।”

“কিন্তু ওরা থাকে তো কলেজের ডর্মে। ওদের কাছে আর আমরা উঠতে পারবোনা। তবে আর্বানায় বাড়ি ভাড়া পাওয়ার কোন সমস্যা নেই, দু-এক দিনের মধ্যেই সব ব্যবস্থা করতে পারবো।”

প্রতিমা হঠাৎ বলল, “বাবামশায়, আপনি যে কিছুই খাচ্ছেন না।”

“খিদে নেই বৌমা। শরীরটা ভীষণ ক্লান্ত।”

“তবু আর একটু খান, নইলে শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এই খাওয়া হয়ে গেলেই আমাদের সিটে ফিরে গিয়ে আপনার বিছানা করে দিচ্ছি।”

খাওয়ার পরে ওদের কম্পার্টমেণ্টে গিয়ে দেখে মিঃ টাফ্‌ট

ওপরের বাঙ্কে শুয়ে পড়েছেন। প্রতিমা রবীন্দ্রনাথের জন্য নিচের বাঙ্কে বালিশ ও চাদর দিয়ে বিছানা করে দিতেই তিনি শুয়ে পড়লেন। রথীও ওদের সিটের ওপরের বাঙ্কে আশ্রয় নিল, প্রতিমার জন্য রইল নিচের বাঙ্কটি।

ট্রেন শিকাগোর ইউনিয়ান স্টেশনে পৌঁছল খুব ভোর বেলায়। এখান থেকে আর্বানা যাবার জন্য ট্রেন বদল করতে হবে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের মনে হোল শিকাগো সহর যেন নিউইয়র্কের থেকেও বেশী ঘিঞ্জি। সব বড় বড় বাড়ি গায়ে গায়ে উঠে গেছে, তাদের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের মুখ অবধি দেখা যায় না।

স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে ওরা বসতেই রথী একটি ট্রেতে করে ওদের জন্য চা নিয়ে এল। তারপর দাম চুকিয়ে পোর্টারের সাহায্যে ওরা আর্বানার ট্রেনে উঠে বসলেন।

ট্রেন যখন হুইসেল্ দিয়ে ছাড়ল, সবাই তখন নিজেদের চিন্তায় বিভোর। রথী ও প্রতিমা জানে এই আর্বানাতেই তাদের বেশ কিছুদিন থাকতে হবে, যতদিননা রথীর ডক্টরেট ডিগ্রী শেষ হয়। রবীন্দ্রনাথও ভাবছেন লণ্ডনের হৈ-চৈ-এর পরে এখন আরামে ও অলসতার মধ্যে কিছুদিন কাটানো যাবে, যখন সব রকম লেখা থেকে মুক্তি নিয়ে বসে বসে শুধু নানারকম বই পড়বেন।

॥ পাঁচ ॥

আর্বানা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইলিনয় রাজ্যের অন্তর্গত একটি ছোট সহর, শিকাগো থেকে প্রায় একশ পঞ্চাশ মাইল দূরে। এখানে ইউনিভার্সিটি অফ্ ইলিনয়ই হচ্ছে প্রধান আকর্ষণ, সহরের যা কিছু ক্রিয়াকর্ম এই ইউনিভার্সিটিকে ঘিরেই। আর্বানার লাগোয়া হচ্ছে শ্যাম্পেন সহর, তাই আর্বানা বলতেই লোকে বোঝে আর্বানা-শ্যাম্পেন।

সহরের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ভারী সুন্দর। প্রেহরী ভূমি বলে সবটাই সমতল। চারদিকে মাইলের পর মাইল জুড়ে চলেছে ভুট্টার ক্ষেত। সহরের প্রধান দু-তিনটি রাস্তা তার ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে অন্য সহরের দিকে চলে গেছে।

ট্রেনের জানালা দিয়ে এই সহরের দিকে এক ঝলক তাকিয়েই রবীন্দ্রনাথের ভাল লাগল। সমতল ভূমি বলে তাঁকে আর একবার বাংলাদেশের কথা মনে করিয়ে দিল। সারি সারি সব কাঠের বাড়ি। কোনটা একতলা, কোনটা দোতলা। অধিকাংশই সাদা রংয়ের বাড়ি। সামনে এভারগ্রীনের গাছ। সহরের রাস্তা ঘাট প্রশস্ত ও টানাটানা। সবকিছুই খুব পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথ আর্বানায় এসে পৌঁছলেন সকাল বেলায়। টিপ্ টিপ্ করে তখন বৃষ্টি পড়ছিল।

স্টেশনে ওদের অভ্যর্থনা করতে এসেছিলেন রথীর পুরোনো অধ্যাপক আর্থার সিমুর এবং অধ্যাপক ও মিসেস মার্গান ব্রুক্‌স্। প্রফেসর ব্রুক্‌স্ ছিলেন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ও 'কস্‌মপলিটান ক্লাব'-এর উপদেষ্টা। অধ্যাপক সিমুর ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষার অধ্যাপক এবং বিদেশী ছাত্রদের উপদেষ্টা।

রথীকে এতদিন পরে দেখতে পেয়ে ওরা ভীষণ খুশী। মিসেস ব্রুকস্ আগের বছর যখন ভারতে এসেছিলেন, তখন জোড়াসাঁকোতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখাও করে এসেছিলেন। তিনি চান সবাই তাঁর বাড়িতে উঠুক।

কিন্তু সিমুরদেরও তো রথীর ওপর দাবী আছে। ও যখন আগে ছাত্র হিসেবে এসেছিল তখন অধ্যাপক সিমুরের বাড়িতে প্রায় সারাক্ষণ যাতায়াত করত। রথীকে মিসেস সিমুর নিজের ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন।

তাই ঠিক হোল যতদিন না ওরা বাড়ি ভাড়া করছেন, ততদিন রবীন্দ্রনাথ থাকবেন অধ্যাপক ব্রুক্স্ এর বাড়িতে, আর রথী ও প্রতিমা থাকবে অধ্যাপক সিমুরের বাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ তাই ব্রুক্স্-দের সঙ্গে রওনা দিলেন।

অধ্যাপক ব্রুক্স্-এর বাড়িটি দেখে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভাল লাগল। একেবারে ক্যাম্পাসের কাছে, সাদা রংয়ের ফ্রেমের বাড়ি। বাড়ির সামনে অনেক এভারগ্রীন গাছ লাগান। তাদের পাশে কয়েকটি 'ডাষ্টি মিলার'-এর চারা তখনও টিকে আছে।

বাড়িতে ঢুকেই মিসেস ব্রুক্স্ তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্দিষ্ট গেষ্ট রুমে তাঁকে নিয়ে গেলেন।

লাঞ্চ খেতে খেতে অধ্যাপক ব্রুক্স্ বললেন, "মিঃ টেগোর, এখানে এখন কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র আছে। তাদের মধ্যে যারা বেঙ্গল থেকে এসেছে, তাদের মুখে আপনার কথা শুনেছি যে বাংলাদেশে আপনি অতি বিখ্যাত কবি।"

রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, না, ওরা বাড়িয়ে বলে। বাংলাদেশে অনেক কবি আছেন। আসলে কী জানেন, বাংলার আকাশ-বাতাসই এমন যে গদ্য-প্রকৃতির লোকও প্রকৃতির বিচিত্র শোভা দেখে উন্মনা হয়ে ওঠে।"

"ওয়েল, আশাকরি আপনার কিছু কবিতার ইংরেজী অনুবাদ শোনার সৌভাগ্য আমাদের হবে। শুনলাম আপনি বাংলাদেশে একটি স্কুলও স্থাপন করেছেন।"

"হ্যাঁ বোলপুরে আমাদের যে জমিদারী আছে, তারই একাংশে কয়েক বছর হোল আমি একটি স্কুল স্থাপন করেছি।"

"আপনার কাছে তার বৃত্তান্ত একদিন শুনবো, বিশেষ করে শিক্ষা সম্বন্ধে আপনার অভিমত।"

"নিশ্চয়ই, আমার যতটুকু সাধ্য তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো।"

মিসেস ব্রুক্‌স্ বললেন, "মিঃ টেগোর, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে কলকাতায় যখন ছিলাম, তখন বোলপুরে গিয়ে আপনার স্কুল দেখে আসতে পারিনি।"

"সে দুঃখ আমাদেরও মিসেস ব্রুক্‌স্। আপনার কাছ থেকে আমার ছাত্ররা আমেরিকা সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারতো।"

লাঞ্চ খেয়ে রবীন্দ্রনাথ ওদের বললেন যে তিনি হেঁটে গিয়ে রথীরা কেমন আছে তা দেখে আসবেন। ওরা খুব বেশী দেরী না করতে বললেন। এতবড় পথের ক্লান্তি, তাই শরীরের বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

সিমুরদের বাড়িও ক্যাম্পাসের কাছে। সাতশ নয় নম্বর ওয়েষ্ট নেভাদা স্ট্রীটে। রবীন্দ্রনাথকে তাই বেশীদূর হাঁটতে হোলনা।

তখন বৃষ্টি থেমে গেছে, যদিও আকাশে মেঘ জমে আছে। রবীন্দ্রনাথের গায়ে নরম উলের লম্বা গরম কোট। দু-একজন যারা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বিচিত্রবেশী কবিকে এক ঝলক দেখে নিল।

অধ্যাপক সিমুরের বাড়ি গিয়ে কলিং বেল টিপতেই মিসেস সিমুর দরজা খুলে দিলেন। রবীন্দ্রনাথকে এই প্রথম দেখে তিনি চমকে উঠলেন, যদিও তাঁকে চিনতে ভুল হোলনা। "ওহ, মিঃ

টেগোর, আসুন আসুন, কী সৌভাগ্য আমাদের। আমি মিসেস মেইস্ সিমুর। বসুন এই সোফাটিতে।"

রবীন্দ্রনাথকে দেখেই মিসেস সিমুরের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ল। রথীর কাছে ওর মা ও বাবার একটি মিনে করা ছবি ছিল, আর ছিল রবীন্দ্রনাথের একটি বাস্ট। সেগুলি সব সিমুরদের কাছেই জিম্মা ছিল। যারাই তাদের বাড়িতে আসত, তারাই সেই মূর্ত্তি দেখে চমকে যেত। জিজ্ঞাসা করত, "খ্রাইস্টের এই নতুন মূর্তি কোথা থেকে পেলেন?"

আজ রবীন্দ্রনাথকে দেখে মিসেস সিমুরের সেই কথাটি মনে এল। সেই লম্বা মূর্তি, দীর্ঘ চুল-দাড়ি নিহিত মুখ ও জোব্বা-পরিহিত চেহারা দেখে ঠিক মধ্যবয়সী যিশাস্ খ্রাইস্টের কথা মনে করিয়ে দেয়।

রবীন্দ্রনাথকে সোফায় বসিয়েই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর, আপনার লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি অনুগ্রহ করে ওসবের জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না। মিসেস ব্রুক্স্ এতো পদ করেছিলেন যে এখন ডিনার খাওয়াই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে।"

ততক্ষণে অধ্যাপক সিমুরও এগিয়ে এসেছেন। "মিঃ টেগোর, ওয়েলকাম টু আওয়ার হোম। একটু চা-কফি খাবেন?"

"অনুগ্রহ করে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি ভীষণ কুণ্ঠিত বোধ করছি।"

"না না, ওসব কথা ঘুনাক্ষরেও ভাববেন না," মিসেস সিমুর বললেন। "আপনি জানেন না রথী আমাদের কাছে কত আপনার লোক ছিল। সেই কথাই তো আমি প্রতিমাকে বলছিলাম যে, কতদিন রথী আমাদের বাড়িতে ডিনার খাবার পর বাসন মেজে দিতে সাহায্য করত। ও যখন আমাদের ক্রিষ্টালের গ্লাসগুলো তোয়ালে দিয়ে মুছে দিত, তখন আমার বুক ঢিপঢিপ করত, এই

বুঝি একটা ভাঙ্গল। কিন্তু রথীর হাত খুব সূক্ষ্ম। কোনদিন এতটুকু চিড় খায়নি।"

ততক্ষণে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে প্রতিমাও লিভিং রুমে চলে এসেছে। একটু মুচকি হেসে সে বলল, "তবু যদি ও আপনার কাছ থেকে রান্না করা শিখত!"

ওর কথায় সবাই হেসে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এখন আমাদের বউমার একস্‌পেরিমেণ্টের ফলভোগী হতে হবে।"

মিসেস সিমুর জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি ওকে 'বউমা' বলে সম্বোধন করলেন কেন? কথাটির অর্থ কী?"

"আক্ষরিক ইংরেজী শব্দ হচ্ছে 'ব্রাইড মাদার।' আমাদের বাংলায় ডটার-ইন্-ল'দের ওই নামেই সম্বোধন করা বিধি।"

"কী সুন্দর ব্রাইড মাদার আপনি পেয়েছেন মিঃ টেগোর! এই একটু পরিচয়েই আপনার জনের মতো ব্যবহার করছে। রথী সত্যিই ভাগ্যবান।"

অধ্যাপক সিমুর বললেন, "মিঃ টেগোর, আকাশ তো পরিস্কার হয়ে গেছে। ঠাণ্ডাও বেশী নেই। চলুন আপনাদের ক্যাম্পাসটি ঘুরে দেখাই।"

প্রফেসর সিমুরের সঙ্গে ওরা তিনজনই হেঁটে হেঁটে ক্যাম্পাস দেখতে বেড়িয়ে পড়ল। স্টুডেণ্ট সেণ্টার-এর কাছে আসতেই সেই বাড়িটি দেখিয়ে রথী বলল, "বাবামশায়, এইখানেই আমাদের 'কস্‌মোপলিটান্ ক্লাব'-এর মিটিং বসত, নাচ-গানও হোত। আমি যখন এসেছিলাম তখন বিদেশী ছাত্রদের মেলামেশার কোন সংস্থাই ছিলনা। আমি, সন্তোষ ও আরও কয়েকজনে মিলে এটি চালু করলাম। অধ্যাপক সিমুর ও অধ্যাপক ব্রুক্‌স্ অবশ্যি প্রচুর সাহায্য করেছেন, ওদের উৎসাহ না পেলে এটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হোতনা।"

অধ্যাপক সিমুর বললেন, "রথী, তুমি বিনয় করে বোলছনা যে

তুমিই এই কস্‌মোপলিটান ক্লাব-এর প্রথম সভাপতি ছিলে।”

রথী চুপ করে রইল। বিল্ডিং-এর ভেতরে ঢুকতেই রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, বিরাট হলঘরের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীরা চেয়ারে বা কাউচে বসে গল্প করছে বা বই পড়ছে। কেউবা আবার বিলিয়ার্ড খেলছে। শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের জন্যও এমন একটি ‘কমন রুম’ করার প্রয়োজনীয়তা রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করলেন।

এই স্টুডেন্ট সেণ্টারেই ঘুরতে ঘুরতে সোমেন দেব বর্মন ও বসন্ত রায়ের দেখা মিলল। বসন্ত রায় হচ্ছে শান্তিনিকেতনের তরুণ শিক্ষক ও সোমেন সেখানকার ছাত্র। তুজনেই সেখান থেকে ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়েই এরা তাঁর পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতে এগিয়ে এল। “থাক, থাক,” বলে রবীন্দ্রনাথ বাধা দিলেন।

বসন্ত বলল, “আমরা আগেই খবর পেয়েছি যে আপনারা আজকে আসছেন। ক্লাশ ছিল বলে স্টেশনে যেতে পারিনি। আজ বিকেলেই প্রফেসর সিমুরের বাড়ি গিয়ে আপনাদের খোঁজ নিতাম।”

“বসন্ত, সোমেন, তোমাদের এখানে দেখে আমি যে কী খুশী হয়েছি তা বোঝাতে পারবোনা। কিন্তু তোমরা এত রোগা হয়েছো কেন, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করছোনা?”

“গুরুদেব, আপনি আমাদের সব সময়েই রোগা দেখেন”, সোমেন হেসে বলল। “তবে বোর্ডিং রুমে থাকি, তাই খাওয়া-দাওয়ায় একটু যে কষ্ট না হয় তা বলতে পারিনা।”

“ঠিক আছে। রথী তো আমাদের জন্য বাড়ি ভাড়া করছে। তোমরাও সেখানে এসে ওঠো, যতদিন আমরা এখানে থাকি।”

“তাহলে তো খুব ভাল হয়।” রথী বলল। “আমরাও বাংলায় কথা বলার বেশী লোক পাবো। আমি যখন প্রথমে এসেছিলাম, তখন সন্তোষের দেখা না পাওয়া অবধি বাংলায় কথা বলতে না পেরে মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠতুম।”

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সে অবস্থা আমাদেরও ইংলণ্ডে হয়েছিল রেভারেণ্ড আউটরামের বাড়িতে। সারাক্ষণই ইংরেজীতে কথা বলতে হবে, ওদের সামনে তো বাংলায় বলা শোভন হবেনা। তারপর একদিন এরা বাড়ি ছেড়ে চলে যেতেই আমি আর বৌমা মনের সুখে বাংলা কথা বলতে লাগলুম।"

স্টুডেন্ট সেণ্টার থেকে বেরোতেই অধ্যাপক সিমুর বললেন, "চলুন মিঃ টেগোর, আপনাকে আমার ডিপার্টমেণ্ট দেখাই। সেটি 'রোমান্স বিল্ডিং'-এ।"

সায়েন্স বিল্ডিং-এর কাছে আসতেই ওরা দেখলেন ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়েসের এক দীর্ঘদেহী পুরুষ ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে আসতেই অধ্যাপক সিমুর ওদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ডঃ জেকব্ কুন্জ্, ফিজিক্স-এর অধ্যাপক।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বললেন, "মিঃ টেগোর, আর্থারের মুখে শুনেছি যে আপনি আর্বানায় আসছেন। আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা সত্যিই ভাগ্যবান।"

"এ কথা বলার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, প্রফেসার কুন্জ্। কিন্তু আসলে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে আমি নিজেই ভাগ্যবান, বিশেষ করে অধ্যাপক সিমুর ও ব্রুক্স্-এর আতিথেয়তার জন্য।"

অধ্যাপক সিমুর বললেন, "ডঃ কুন্জ্ সায়েন্সের অধ্যাপক বটে, কিন্তু সাহিত্য সম্পর্কে ভীষণ উৎসাহী।"

"কিছু মনে করবেন না ডঃ কুন্জ্। আমাদের মতো আপনার ইংরেজীতেও অ্যাক্সেণ্ট্ দেখছি, আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?"

"সুইজারল্যাণ্ড থেকে। আমার মাতৃভাষা হচ্ছে জার্মানী।"

"তাই নাকি? আপনি সাইজারলিং-এর কবিতা পড়েছেন? ওঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ আছে।"

"নিশ্চয়ই। তবে জার্মান ভাষায় আমার প্রিয় কবি হচ্ছেন হাইনে।"

"এ সব নিয়ে আপনার সঙ্গে একদিন আলোচনা করার ইচ্ছে রইল," বলে আবার করমর্দন করে ডঃ কুন্‌জের কাছ থেকে ওরা বিদায় নিলেন।

'রোমান্স বিল্ডিং' দেখার পর অধ্যাপক সিমুর বললেন, "এবার আমরা বাড়ি ফিরি, মিঃ টেগোর। আপনি পথশ্রমে ক্লান্ত, প্রথম দিন আর ঘোরাফেরা করা ঠিক হবে না।"

"ঠিক আছে, চলুন" রবীন্দ্রনাথ বললেন।

ততক্ষণে বেলা পড়ে এসেছে। পত্রহীন গাছের ফাঁক দিয়ে পড়ন্ত রৌদ্র সবকিছুতে দীর্ঘ ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। প্রেহরী ভূমির চারদিকে ধূ-ধূ মাঠ দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে হচ্ছিল তিনি যেন হাঁটতে হাঁটতে শান্তিনিকেতনে শীতের দিনে বিকেল বেলায় ছাত্র-শিক্ষকদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। হয়ত কালক্রমে শান্তিনিকেতনেও এমন অনেক বাড়ি-ঘর তৈরী হবে, আস্তে আস্তে হয়ত এক ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস গড়ে উঠবে। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তাঁর এত স্বপ্ন, এত পরিকল্পনা, এ সব কী কোনদিন সফল হবে!

পরের দিনই রথী ওদের থাকার জন্য আর্বানায় একটি বাড়ি ভাড়া করল। বাড়ির ঠিকানা পাঁচশ আট নম্বর ওয়েষ্ট হাই ষ্ট্রীট। অনেক দিন ধরে থাকা হবে বলে এক বছরের জন্য বাড়িটি ভাড়া নেওয়া হোল।

কাঠের ফ্রেমের বাড়ি, তিনটি বেড রুম ও বেশ বড় লিভিং রুম। লিভিং রুমে আবার একটি ফায়ার প্লেসও আছে। বাড়ির সামনে এভারগ্রীন—অর্থাৎ সেই রডোড্রেনডন ও এজেলিয়ার ঝাড় আছে। সামনের জানালা দিয়ে রাস্তার অনেকটা দেখা যায়।

ফায়ার প্লেস দেখে রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগল। অল্প বয়েসে

লণ্ডনে যখন প্রথম এসেছিলেন, তখন ল্যাণ্ডলেডির পার্লারের ফায়ার প্লেসের সামনে সুযোগ পেলেই বসে পড়তেন। ফায়ার প্লেসের আগুনের ফুলকির মধ্য দিয়ে তাঁর কবিচিত্তে অনেক কল্পনা জমে ওঠে।...এরই আলোয় তাঁর অতীত জীবনের রূপ রেখা যেন ভেসে ওঠে।

মিসেস সিমুর গাড়ী করে মালপত্র সহ ওদের এই বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়েছিলেন। রথী সব স্যুটকেসগুলি ভেতরে রেখেই ইউনিভার্সিটির দিকে ছুটলো। তাকে এগ্রিকালচারাল সায়েন্সে পি. এইচ্. ডি. করার জন্য রেজেষ্ট্রী করতে হবে। গতবার যখন এসেছিল, তখন গ্রাজুয়েট হোল ঠিকই, কিন্তু বেশীদিন থেকে থিসিস দিয়ে আর ডক্টরেট হতে পারলোনা। বাবামশায়ের কাছ থেকে চিঠি এল, দেশে ফিরে গিয়ে কৃষি-উন্নয়নের পেছনে লাগতে হবে।

তবে তার এই কৃষি-বিজ্ঞানের শিক্ষা সে শিলাইদহের মাঠে কিছু কিছু প্রয়োগ করেছে। এখান থেকে যে সব বীজ ও সার নিয়ে গিয়েছিল, প্রথম দিকে তা দিয়ে প্রচুর ফসল হয়েছিল।

রথীর হঠাৎ মনে পড়ল কবি ডি. এল. রায়ের কৃষি সম্পর্কে তাকে উপদেশ দেওয়ার ঘটনা। তখন তিনি রংপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, বাবামশায়ের কাছে প্রায়ই আসতেন। ইংলণ্ড থেকে সরকারী বৃত্তি নিয়ে কৃষিবিদ্যা শিখে এসেছিলেন, তাই তাঁর উপদেশ দেবার দাবী ছিল। কিন্তু তাঁর পরামর্শ অনুসারে চাষ করতে গিয়েই সেবার সব চারা মরে গেল। বোধহয় এক মাঠে দুই বিশেষজ্ঞের প্রযুক্তি জ্ঞান একটু অতিরিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ইউনিভার্সিটি থেকে সে বাড়ি ফিরে দেখে প্রতিমা মুরগীর ঝোল রান্না করছে। চারদিক তার গন্ধে আমোদিত।

"এ কী, মুরগী পেলে কোথায়?" রথীর প্রশ্ন।

"আর বলো কেন, সে এক মজার কাণ্ড," প্রতিমা হেসে উত্তর দিল। "তোমার চলে যাবার পরই মিসেস সিমুর আবার গাড়ী

নিয়ে এসে হাজির। বললেন, 'তোমাদের তো গ্রোসারি বিশেষ নেই। চলো আমার সঙ্গে কান্টি স্টোরে, সেখানে সব কিছু পেয়ে যাবে।' তাঁর সঙ্গে গিয়েই তো সব কিনে নিয়ে এলুম। সত্যি বিশ্বাস করবেনা, সবকিছু কী সুন্দরভাবে থরে থরে সাজানো রয়েছে। সব কিছুই কী পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, বাজার বলে মনেই হবেনা। বাবামশায়, আপনিও একদিন গিয়ে দেখে আসবেন।"

"আচ্ছা সে দেখা যাবে। বাজার ছাড়াও অনেক কিছু দেখতে হবে এ দেশের," রবীন্দ্রনাথ হেসে তার জবাব দিলেন।

"ওহ্, তোমার রান্নার এতো গন্ধ বেরিয়েছে! তার ঘ্রাণেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে," রথী বলল।

"বসে পড়োনা। আমার রান্না তো হয়েই গেছে।"

প্রতিমা ইতিমধ্যে ডাইনিং টেবিলে কাঁটা-চামচ প্লেট সব সাজিয়ে রেখেছিল। তাই গরম গরম মাংস-ভাত পরিবেশন করতে কোন দেরী হোল না।

খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সত্যি বৌমা, দিন দিন যেন তোমার রান্নার হাত খুলে যাচ্ছে। কী দুঃখ, তোমাকে আমার রান্নার এক্সপেরিমেণ্ট দেখাতে পারলুমনা। তবু যদি তোমার শাশুড়ির লেখা সেই রেসিপির বইটি থাকত! কিন্তু ওঁর মৃত্যুর পর যে কোথায় হারিয়ে গেল, পরে আর তার কোন খোঁজ পাওয়া গেল না।"

প্রতিমা হেসে বলল, "বাবামশায়, আমি আমার মার কাছ থেকে যে রান্না শিখেছি, তাই দিয়েই আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো।"

"সেই ভালো। যাইহোক, তোমরা দুজনে তো এখানে বেশ কিছুদিন থাকবে। মনে রেখো, এই হবে তোমাদের শান্তির সংসার। ডিগ্রী করার পর রথী দেশে গেলে তো ওর জন্য সহস্র কাজ পড়ে থাকবে, এমন নির্ঝঞ্ঝাটে আর সংসার করতে পারবে না।"

সেই রাতে বিছানায় শুতে এসে প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা,

সত্যি সত্যিই কী আমরা এখানে কিছুদিন থাকবো ?”

রথী উত্তর দিল, “ডক্টরেট প্রোগ্রামে যখন ঢুকেছি, তখন তা শেষ হতে তো বেশ সময় নেবে।”

“কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে বাবামশায় একা একা থাকবেন কী কোরে ? কে ওঁকে দেখবে ?”

“বাবামশায়ের জন্য তুমি অতো ভাবছো কেন ? উনি এখনও খুব শক্ত সামর্থ আছেন। নিজেকে বুড়ো বললেও মোটেই বুড়ো হননি। তাছাড়া শান্তিনিকেতনে আর সবাই তো রয়েছেই।”

“তাহোক, তবু আমরা থাকবোনা, তাতে বাবামশায়ের অনেক অযত্ন হবে। কে ওঁর অসুধ-পত্র দেবে, ঠিক মতো খাচ্ছেন, না লেখার মধ্যেই একেবারে মত্ত হয়ে আছেন তা কে দেখবে ? না না, আমার খুব একটা ভাল লাগছেনা। মনের মধ্যে কি রকম একটা গিল্‌টি ফিলিং হচ্ছে।”

রথী একটু থেমে বলল, “বাট হোয়াট অ্যাবাউট মি ? আমারও তো একটা নিজস্ব জীবন আছে ? আমার কেরিয়ার-এর কী কোন দাম নেই ?”

প্রতিমা চুপ করে রইল। এ প্রশ্নের কোন উত্তর তার জানা নেই। জানে এবার রথী ঠিকই করেছে পি. এইচ. ডি শেষ করে ফিরবে। প্রতিমা তার জন্য স্বামীকে দোষ দিতে পারেনা। আর সেও তো একান্তে স্বামীসঙ্গ পাবে। সবার থেকে দূরে এই হবে ওদের নিজস্ব সংসার।

প্রতিমার ঘর কন্নায় শুধু মিসেস সিমুরই নয়, আরো দুজন ব্যক্তি সাহায্য করতে এগিয়ে এল। তারা হলো বঙ্কিম রায় ও সোমেন দেব বর্মন। কয়েকদিন পরে তারাও সেই বাড়িতে উঠে এসে ওদের সংসারে যোগ দিল। ওপরের এক ঘরে দুজনে থাকে। বাসন ধোয়া, বাজার করা ইত্যাদি কাজে সাহায্য করে। তবে এ ব্যাপারে বঙ্কিমই বেশী কর্মদক্ষ। সোমেন একটু কুঁড়ে। রবীন্দ্রনাথ

বলেন 'আমারই মতো কবি কিনা।' তাই বিশেষ কোন কাজে লাগতে পারে না।

রথী ও প্রতিমাকে পেয়ে ওরা ভীষণ খুশী। শুধু যে এক বাঙালী দম্পতির সঙ্গই পাওয়া যাবে তাই নয়, প্রতিমার হাতের নানারকম রান্না খাবার লোভও এই দুই প্রবাসী বঙ্গ সন্তানের কম নয়।

সোমেন বলল, "প্রফেসর সিমুরের কাছে যখন শুনলাম যে আপনারা আসছেন, তখন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। জানি আপনারা ইউরোপে থাকবেন, কিন্তু সেখান থেকে আবার আর্বানায়?"

রথী উত্তর দিল, "আমাদের এখানে আসার কিছু ঠিক ছিলনা সোমেন। লণ্ডনে থাকতেই ঠিক হোল: তুমি তো জানো আমি থিসিস দিয়ে ডিগ্রীটা শেষ করতে কতটা উৎসুক।"

"সে যাই হোক, আপনারা আসছেন শুনেই বুঝলাম যে কপালগুনে আবার মাছ-ভাত খাওয়া যাবে। এখানে আমাদের স্পেশাল রান্না মানেই হচ্ছে চালে-ডালে খিচুড়ি।"

"আচ্ছা, এখানে কী রুই বা ইলিশ মাছ পাওয়া যায়?" প্রতিমা জিজ্ঞাসা করল।

"না, তবে শুনেছি নিউইয়র্ক সহরে পাওয়া যায়। ওরা তো আমাদের দেশের মতো মাছ রান্না করেনা, ভাপে সেদ্ধ করে লেবুর রস দিয়ে খায় বা ভেজে খায়। আমাদের মতো কারি রান্না করে খেতে জানেনা। কিন্তু আপনি যদি পার্চ মাছ বা ছোট হেরিং মাছ রান্না করেন, তাহলে ঠিক আমাদের দেশের বাচা মাছের মতো খেতে লাগবে।"

বঙ্কিম রায় কম কথা বলে। সে এবার বলল, "আপনি সোমেনের কথা শুনবেন না। ও ভীষণ পেটুক, খালি খাওয়ার কথা চিন্তা করে। দেশের মতো খাওয়ার জন্য যদি হা-হুতাশ করবে, তাহলে

এদেশে এলে কেন ?”

প্রতিমা হেসে বলল, “কিন্তু আমার রান্না কী আর দেশের মতো হবে ? এখানে সবই তো এক্সপেরিমেণ্ট ! কৌটো খুললেই অর্ধেক দিন খেতে হবে।”

রথী বলল,“ জানো সোমেন, আমি যখন ওকে নিয়ে শিলাইদহে ছিলুম, তখন কত রকমভাবে যে পদ্মার ইলিশ রান্না করে খাওয়াতো তার ঠিক নেই। খাওয়ার কথা যাক, ওসব ভাবতেই এখন আমার খিদে পেয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, গতবার আমরা এসে যে ফরেন স্টুডেণ্টস্ অ্যাসোসিয়েশন তৈরী করেছিলুম, তার কী এখনো অস্তিত্ব আছে ?”

“হ্যাঁ, এখন তো তার অনেক মেম্বার, প্রায় প্রতি উইক-এণ্ডেই নাচ-গানের আসর বসে,” সোমেন উত্তর দিল।

“আমরা যখন এসেছিলুম, তখন ফরেন স্টুডেণ্টদের সংখ্যা এত নগণ্য ছিল আমাদেরই একত্র হবার জন্য সেই অ্যাসোসিয়েশন স্টার্ট করতে হোল। তখন কজন লোকে ইণ্ডিয়া সম্বন্ধে জানে তাই আঙ্গুল গুনে বলা যেত। প্রতিমাকে বোধহয় বলেছি আমাদের এখানে আসার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা। এখানে যেদিন এসে পৌঁছনোর কথা, তার খবর আগেই টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলুম। কিন্তু এখানকার পোষ্টাল অফিসের ক্লার্ক ‘ইণ্ডিয়া’ লেখাটা ভুল হয়েছে ভেবে ‘ইণ্ডিয়ানা’ করে দিয়েছিল। ফলে আমরা যখন এসে পৌঁছলুম, তখন আমাকে আর সন্তোষকে রিসিভ্ করতে কেউ আসেনি, কারণ ইণ্ডিয়ানা থেকে যে আসছে তাকে আবার রিসিভ্ করা কী।”

রথীর এই কাহিনী শুনে ওরা খুব হাসল। বঙ্কিম ও সোমেন সেখান থেকে চলে যেতেই রথী প্রতিমাকে জিজ্ঞাসা করল, “বাবামশায় কোথায় ?”

“এই একটু বেড়াতে বেরিয়েছেন। প্রফেসর ব্রুক্স্ এসে গাড়ি

করে ওদের বাড়িতে নিয়ে গেছেন।"

"ছাখো, আমরা যদি এখানে বেশ কিছুদিন থাকি, তাহলে বাবামশায়কে যতদিন পারি আমাদের কাছে রেখে দেবো। তাহলে উনি শুধু বিশ্রামই পাবেন তাই নয়, নতুন লেখার কাজেও মন দিতে পারবেন। লণ্ডনে ওর দিনগুলি কী ব্যস্ততার মধ্যেই গেছে বলো। এখানে তো কেউ ওঁর নাম শোনেনি, তাই কেউ ওকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবেনা।"

"ওঁকে আমাদের কাছে বেশ কিছুদিন রাখা আমারও ইচ্ছে। কিন্তু তুমি তো বাবামশায়কে চেনো। এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে পারেন না। কিছুদিন পরেই ছটফট করতে শুরু করেন। তখন বেড়ানোর জন্য সব সময়েই পা বাড়িয়ে আছেন।"

"সে কী আর আমি জানিনা প্রতিমা! বোলপুর, শিলাইদহ আর জোড়াসাঁকোর মধ্যে কী উনি কম ঘোরাঘুরি করেন!"

রবীন্দ্রনাথের সত্যিই এখন অনেক অবসর। ঠিক করেছেন এই নিভৃত-নিরালায় বসে খালি বই পড়বেন। শান্তিনিকেতনে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে লিখলেন, "কোথাও কোন গোলমাল নেই—আকাশ খোলা, আলো অপর্যাপ্ত, অবকাশ অব্যাহত। মাঝে মাঝে একেবারে ভুলে যাই যে আমেরিকায় এসেছি—ঠিক মনে হয় যেন দেশে আছি।...কিছুদিন সবরকম লেখা থেকে ছুটি নিয়ে আরামে কেবল কষে বই পড়ব।"

ক্রমে ক্রমে ওয়েষ্ট হাই ষ্ট্রীট ঠাকুর পরিবারের ঘরকন্না ভাল রকমই চলতে লাগল। বাড়ির কাজ-কর্মের সুবিধের জন্য ওরা প্রথমে একটি জাপানী ছাত্রকে পার্ট-টাইম নিযুক্ত করেছিল। সে বাড়ি-ঘরদোর পরিস্কার করার চাইতে যুযুৎসু খেলা দেখাতেই বেশী ব্যস্ত। অগত্যা কয়েকদিন পরেই তাকে বিদায় দিতে হোল।

এখন বঙ্কিম ও সোমেনই যা সাহায্য করে। আর প্রতিমার রান্নার এক্সপেরিমেণ্ট চলে। রবীন্দ্রনাথ তাই দেখেন আর মনে

মনে হাসেন। রোদেনস্টাইনকে সেই কথাই লিখলেন, "বৌমা রান্নার কাজ করছে। সোমেন কুঁড়ে, তাই বিশেষ কিছুই করে না। খালি ঘুরে বেড়ায় ও বেসুরো গলায় গান গায়। আমি আর ওদের এই সাংসারিক কাজের মধ্যে যাই না। গেলেই তো বিঘ্ন ঘটাবো।"

রোদেনস্টাইন কয়েকদিন পরেই সে চিঠির উত্তরে লিখলেন: "প্রিয় বন্ধু, আপনার আমেরিকার অভ্যন্তরের যে ছবি আমাদের জন্য এঁকেছেন তা অত্যন্ত সজীব ও উজ্জ্বল। আমি পরিস্কারভাবে শুনতে পাচ্ছি সোমেন্দ্রের উচ্ছসিত গান ও আমাদের প্রিয় প্রতিমার হাড়ি-কড়া নিয়ে ভাজার শব্দ। আর দেখতে পাচ্ছি আপনি কবি সোনালী অক্ষমতা নিয়ে ও জোব্বা পড়ে ধীরভাবে দেখছেন। দেখছেন আর ভাবছেন সবাই প্রকৃতির সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে কী রকমভাবে সব কাজ করছে।..."

কিন্তু আরামে বসে রবীন্দ্রনাথের একনাগাড়ে বই পড়া আর হোল না। কয়েকদিন পরেই এক সকালে রবীন্দ্রনাথের কাছে অধ্যাপক ক্রুক্স্-এর বার্তা এল। তিনি গতকালের লাঞ্চ রবীন্দ্রনাথের সাহচর্য ভীষণভাবে উপভোগ করেছেন। রাত্রিবেলায় ওদের ইউনিটেরিয়ান চার্চের রেভারেণ্ড অ্যালবার্ট ভেইল্-এর সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথকে প্রাচ্যের অবদান সম্পর্কে আগামী রবিবার ওদের সর্বধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচারের জন্য গঠিত 'ইউনিটি ক্লাব'-এ কিছু বলতে অনুরোধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তাঁরা কবির ভাষণ শুনে ধন্য হবেন।

চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ যেন আকাশ থেকে পড়লেন। এইখানে এসে আবার হিন্দুধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা! কোথায় ভেবেছিলেন এই কটা দিন এখানে শান্তিতে কাটাবেন, তা আর এখন হোল না। কতদিন নতুন কবিতা বা গান লেখা হয়নি, যা লণ্ডনের অতো হৈচৈর মধ্যে একেবারেই সম্ভব ছিল না। ভেবেছিলেন এইবার ধীরে-সুস্থে

কিছু বাংলা কবিতা লিখবেন, তা না এখন এই বক্তৃতার জন্য তৈরী হতে হবে।

কিন্তু বক্তৃতা দিতে মনে মনে রবীন্দ্রনাথও কম ইচ্ছুক নন। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন যে পশ্চিম জগতে প্রাচ্য তথা ভারতের বাণী প্রচার করা প্রয়োজন। এই ভোগসর্বস্ব সমাজের কাছে প্রাচীন ভারতের জীবন-ধারণের আদর্শ ব্যাখ্যা করার আবশ্যকতা আছে।

তাই একটু চিন্তা করার পরই বক্তৃতা দেবার জন্য রাজী হয়ে গেলেন।

কিন্তু বক্তৃতা তৈরী করার মশলা পাবেন কোথায়! এখানে তো হাতের কাছে মহর্ষীর টিকা-সমন্বিত সেই উপনিষদখানি নেই। হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, তাঁর সঙ্গে 'ওয়ার্ল্ড ফেইথ্‌স্‌' নামে ইংরেজী বইটি আছে যা তিনি শান্তিনিকেতন থেকেই প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তারই ভিত্তিতে বক্তৃতাটি তৈরী করা যাবে।

সেদিন রাত্রে ডিনার খাবার পর রবীন্দ্রনাথ নিজের ঘরে গিয়ে ভাষণটি তৈরী করার জন্য কাগজ-কলম নিয়ে বসলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর বিষয় হিসেবে বেছে নিলেন 'ওয়ার্ল্ড রিয়ালাইজে-শন' বা 'বিশ্ববোধ'। ব্যক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের মিলন-সাধন।

রোববার বিকেলে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতার জন্য ইউনিটেরিয়ান চার্চে যেতেই রেভারেণ্ড ভেইল্‌ দোরগোড়ায় এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। "মিঃ টেগোর, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পেরে খুবই আনন্দিত হলাম। আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা খুবই উদ্‌গ্রীব।"

রবীন্দ্রনাথ তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানালেন।

অ্যালবার্ট ভেইল্‌ আর্বানার ইউনিটেরিয়ান চার্চের পাদ্রী। তিনি ও তাঁর স্ত্রী এমিলি পাঁচ বছর আগে এই সহরে এসে এই চার্চ স্থাপন করেছেন। বত্রিশ বছর বয়েস, সর্বদাই উৎসাহে ভরপুর, কিন্তু ভীষণ বিনয়ী ও উদার-স্বভাবের মানুষ। একটুও অহমিকাবোধ নেই।

রবীন্দ্রনাথকে ডায়াসে নিয়ে গিয়ে তিনি তাঁর 'ইউনিটি ক্লাব'-এর সভ্য-সভ্যাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করলেন তাঁর বক্তৃতা শুরু করতে।

রবীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতায় বললেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতায় আমরা সবসময়েই লক্ষ্য করি যে সেখানে প্রকৃতিকে শত্রু হিসেবে দেখা হয়েছে, যাকে হয় জয় করতে হবে না হয় নির্মূল করতে হবে। নগর-সভ্যতার এই হচ্ছে রীতি, প্রকৃতির বিরুদ্ধে চারদিকে দেয়াল তুলে তাকে রুখতে হবে। অধিকাংশ লোকই সেখানে মনে করে যে প্রকৃতির মাঝে শুধু মনুষ্যতর প্রাণীরাই বাস করে।

"কিন্তু ভারতীয় সভ্যতায় প্রকৃতিকে কখনোই শত্রু হিসেবে দেখা হয়নি। ভারতবর্ষ প্রকৃতিকে দেখেছে মিত্র হিসেবে। তার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাস করতে চেয়েছে, তাকে সংহার করতে চায়নি।

"কারণ সবই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি। ঈশ্বরের তৈরী এই ভুবনে, তার Universal Nature বা সার্বিক প্রকৃতিতে সবারই স্থান আছে। সৃষ্টির মাঝে আমরা যে ঐক্য দেখতে পাই, তার সবকিছুতে সে এক আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে পায়। এই পৃথিবীর আকাশ, বাতাস, আলো, জল, তার কাছে শুধু জড় পদার্থের সমষ্টি নয়, এ সবই আমাদের জীবনে পূর্ণতার পথে নিয়ে যায়। জল তো শুধু মানুষের হাত-পা ধৌতকরণে সাহায্য করে না, তার হৃদয়কেও শুদ্ধ করে, কারণ এ তার আত্মাকে স্পর্শ করে। পৃথিবীর মাটি শুধু মানুষের দেহকেই ধারণ করে না, তার অন্তরকেও আনন্দ দেয়, কারণ মাটির স্পর্শ শুধু পদার্থের সঙ্গে সংস্পর্শে আসা নয়, এ হচ্ছে জীবন্ত অনুভূতি। মানুষ যখন পৃথিবীর সঙ্গে এই মিতালী বুঝতে পারে না, সে তখন এক জেলখানাতেই আবদ্ধ থাকে যার দেয়ালগুলি তার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাই উপনিষদের 'গায়ত্রী' মন্ত্রে এই অনন্ত ব্রহ্মকেই উপাসনা করা হয়েছে, যেখানে পৃথিবীর সঙ্গে মানুষের আত্মিক বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। যারা এই উপলব্ধি

সম্যকভাবে করেছেন, উপনিষদে তাদের বলা হয়েছে 'যুক্তাত্মা', তারা পৃথিবী ও মানুষের মধ্যেকার ঐক্যসূত্র বুঝতে পেরেছেন, তাই তাদের মন ব্রহ্মে লীন হয়েছে।

"এই ব্রহ্ম কোন অমূর্ত ধারণা নয়। এই ব্রহ্মকে আমরা কী ভুবনে, কী জীবনে সর্বত্রই দর্শন পাই। উপনিষদে বলা হয়েছে, 'আমি সেই দেবতাকে প্রণাম করি যিনি অগ্নি ও বারিতে আছেন, যিনি সমস্ত বিশ্ব পরিকীর্ণ করে আছেন, যিনি শস্য ও চিরবৃক্ষের মধ্যে আছেন।' এই উপলব্ধি থেকেই উপনিষদের ঋষি ডাক দিয়েছেন, 'শোন শোন অমৃতের পুত্ররা, আমি সেই পরম ব্রহ্মকে চিনেছি।' এই ব্রহ্ম কী? উপনিষদ বলেছে, সেই আত্মা তাদের আলো ও প্রাণ যাদের ব্রহ্মবোধ হয়েছে।

"এই ব্রহ্মবোধ জানতে হলে আমাদের এই ঈশ্বরের লীলাকে উপলব্ধি করতে হবে। তার জন্য আমাদের ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জিথা'। তার জন্য আমাদের লোভ সম্বরণ করতে হবে, 'মা গৃধ'। গীতায় যে নিস্পৃহ অবস্থায় কাজ করার কথা বলা হয়েছে, তার অর্থ এই নয় যে পৃথিবী মায়া। তার অর্থ, যে কেবল নিজের ভাল চায় বা নিজের সম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়, সে আর সবাইকে তুচ্ছ করে। তার চোখে বাকী পৃথিবীই মায়া। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে সমস্ত প্রকার ব্যক্তিগত কামনাকে বর্জন করতে হবে।

"তাই বিশ্ববোধ তখনই জাগবে যখন সবার মধ্যেই আমরা বিশ্বকে দেখতে পাবো। শুধু প্রকৃতিতে নয়, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র—সর্বত্রই আমরা যদি এই বিশ্ববোধ দেখি, তাহলে আমাদের জীবন পরিপূর্ণ হবে, জীবনে শান্তি ফিরে আসবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সব কিছুরই অমর জীবন থেকে উদ্ভব হয়েছে, এবং এই জীবন দ্বারাই স্পন্দিত হচ্ছে, কারণ জীবন হচ্ছে বিশাল—'প্রাণ বিরাট'।"

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি শুনছিলেন। বক্তৃতা-অন্তে সুদীর্ঘ করতালি দিয়ে তাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। প্রাচ্যের কোন মানুষের কাছ থেকে এমন ভাষণ তারা কোনদিন শোনেননি। এমন সুন্দর কণ্ঠস্বর, পরিস্কার ইংরেজী উচ্চারণ, বক্তৃতার শান্ত গতিস্রোত, সবই তাদের ভীষণভাবে অভিভূত করেছে।

এদের মধ্যে কয়েকজন শিকাগো শহর থেকে এসেছিলেন। তারা এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজেদের পরিচয় দিয়ে কবিকে অনুরোধ করলেন শিকাগোতে এসে বক্তৃতা দিতে। সব ব্যবস্থা তারাই করবেন। কবিকে শুধু বলতে হবে কবে যাবেন এবং কী বিষয় নিয়ে বলবেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তখন শিকাগো যাবার ইচ্ছে নেই। সবে আর্বানায় গুছিয়ে বসেছেন, এখনই আবার তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে চাননা।

রেভারেণ্ড ভেইলও কবিকে ছাড়তে চাননা। পরের সপ্তাহে আর একটি বিষয় নিয়ে তাঁকে বক্তৃতা করতে অনুরোধ করলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর ভাষণের এতো সাফল্য দেখে সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন।

পরের রোববারে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার বিষয় হোল 'সোল কনসাসনেস' বা 'আত্মবোধ'।

এবার রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমরা দেখেছি যে প্রাচীন ভারতের আদর্শ ছিল সেই ব্রহ্মের মধ্যেই। বাঁচা চলা ও আনন্দলাভ করা। যে ব্রহ্ম হচ্ছে সর্বজ্ঞাত ও সর্বব্যাপ্ত আত্মা এবং যার চেতনার ক্ষেত্র পৃথিবী ব্যাপী প্রসারিত। কিন্তু মানুষের পক্ষে তা লাভ করা কী সম্ভব?

"তার উত্তরে বলতে হবে, হ্যাঁ, কারণ মানুষকে প্রতিদিন তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা ও তার ভাববোঝাকে সামঞ্জস্য সহকারে

বহন করার সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই প্রণালী বা রীতির সন্ধান আসলে ঐক্য বা মিলনের অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের তাই সেই একতার অনুশাসনকে খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু কী করে? উপনিষদ তার উত্তরে বলেছে আত্মানং বিদ্ধি— নিজের আত্মাকে চেন, অর্থাৎ আমাদের সেই বৃহৎ ঐক্যসূত্রটি উপলব্ধি করতে হবে যা প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে। উপনিষদের মতে ঈশ্বরজ্ঞান বা ব্রহ্মবোধের চাবিকাঠিই হচ্ছে এই আত্মবোধ, নিজের আত্মাকে জানা।

"আত্মার সঙ্গে এই পরমাত্মাকে দেখা এ অত্যন্ত একটি সহজ দৃষ্টি, এ একেবারেই যুক্তিতর্কের দৃষ্টি নয়। আমাদের আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায়, তখন সে অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। তিনি যে পরম-আত্মা, আমাদের পরম-আপনি। সেই পরম-আপনিকে যদি আপন করেই না জানা যায় তাহলে আর যেমন কোরেই জানা যাক্ তাঁকে জানাই হোলনা। উপনিষদ বলেছে তিনিই মহান-আপন-রূপে, পরম-এক-রূপে সর্বদাই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছেন। সেই হৃদয়ের যে জ্ঞান, যে জ্ঞান একেবারে সংশয়রহিত অব্যবহিত জ্ঞান, সেই জ্ঞানে যারা এঁকে পেয়ে থাকেন, 'অমৃতাস্তে ভবন্তি' তারাই অমৃত হন।

"এই জ্ঞান পাবার জন্য আমাদের সবাইকে ভালবাসতে হবে। আমরা যাদের মহাত্মা বলি, তাঁরা প্রেমের জন্য, মিলনের জন্য সব দুঃখ-কষ্ট-নির্যাতন সহ্য করেন। প্রেমের যুপকাষ্ঠে জীবনাহূতি দিতেও সঙ্কুচিত হননা। মানুষের জীবনে ভূমার উপলব্ধিকে পূর্ণতর করবার জন্যই পৃথিবীতে মহাপুরুষদের আবির্ভাব। অসীমের মধ্যে সকল দিক দিয়ে মানুষের আত্মোপলব্ধিকে তাঁরা অখণ্ড করে তোলবার পথ সুগম করে দেন, মূল সূত্রকে ধরিয়ে দেন।

"বাংলাদেশের বাউলরা বলে, 'যে তৃষ্ণার্ত সে ঠিকই নদীর ঘাটে

আসবে, এবং সে আসবেই, একা ও সকলে মিলে।' অর্থাৎ মানুষ আপনাকে পাবার জন্য বেরিয়েছে—আপনাকে না পেলে, তার আপনার চেয়ে যিনি বড়ো আপন তাঁকে পাবার জো নেই। উপনিষদ তাই বলেছে এককে চেন, আত্মাকে চেন। এই হচ্ছে অমর সত্ত্বার পথে উত্তীর্ণ হবার সেতু। আপনার মধ্যে এই এককে পেয়ে মানুষ যখন ধীর হয় তখন তার প্রকৃতি শান্ত হয়, সংযত হয়, তখন তার বুঝতে বাকি থাকেনা এই তার এক যাকে খুঁজছে। আপনার ঐক্যের মধ্যে অসীম ঐক্যকে অনুভব করলে তবেই তার সুখের স্পৃহা শান্তিলাভ করে। যিনি একরূপকে বিশ্বজগতে বহুধা করে প্রকাশ করছেন, তাঁকে যে ধীরেরা আত্মস্থ করে দেখেন, তাদেরই সুখ নিত্য, আর-সারত্তর্ণা।

"সেইজন্যই এই প্রার্থনাই মানুষের গভীরতম প্রার্থনা: আবিরাবীর্য এধি। হে আবির, হে প্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার সঙ্গে আমার সমগ্রকে মিলিয়ে দাও। তাহলেই আমার আপনার মধ্যে আমার মিল হবে, সকলের মধ্যে আমার মিল হবে, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ পরিপূর্ণ হবে, জীবনের মধ্যে সমস্ত রুদ্রতা প্রসন্নতায় দীপ্যমান হয়ে উঠবে।"

এবারও রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা উচ্ছ্বসিতভাবে প্রশংসা পেল। রেভারেণ্ড ভেইল্ ভাল জিনিষ দেখলে চিনতে পারেন, তাই বিনে পয়সায় এমন বক্তৃতার আয়োজনের সুযোগ ছাড়তে চাননা। তাই আরো পরপর দুই রোববার কবিকে সেখানে বক্তৃতা দিতে হোল। তাঁর পরবর্তী দুই বিষয় ছিল 'ব্রহ্মবোধ' ও 'কাজের পথ'।

শেষ বক্তৃতার পর রেভারেণ্ড ভেইল্ রবীন্দ্রনাথকে পুত্র ও পুত্রবধূ-সহ তাঁর রেক্টরীতে পরের দিন দুপুরে লাঞ্চের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। রথীর ক্লাশ ছিল, তাই সে আসতে পারলনা, আর প্রতিমাও রথীকে বাদ দিয়ে আসতে চাইল না। একটুখানি পথ, রবীন্দ্রনাথ তাই

হেঁটে হেঁটে একাই চলে এলেন।

রবীন্দ্রনাথ আসতেই রেভারেণ্ড ও মিসেস ভেইল্ সাদরে তাঁকে লিভিং রুমের সোফায় এনে বসালেন। রেভারেণ্ড ভেইল্ বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার বক্তৃতাগুলি যে কিভাবে আমাদের অভিভূত করেছে তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবনা। বিশেষ করে আপনি 'ব্রহ্মবোধ' সম্পর্কে যা বলেছেন তা আমাকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছে। ঈশ্বর সর্বত্রই যে এক, সব ধর্মের মূল কথাই যে মৈত্রী, ভালবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি আকুতি, আপনার এই বক্তৃতায় তা যেন উজ্জ্বলভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে।"

"রেভারেণ্ড ভেইল্, ব্রহ্মবাদের যে বাণী ভারতে রাজা রামমোহন রায় প্রচার করেছেন, আপনাদের ইউনিটেরিয়ান চার্চের মূল কথা তো সেই একই। আমরা যতই বা যেভাবেই ঈশ্বরের ভজনা করি না কেন, তার অন্তর্নিহিত সুরটি ঠিক একই রয়ে যায়।"

"আপনার এই কথা শুনে আমার বাহাউল্লার কথা মনে পড়ছে। আপনি তাঁর ধর্মপ্রচারের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন?"

"খুব বেশী নয়, তবে জানি যে তিনি ইরানে মুসলীম ধর্মের সংস্কার করতে চেয়েছিলেন।"

"তার জন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। বাকি জীবনটাই বাহাউল্লার সিরিয়ায় নির্বাসনের মাঝে কাটাতে হয়েছে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে। তবু সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী তিনি প্রচার করতে বিমুখ হননি। আপনাকে যখন প্রথম দেখেছিলাম, তখন তাঁর ছেলে আবদুল বাহার কথা মনে পড়ছিল। আপনাদের দুজনের চেহারার মধ্যে অনেক মিল আছে, তাই না এমিলি? আবদুল বাহা যখন গতবছর আমেরিকায় এসেছিলেন, তখন আমরা দুজনেই তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম।"

মিসেস ভেইল্ অন্য সোফাটিতে বসে ওদের কথা শুনছিলেন, স্বামীর এই প্রশ্নে মুচকি হেসে সায় দিলেন।

"কিন্তু তিনিও কী তাঁর পিতার ধর্মমত প্রচার করছেন?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন। "তাহলে তো চেহারার সাদৃশ্য ছাড়াও আমার সঙ্গে তাঁর এ ব্যাপারে মিল আছে বলতে হবে। আমিও তো প্রকারান্তরে আমার পিতার ধর্মমত বলতে গেলে প্রচার করছি।"

"তিনিও কী ধর্ম প্রচারক ছিলেন? আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, তাহলে তাঁর সম্পর্কে কিছু বলুন। ধর্মাত্মাদের জীবন-কথা সংগ্রহ করা আমার 'হবি' বলতে পারেন। আমি তাদের জীবনকে বলি 'হিরোইক্ লাইভ্স্'। যদি সম্ভব হয়, তাহলে একদিন এগুলি সংগ্রহ করে বই-আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।"

এই সময় মিসেস ভেইল্ 'এক্সকিউজ মি' বলে ওদের কাছ থেকে উঠে লাঞ্চের আয়োজন করতে রান্নাঘরে গেলেন।

"আমার পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্যিকারের ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন, দেশের সবাই তাঁকে সম্মান করে বলত 'মহর্ষি' বা 'গ্রেট সেজ্'," রবীন্দ্রনাথ বলতে শুরু করলেন। "আমার পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের সমসাময়িক ছিলেন এবং ভারতের রেনেসাঁস আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন মারা যান, তখন আমাদের সংসার ঋণের ভারে জর্জরিত। আমার পিতা শুধু পিতামহেরই নয়, নিজের সম্পত্তির ভাগও বিক্রি করে এই বিপুল ঋণ শোধ করতে চাইলেন। কিন্তু উত্তমর্ণরা তাঁর সেই স্বার্থত্যাগ দেখে মুগ্ধ, তারা তাঁকে সমস্ত ঋণ শোধ করার সময় দিলেন। তিনি আমাদের জমিদারী সংস্কার করে ফলশালী করে তুললেন যে শীঘ্রিই প্রত্যেক উত্তমর্ণকে সুদ শুদ্ধ প্রত্যেক কপর্দক অবধি শোধ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু পিতৃদেবের সম্পত্তিতে মন নয়, তাঁর মন পড়ে ছিল ঈশ্বর চিন্তায়, রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে। একদিন

বাংলাদেশের এক গ্রাম থেকে পালকি করে ফিরছিলেন, হঠাৎ বিরাট মাঠের মাঝখানে এক বিশাল ছাতিম গাছ দেখে তার তলায় বিশ্রামের জন্য নেমে পড়লেন। সেখানে বসে ধ্যানে নিমগ্ন হতেই তাঁর এক আশ্চর্য ঈশ্বরানুভূতি হোল। সর্বত্রই ঈশ্বরের আনন্দলীলা তিনি নতুন কোরে উপলব্ধি করলেন।

তারপর থেকে তিনি প্রায়ই সেখানে বসে ধ্যান করতেন। একবার এক দুর্বৃত্ত পিতার হাতের হীরের আংটি ছিনিয়ে নেবার লোভে তাঁকে আক্রমণ করা মনস্থ করল। সে যেই একাকী পিতৃদেবকে আক্রমণ করতে যাবে, তখন তিনি চোখ খুলে একবার তার দিকে তাকালেন। তাঁর সেই নির্ভিক করুণাপ্লুত দৃষ্টি দেখে সেই ভীষণ দস্যুও বশ হয়ে গেল, হাতের লাঠি ফেলে দিয়ে পিতার চরণে লুটিয়ে পড়ে তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করল। তারপর থেকে সে পিতার দেখাশুনা করার লোকের মধ্যে অন্যতম প্রধান হয়ে উঠল।

আমার পিতা এই জমিটি কিনে একটি বাড়ি তৈরি করে সেখানে থাকতেন ও সেই ছাতিমতলা বাঁধিয়ে সেখানে নিয়মিত ধ্যানে বসতেন। পরে আমি সেখানে গিয়ে এক স্কুল স্থাপন করলুম যার নাম আজ হয়েছে শান্তিনিকেতন।"

"অপূর্ব আপনার পিতার চরিত্র, মিঃ টেগোর। আরও শুনতে ইচ্ছে করে। আপনার নিজের কথাও বলুন।"

"এখন নয় রেভারেণ্ড ভেইল্। আজ আমাকে ক্ষমা করতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখন না উঠলে পুত্র পুত্রবধূ দুজনেই অস্থির হয়ে উঠবে।"

"তাহলে প্রতিশ্রুতি দিন যে আর একদিন এসে আপনার জীবন-কাহিনী শোনাবেন?"

"কেন, রেভারেণ্ড ভেইল্, আপনি কী আমার জীবনীও আপনার সেই 'হিরোইক্ লাইভ্স্' বইয়ে অন্তর্ভুক্ত করতে চান? আমার কিন্তু 'হিরো' হবার কোন যোগ্যতাই নেই। যাই হোক, আমার

জীবন সম্বন্ধে আপনার যখন এতো আগ্রহ, আমি নিশ্চয়ই একদিন এসে সেই সব কথা শোনাবো।”

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে লণ্ডন থেকে রোদেনস্টাইনের চিঠি এল। ভীষণ আনন্দের খবর। অবশেষে ইণ্ডিয়া সোসাইটি থেকে তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজী সংস্করণ পয়লা নভেম্বর বেরিয়েছে। সাতশ পঞ্চাশ কপি ছাপা হয়েছে—পাঁচশ কপি সভ্য-সভ্যাদের জন্য আর বাকী দুশ পঞ্চাশ কপি জনসাধারণের জন্য। ‘টাইমস্ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট’ সাতই নভেম্বরের সংখ্যায় এই বইয়ের রিভিউ করেছে। সেখানে তাঁর বইয়ের সুন্দর প্রশংসা বেরিয়েছে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য খবর হচ্ছে যে রোদেনস্টাইন লণ্ডনের ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর মালিক মিঃ জর্জ ম্যাক্‌মিলনের সঙ্গে কথা বলেছেন, তারা ‘গীতাঞ্জলি’র এই সংস্করণ পুনর্মুদ্রণ করতে রাজী হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি আর যে সব কবিতাগুলি অনুবাদ করে রোদেনস্টাইনের কাছে রেখে গিয়েছিলেন, সেই ‘দি গার্ডেনার’ নামে পাণ্ডুলিপিও ওরা প্রকাশ করতে রাজী হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের সেই চিঠি পড়ে সাময়িকভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

সত্যি, রোদেনস্টাইন ও ইয়েট্‌স্-এর বন্ধুত্বের তুলনা হয় না। রোদেনস্টাইন অনুরোধ না করলে তিনি তাঁর কবিতার ইংরেজী অনুবাদও শুরু করতেন না, এই ‘গীতাঞ্জলি’ও প্রকাশ হোত না। আর ইয়েটস্ যেন তাঁর আর এক সহোদর ভাই, তাঁর জন্মান্তরের বন্ধু, নইলে তাঁর প্রতি এত আকর্ষণ কেন, কবির লেখাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর এতো ব্যগ্রতা কেন! রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটস্-এর এই বন্ধুত্বে অনেকেই ঈর্ষান্বিত হয়েছে, অনেকেই রবীন্দ্রনাথকে আড়ালে বলেছে ‘আইরিশম্যান অফ্ ইণ্ডিয়া’। তারা বলে যে ‘কেল্টিক্ টেম্পারমেণ্ট্ অফ্ টেগোর’-এর জন্যই এই বন্ধুত্ব জন্মেছে।

এরা আসলে ইংলণ্ডে জ্ঞানী-গুণী আইরিশদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে রাজনৈতিক নেতা লয়েড্ জর্জ, নাট্যকার জর্জ বানার্ড শ ও কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েট্স্-এর মতো আইরিশদের।

রবীন্দ্রনাথ এই সুখবরটি রথী ও প্রতিমাকে দেবার জন্য ছটফট করছিলেন, কিন্তু এই দুপুর বেলায় কেউই বাড়ি নেই। রথী ইউনিভার্সিটিতে ক্লাশ করতে গেছে, প্রতিমাও মিসেস সিমুরের বাড়িতে গেছে ইংরেজী পাঠ নিতে। বসন্ত ও সোমেন তো সকাল হলেই বেরিয়ে যায়, ফেরে প্রায় সন্ধ্যে বেলায়।

বিকেল হতেই রথী ও প্রতিমা প্রায় একই সঙ্গে ফিরল। রবীন্দ্রনাথ দুজনকেই এই খবরটি দিলেন। প্রতিমার চা করার অবসরে রথী রোদেনস্টাইনের চিঠিটি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল।

একটু পরেই প্রতিমা চা ও জলখাবার নিয়ে এল। এখানকার লোকের মতো সন্ধ্যে হলেই ওরা রাত্রের খাওয়া খেয়ে নেয়না, বাড়িতে থাকলে ভারতীয়দের মতো একটু রাত করেই খায়। প্রতিমা তাই প্রায় বিকেলেই চা ও জলখাবার তৈরী করে। বিশেষ করে এই ঠাণ্ডার দেশে সকাল-বিকেলে চা খেতে রবীন্দ্রনাথের ভালই লাগে।

চায়ের কাপে এক চুমুক দিয়ে রথী বলল, "এখনও ভাবতে ভয় করে বাবামশায়, যে আপনার নোট বইটি লণ্ডনের টিউবের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলুম। জানিনা 'লষ্ট প্রপার্টি' অফিসে সেই ব্যাগটা ফেরত না পেলে কী হোত!"

"সবই অন্তর্যামীর ইচ্ছা," রবীন্দ্রনাথ বললেন। "নইলে দ্যাখো রোদেনস্টাইনই বা এইগুলি অমন ভাবে ছাপাতে চেষ্টা করবেন কেন, আর ইয়েটস্‌ই বা আমার কবিতার প্রতি অত আগ্রহ দেখাবেন কেন?"

রথী বলল, "শান্তিনিকেতনের সবাইকে এই খবরটি তাড়াতাড়ি দেওয়া দরকার, বিশেষ করে অজিত বাবুকে।"

"হ্যাঁ, আমি ওদের আজ রাত্রেই চিঠি লিখব।"

প্রতিমা বলল, "মীরাদিদি ও ইন্দিরা দিদিকেও আমি লিখে দিচ্ছি। বাবামশায়ের লেখা ইংরেজীতে প্রকাশ হবে, এর জন্যে ওদের আগ্রহ তো কম নয়। দেশের সব শিক্ষিত লোকেরই এ কথা জানা উচিত।"

"তার মানে এখন নিন্দেটা একটু বেশিদূর ছিট্‌বে" রবীন্দ্রনাথ একটু করুণ হাসি হেসে বললেন।

রথী ও প্রতিমা দুজনেই বুঝলো এ বলার পেছনে রবীন্দ্রনাথ কী ইঙ্গিত করছেন। সত্যি, দেশের সাহিত্য-সমাজ এখন যেন দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে—একদল রবীন্দ্রানুরাগী ও আর একদল রবীন্দ্র-বিদ্বেষী। যখন-তখন ভিমরুলের খোঁচা দিতে শেষোক্ত দল সব সময়েই প্রস্তুত।

শুধু বিপিন পাল ও সুরেশ সমাজপতিই নয়, ডি. এল্. রায়ও যেন রবীন্দ্রনাথকে হেনস্তা করার জন্য এখন উঠে পড়ে লেগেছেন। এতদিন তিনি প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেই ক্ষান্ত ছিলেন। এবার রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে 'আনন্দ-বিদায়' নামে এক ব্যঙ্গ নাটক লিখেছেন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে কলকাতার ষ্টার থিয়েটার-এ যখন এটি অভিনীত হোল, তখন দর্শক-সাধারণ এ নাটক প্রসন্ন মনে নেয়নি। বরং তাদের একদল এতই মারমুখী হয়ে উঠেছিল যে সে খবর পেয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় আর ওদিক মাড়াননি।

এ সব খবরই 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় পরে চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন। কবি অন্তরে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু মুখে কারুকে কিছু বলেন নি। এখন অন্যের প্রশংসায় যেমন তিনি উৎফুল্ল হন না, তেমনি লোকের বিরূপ সমালোচনাতেও তিনি আর বিচলিত হন না।

কিন্তু রোদেনস্টাইনকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কবির মন ছটফট করছিল। কয়েকদিন পরে বক্তৃতা তৈরী করা থেকে অবসর পেতেই

তাঁকে চিঠি লিখতে বসলেন ঃ

"প্রিয় বন্ধু,

আপনার চিঠি থেকে আমার বইটির টাইম্‌স্‌ লিটারারি সাপ্লিমেন্ট-এ অনুকূল সমালোচনা হয়েছে জেনে খুশী হয়েছি। আশা করি সেই সংখ্যাটি আমার কাছে পাঠানো হয়েছে যা আমি দু-এক দিনের মধ্যেই দেখব। আমার সুখ অনেক বেশী এই কারণে যে এই ধরনের প্রশংসা আপনার হৃদয়েও অনেক আনন্দ জোগাবে। সত্যি বলতে কী, আমি মনে করি যে আমার বইয়ের এই সাফল্য আপনার নিজেরও সাফল্য। আপনার আশ্বাস বাক্য ছাড়া আমি কল্পনাও করতে পারতুম না যে আমার এই অনুবাদের কোন দাম আছে এবং শেষ অবধি আমার ভয় ছিল যে আপনি এর ভুল মূল্যায়ণের জন্য অভিযুক্ত হবেন এবং আপনি যে কষ্ট স্বীকার করেছেন তা বৃথা হবে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে আপনার মনোনয়ন সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং আপনি এই বন্ধুর জন্য গর্ব প্রকাশ করতে পারেন যা আপনাদের সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারকদের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। অনুগ্রহ করে আমার কথা মিসেস রোদেনস্টাইনকে বলবেন এবং ছেলেমেয়েদের আমার ভালবাসা জানাবেন।

আপনার সতত স্নেহধন্য বন্ধু

রবীন্দ্রনাথ টেগোর"

কিন্তু 'আনন্দ-বিদায়' ছাড়াও দেশ থেকে আর এক খারাপ খবর এসেছে। 'পাঠ-সঞ্চয়' নামে যে বাংলা পাঠ্যপুস্তকটি রবীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার অন্যতম পাঠ্যরূপে মনোনীত হবার জন্য লিখেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তা না-মঞ্জুর করেছেন। এই নিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে জগদানন্দ রায় ক্ষোভের সঙ্গেই চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখলেন, "আমার বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঞ্জুর হল না বলে রাগ করছ

কেন ? যারই বই নামঞ্জুর হত সেই তো বেজার হত এবং মনে করত অবিচার করা হয়েছে। যাঁরা বিচারক তাঁরা ঠিকই বিচার করেছেন বলে ধরে নিলে ফল সমানই থেকে যায় অথচ মনের আক্ষেপটা বেঁচে যায়, সেটা তো কম লাভ নয়। হয়তো আমার বইয়ের ভাষা প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের প্রবেশগম্য নয়··· ।”

কিন্তু মনের ভেতরে এই নামঞ্জুরের সামান্য বেদনা একেবারেই চলে গেল যখন কয়েকদিন পরে তিনি লণ্ডন থেকে ডাকে ‘অথরস্ কপি’ হিসেবে তাঁর ‘গীতাঞ্জলি’র কয়েক কপি পেলেন। সেইদিন বিকেলে সিমুরদের সঙ্গে সাক্ষাত হতেই রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম সই করে তাদের এক কপি দিলেন।

বইটি দেখে ওরা একেবারেই বিস্মিত। কী সুন্দর সাদা কাপড়ের বাঁধাই, তার ওপর রূপোলী অক্ষরে বইয়ের ও কবির নাম লেখা। প্রচ্ছদপটে রোদেনস্টাইনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি জ্বলজ্বল করছে।

অধ্যাপক সিমুর বললেন, “মিঃ টেগোর, এই শনিবারই সন্ধ্যে-বেলায় আমি সবাইকে ডাকছি। এখানে আপনার ভক্তবৃন্দের সংখ্যা তো কম নয়। ওরা এ খবর পেয়ে কী খুশীই না হবে।”

সবার অনুরোধে সেই সভায় রবীন্দ্রনাথকে ‘গীতাঞ্জলি’ থেকে অনেকগুলি কবিতা একে একে পড়তে হোল। শুধু তাই নয়, ‘দি গার্ডেনার’ থেকেও কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। ওদের সব-চেয়ে ভাল লেগেছিল এই পাণ্ডুলিপির “The bird of the morning sings···” কবিতাটি। অধ্যাপক কুন্জ্ তাড়াতাড়ি সেই কবিতাটি লিখে নিলেন।

এই কবিতাটিই যেন ওদের নিজস্ব কবিতা হয়ে উঠল। পরে যখনই ওরা জমায়েত হতেন, কেউ না কেউ উচ্চস্বরে সেই কবিতাটি আবৃত্তি করবেনই।

ওদের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে একদিন ‘পোষ্ট অফিস’ নাটকটি

পড়ে শোনাতে হোল। সেটি শুনেও ওরা মুগ্ধ। সবাই বুঝতে পেরেছে যে গতানুগতিক নাটক নয়, আসলে এ হচ্ছে এক গদ্য-লিরিক। এ নাটকে যেন অমলের চরিত্রের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনের ছেলেবেলার নিঃসঙ্গতার বেদনা রূপক-কাহিনীর মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

খৃষ্টমাসের ছুটি এসে গেল। ইউনিভার্সিটি বন্ধ, তাই রথী ও প্রতিমার মতো বঙ্কিম ও সোমেনও সব সময় বাড়িতে। কিন্তু কবির মন এখন ভীষণ চঞ্চল। সাতই পৌষ আসছে, এইসময়ে তাঁকে ঘিরে শান্তিনিকেতনে কত উৎসব ও মেলার আড়ম্বর। বলতে গেলে তিনিই এই উৎসবের প্রধান পুরোহিত। আজ এই দূর দেশে সেই বন্ধুবান্ধব ও প্রাণাধিক ছাত্রদের কাছ থেকে দূরে বসে আছেন।

যেদিন সেই তিথিটি এল, সেদিন রাত্রে শান্তিনিকেতনে অজিত চক্রবর্তীকে লিখলেন ঃ

"আজ ৭ই পৌষ। কাল সন্ধ্যার সময় যখন একলা আমার শোবার ঘরে আলো জ্বালিয়ে বসলুম আমার বুকের মধ্যে এমন একটা বেদনা বোধ হতে লাগল যে আমি বলতে পারি নে। বেদনা শরীরের কী মনের তা জানি নে কিন্তু আমাকে ব্যাকুল করে তুললে। তখন আমার মনে পড়ল ঠিক সেই সময়ে তোমাদের ভোরের বেলার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। কেননা এখানকার সঙ্গে তোমাদের সময়ের প্রায় বারো ঘণ্টার তফাত। তোমাদের সমস্ত উৎসব আমার হৃদয়কে বোধ হয় আকর্ষণ করেছিল। কাল রাত্রে ঘুম থেকে প্রায় মাঝে মাঝে জেগে উঠে ব্যথা বোধ করেছিলুম। স্বপ্ন দেখলুম, তোমাদের সকাল বেলাকার উৎসব আরম্ভ হয়েছে—আমি যেন এখান থেকে সেখানে গিয়ে পৌঁচেছি—কিন্তু কেউ জানে না। তুমি যখন গান গাচ্ছ, 'জাগো সকলে অমৃতের অধিকারী' আমি মন্দিরের উত্তরের বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে ছায়ার মতো যাচ্ছি—তোমাদের পিছনে গিয়ে বসব—তোমরা কেউ কেউ টের পেয়ে আশ্চর্য হয়ে উঠেছ।

এমনতর সুস্পষ্ট স্বপ্ন আমি অনেক দিন দেখিনি। জেগে উঠে ওই গানটা আমার মনে বাজতে লাগল।

"পাঁচটা বাজল, এখানে আমাদের উৎসবের সময় হল। আমার শোবার ঘরের এক প্রান্তে একখানা কম্বল পেতে আমরা পাঁচজনে বসলুম। তোমাদের ওখানে তখন সন্ধ্যার উৎসব আরম্ভ হয়েছে। ৭ই পৌষের শুভ দিন কি আমাকে একেবারে ঠেলে যেতে পারবে? আমার জীবনের মাঝখানে যে তার আসন পাতা হয়ে গিয়েছে। এই দিনটিকে যে আমি স্পর্শমণির মতো আমাদের আশ্রম থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।"

খৃষ্টমাসের দুদিন আগে রথী ও প্রতিমা শিকাগোতে বেড়াতে গেল। খৃষ্টমাস 'ইভ্'-এর দিন রেভারেণ্ড ভেইল্ রবীন্দ্রনাথকে আহ্বান করলেন 'মিড্‌নাইট্ মাস্'-এ উপস্থিত হতে। ধর্মমূলক ক্যারল্ শুনে রবীন্দ্রনাথের মন অনেক প্রসন্ন হোল। সেই রাত্রেই দেশে হেমলতা দেবীকে লিখলেন: "সত্যের পথে যাবার পক্ষে মানুষই মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড় বাধা, তেমনি মানুষই মানুষের পক্ষে পরম সহায়—সেই মানুষটি আজ জন্মেছিলেন, তিনিই আজ আমাদের জীবনের মধ্যে জন্মগ্রহণ করুন—নিষ্কলঙ্ক শুভ্র শিশুটি হয়ে। একেবারে নিরুপায় পিতার সন্তানটি হয়ে, একেবারে নিঃসম্বল নিষ্কিঞ্চন হয়ে।...আজ সকলে তাঁর দরবারে দাঁড়িয়েছি। সমস্ত মানুষের হয়ে মানুষের বড় ভাই এই প্রার্থনা করে গিয়েছেন—Thy Kingdom come! আমাদের ঋষিরাও সেই কথাই আর এক ভাষণে বলেছিলেন—আবিরাবীর্য এধি।"

কয়েকদিন পরেই অন্তরের তাড়নায় কবি কাগজ কলম নিয়ে কবিতা লিখতে বসলেন—"কে নিবিগো কিনে আমায়, কে নিবিগো কিনে? পসরা মোর হেঁকে হেঁকে বেড়াই রাতে দিনে।..."

আমেরিকায় বসে রবীন্দ্রনাথের সেই হোল প্রথম কবিতা লেখা।

জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে লণ্ডন থেকে এজরা পাউণ্ডের চিঠি এল। কবির কাছে তিনি লিখেছেন যে শিকাগোর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের ডিসেম্বরের সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের ছটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পাউণ্ডের 'Personae' কাব্যগ্রন্থের এক কপিও কবির অভিমতের জন্য পাঠিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ 'Personae'-এর কবিতাগুলি পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এখন তিনি নিঃসন্দেহ যে পাউণ্ড যদি কবিতার পেছনে লেগে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে সে এক অদ্বিতীয় কবিতে পরিণত হবে। রবীন্দ্রনাথের যা স্বভাব, সঙ্গে সঙ্গে তিনি চিঠি লিখে তাঁকে অন্তরের অভিনন্দন জানালেন।

বিকেলে রথী আসতেই কবি তাকে এই শুভ সংবাদ দিলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, শিকাগোর 'পোয়েট্রি'-র অফিসে লিখে দেখনা ওরা যদি কোন কপি পাঠাতে পারে।"

"আমি আজকেই লিখে দিচ্ছি বাবামশায়," রথী উত্তর দিল।

শিকাগোর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের অফিসে বসে তার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরো সেই চিঠি পেয়ে অবাক। ভারতবর্ষের সেই বিখ্যাত কবি এখন এত কাছে আছেন! সঙ্গে সঙ্গে তিনি কবিকে শিকাগো ঘুরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডন থেকে আর্থার ফক্স-স্ট্রাংওয়েস্-এরও একটি চিঠি পেলেন। তিনিই তখন রবীন্দ্রনাথের তরফ থেকে ম্যাক্-মিলান কোম্পানীর সঙ্গে বইয়ের চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছেন। তিনি লিখেছেন, "...আশা করি আপনি অলস হয়ে বসে নেই। আমরা আপনার লেখা আরও অনেক বেশী পড়তে চাই। আপনি এ-ও জানেন যে এখনই হচ্ছে সেই সময় যখন এক সাফল্য পরবর্তী সাফল্যকে অনুসরণ করবে।"

রবীন্দ্রনাথ অবশ্যি চুপ করে বসে নেই। যদিও নতুন কোন কবিতা লিখতে পারেননি, তবু ইতিমধ্যে প্রাক্-'গীতাঞ্জলি' পর্বের

অনেক বাংলা কবিতারই ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। ঠিক করেছেন সেই কাব্যগ্রন্থের নাম দেবেন 'Fruit Gathering'। তাছাড়া 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতারও ইংরেজী অনুবাদ শেষ হয়েছে। কবি এই বইটির ইংরেজী নামকরণ করেছেন 'Crescent Moon'।

কয়েকদিন পরেই রথী হ্যারিয়েট মনরোর চিঠি ও 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের অতিরিক্ত কপি পেয়ে খুব খুশী। রবীন্দ্রনাথকে বলল, "দেখুন বাবামশায়, 'পোয়েট্রির' এডিটর মিস মনরো আমাদের শিকাগো যাবার আমন্ত্রণ করেছেন। লিখেছেন কবে যাবো জানালেই উনি আমাদের থাকার সব ব্যবস্থা করবেন।"

"কিন্তু এখান থেকে এত সহজে যাবার কী উপায় আছে?" কবি উত্তর দিলেন। "সবাই আমার বক্তৃতার জন্য এমন ভাবে ধরেছে! কেন তুমি সেই রিপোর্টারকে বললে যে 'মিঃ টেগোর হ্যাজ এ মেসেজ টু ডেলিভার ইন দিস্ কান্ট্রি?' ভেবেছিলুম কদিন এখানে শান্তিতে থাকবো, তা না সারাক্ষণ এই লেকচার তৈরী করতে সময় চলে যাচ্ছে।"

রথী কবির ভর্ৎসনা শুনে চুপ করে রইল। এটা ঠিকই শিকাগোর সেই রিপোর্টারকে সে এই কথা বলেছে। কিন্তু বাবামশায় কী মনে মনে এ প্রচার চাননি? অনেকবারই তো কথায় কথায় বলেছেন, "ভাখো, পশ্চিম জগতে আমাদের প্রাচ্যের বাণী, উপনিষদের শিক্ষা প্রচার করা উচিত। এই সব দেশ ভোগবাদকে এমন আঁকড়ে ধরেছে যে ত্যাগের কথা, মোক্ষের কথা, এরা অনেক দিন শোনেনি। এরা এখন খৃষ্টের আসল শিক্ষার কথা ভুলতে বসেছে!"

তাইতো রিপোর্টারকে ওই কথা বলেছিল যাতে তিনি এদেশের শিক্ষিত মহলে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পান। তখন কে জানত যে এমনভাবে চারদিক দিয়ে সব বক্তৃতার আমন্ত্রণ আসবে! রথীকেই তো এখন বসে বসে সেই সব বক্তৃতা টাইপ করতে হচ্ছে।

একটু পরে আস্তে আস্তে বলল, "আজ দুপুরে এগ্রিকালচারাল কলেজে ডিন্-এর বাড়িতে লাঞ্চের নেমন্তন্ন।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "মনে আছে। আমি ঠিকই তৈরী হয়ে থাকবো।"

এইখানে খেতে গিয়েই একটি মজার ব্যাপার ঘটল। রবীন্দ্রনাথ ওদের লিভিংরুমে বসে গল্প করছেন, হঠাৎ ছয়-সাত বছরের একটি ছোট ছেলে কোথা থেকে এসে জোব্বা-পড়া ও শ্মশ্রুধারী রবীন্দ্রনাথকে দেখেই ছুটে এসে তাঁর কোলের ওপর বসে পড়ে বলল, "ইউ আর গড, আরন্ট ইউ?"

রবীন্দ্রনাথ আর সকলের সঙ্গেই হেসে উঠলেন। আগে যখন কলকাতার চৌরঙ্গীতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতেন, তখন অনেক সাহেবের বাচ্চারা চেঁচিয়ে উঠত, "মামি, মামি, দ্যাখো, যিশাস খ্রাইষ্ট যাচ্ছে!"

রবীন্দ্রনাথ সেই ছেলেটিকে বললেন, "আমার হাতে চিমটি কাটো। দ্যাখো আমার কী রকম ব্যথা লাগছে। গড হলে কী এরকম ব্যথা লাগত?"

তারপর ছেলেটির সোনালী চুলে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কী?"

"জন্ ফ্যাগী," ছেলেটি উত্তর দিল।

ওর মা এগিয়ে এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, ও ভীষণ চঞ্চল ও কল্পনাপ্রবণ। পড়াশুনোয় একদম মন নেই।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আমি ওকে পড়াশুনোর কথা বলতে পারি না। ওর বয়েসে পড়াশুনায় আমার একদম মন ছিল না। সেই জন্যই তো মধ্য বয়েসে ভারতে মনের মত স্কুল স্থাপন করেছি যেখানে বাধাধরা পড়ার গণ্ডির মধ্যে কারুকে আটক থাকতে হবে না।"

মিসেস ব্রুক্স্ও সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। তিনি

বললেন, "মিঃ টেগোর, কী দুঃখ যে কলকাতায় গেলাম কিন্তু বোলপুরে আপনার সেই স্কুল দেখার সৌভাগ্য আমার হোল না। অনুগ্রহ করে আপনি সেই স্কুলের উদ্দেশ্য ও শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে একদিন আমাদের কিছু বলবেন। আমরা সবাই সে সম্পর্কে কিছু জানার জন্য উদ্‌গ্রীব।"

"নিশ্চয়ই। শিকাগো থেকে ঘুরে আসি, তারপর একদিন আপনাদের সঙ্গে এ নিয়ে অনেক আলোচনা করবো," রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় বললেন।

প্রতিমা ইতিমধ্যে মনে মনে রথীর অস্থিরতা বুঝতে পারছিল। পড়াশুনোর থেকে তার এখন সময় বেশী যাচ্ছে বাবামশায়ের এইসব বক্তৃতা টাইপ করায়। একটি বক্তৃতার খসড়া এতবার টাইপ করতে হচ্ছে যে তার জন্য ওরা একটি টাইপরাইটারও কিনে ফেলেছে।

কিন্তু ওদের দুজনের মধ্যে যখন এ প্রসঙ্গ উঠল তখন কোন বিসংবাদই সৃষ্টি হোল না।

রথীই সে রাত্রে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করল, "শোন, এখন যেভাবে দিন যাচ্ছে তাতে পড়াশুনোয় বিশেষ মন বসাতে পারছি না, আবার বাবামশায়েরও আমাকে ভীষণ প্রয়োজন। ভাবছি বাবামশায়ের সঙ্গেই আমরা ইউরোপ হয়ে দেশে ফিরে যাই। ডক্টরেট করে আর কী-ই বা হবে! সে তো একটা অতিরিক্ত কাগজের ডিগ্রী ছাড়া আর কিছু নয়। আমার আসল কর্মজীবন হবে শান্তিনিকেতনে, তার উন্নতির পেছনে লেগে থাকায়।"

প্রতিমা শুনে বলল, "আমিও একথাটি কদিন ধরে ভাবছিলুম। বাবামশায়ের তোমাকে এখন ভীষণ দরকার। দিন দিন যেরকম তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন, তাতে তুমি যদি এখন দু-বছর এখানে থাকো তাহলে উনি অনেক অসহায়বোধ করবেন। তুমি এখন ওঁর একমাত্র জীবিত পুত্র। এমন অনেক ব্যাপার আছে যা

ছেলেকে ছাড়া অন্য কারুর হাতে সে ভার দেওয়া যায়না। তারপর বাবামশায়ের শরীর ভাল যাচ্ছেনা। ওঁকে আমি অবশ্য বলিনি, কিন্তু হোমিওপ্যাথিতে কোন কাজ হবে বলে মনে হয়না।”

রথী একটু চুপ করে থেকে বলল, “সে আমি বুঝি। বাবা-মশায় মুখে কিছু বলতে পারছেন না, কিন্তু মনে মনে ভীষণ দুশ্চিন্তায় ভুগছেন বুঝতে পারছি। উনি চান যে আমরা ওঁর সঙ্গে দেশে ফিরে যাই, কিন্তু আমার পড়াশুনোর কথা ভেবে মুখে কিছু বলছেন না। সত্যি বলতে কী, আমিও দেশে ফিরে যেতে চাই। বেশ একটু হোম সিক্ হয়ে পড়েছি।”

“ও কথা আমাকে আর বোলনা। দেশে ফেরার জন্য আমার মন ভীষণ ছট্‌ফট্ করছে। কতদিন রাত্রে যে এলোমেলো স্বপ্ন দেখি তার ঠিক নেই। সেই শিলাইদহে কুঠিবাড়ি, জোড়াসাঁকোয় আমাদের ঘর, শান্তিনিকেতন, সব জায়গায় যেন আমরা একসঙ্গে ফিরে গিয়েছি। আমি তোমাকে আগে বলিনি, নইলে তুমি আমার জন্য উতলা হবে। এই শীতের কনকনানি আর সহ্য হচ্ছেনা, দেশের খোলা-মেলা হাওয়ার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছি।”

পরের দিন সকাল বেলায় বঙ্কিম ও সোমেন ব্রেকফাষ্ট খেয়ে চলে যেতেই রথী প্রতিমার সামনে ওর সিদ্ধান্তের কথা জানালো। রবীন্দ্রনাথ সাধারনত অন্তরের মনোভাব বাইরে উচ্ছ্বসিতভাবে প্রকাশ করেননা, কিন্তু রথীর কথায় তিনিও একটু বিচলিত বোধ করলেন।

একটু চুপ করে থেকে কবি বললেন, “রথী তুমি আমার পুত্র, ইউরোপীয় কায়দায় তোমাকে ধন্যবাদ জানাতে পারিনা। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমার সর্বদা মঙ্গল করেন। তুমি বুঝতেই পেরেছো আমি কী রকম তোমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছি। জানি তুমি ডক্টরেট্ করতে চেয়েছিলে, কিন্তু শান্তি-নিকেতনের কাজে তোমাকে যে আমার এখনই দরকার। শিলাইদহে

তোমাকে আর ফিরতে হবেনা, এখন তুমি বোলপুরেই থাকবে।”

“কিন্তু স্কুলের কাজে আমি আর কতটুকু সাহায্য করতে পারবো বাবামশায়,” রথী উত্তর দিল। “এখন ওখানে আপনার অনেক উপযুক্ত সহায়ক আছেন।”

“সে কথাটি ঠিকই, কিন্তু শান্তিনিকেতনকে ঘিরে আমার অনেক স্বপ্ন গড়ে উঠেছে যে সব কাজে তোমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন হবে। আমি ওখানে একটি বিজ্ঞানের গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করব, যার ভার তোমার ওপর অর্পন করতে চাই।”

“যদি ল্যাবরেটরি তৈরী হয় তাহলে সেটি আমার মনের মতো কাজ হবে বাবামশায়। আমার খুব ইচ্ছে এখানে যে সব সায়েন্টিফিক্ এক্সপেরিমেন্ট শিখেছি, দেশে ফিরে গিয়ে তার প্রয়োগ করা, যাতে দেশের লোকের এগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপকারে লাগতে পারে।”

“সেইজন্য হয়ত আমাদের শান্তিনিকেতন ছাড়া আর একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান তৈরী করতে হবে যেখানে প্রযুক্তিবিদ্যার ওপরই জোর দেওয়া হবে। জগদানন্দের সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি চিঠি লিখেছি। শুধু ভয়, শান্তিনিকেতনের যা আর্থিক অবস্থা তাতে এ সব শুধু স্বপ্নই না থেকে যায়। এ দেশে যদি এইসব লেকচার দিয়ে ‘ফি’ হিসেবে কিছু টাকা সংগ্রহ করা যেত তাহলে শান্তিনিকেতনের কাজে বড়ই সহায়ক হোত।”

রথী ও প্রতিমা চুপ করে রইল। শান্তিনিকেতনের উন্নতিই এখন বাবামশায়ের ধ্যান-জ্ঞান হয়েছে। তার জন্য তাঁর ত্যাগ-স্বীকারের যেন শেষ নেই। শরীর-মন বিদ্যা-বুদ্ধি সবই যেন এর বেদীমূলে সমর্পন করেছেন। দেখা যাক, এত সাধনার ফল ব্যর্থ হতে পারে না, হয়ত ভগবান একদিন মুখ তুলে তাকাবেন।

এই জানুয়ারী মাসেরই মাঝামাঝি শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বাঙালী সাংবাদিক বসন্ত কুমার রায়। মিঃ রায় উইস্‌কন্‌সিন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডিসন্‌ ক্যাম্পাস থেকে মাষ্টারস্‌ ডিগ্রী করে আমেরিকার নানা কাগজ পত্রে লেখেন ও ইউনিভার্সিটি অফ্‌ উইস্‌কন্‌সিন্‌-এর এক্সটেনশন্‌ লেকচারার হিসেবেও নিযুক্ত আছেন।

তিনি রবীন্দ্রনাথের আর্বানায় আসার খবর শিকাগোর সংবাদ-পত্রেই দেখতে পেয়েছিলেন। শিকাগো 'ট্রিবিউন্‌' পত্রিকা সম্পাদকীয় লিখে কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। বাঙালী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গল্প-প্রবন্ধের সঙ্গে অত্যন্ত সুপরিচিত, এখন এতো কাছে আছেন বলে নিজেই ট্রেন ধরে চলে এলেন।

তিনি যখন রবীন্দ্রনাথের হাই ষ্ট্রীটের বাড়িতে এসে পৌঁছলেন, তখন দুপুর হয়ে গেছে, রথী ও প্রতিমা কেউই বাড়িতে নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন একা, দেশের আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে চিঠি লিখছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি যখন আসন গ্রহণ করলেন, এই সুদূর বিদেশে এক বাঙালীকে দেখে কবি তখন খুব খুশী হলেন। বিশেষ করে যখন শুনলেন যে মিঃ রায় এখানে স্থায়ীভাবে থেকে ভারতীয় বিষয়ে প্রবন্ধ লিখছেন।

সোফায় আসন গ্রহণ করে বসন্ত রায় বললেন, "শিকাগোর কাগজে যখন দেখলাম যে আপনি আর্বানায় এসেছেন, তখন ভাবলাম যে আপনার সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ-পরিচয় করে যাই।"

"খুব ভাল কাজ করেছেন, আপনাকে দেখে খুব খুশী হয়েছি। এখানে তো বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। যে দু-একজন ছাত্র আছে তারা নিজেদের পড়াশুনো নিয়েই ব্যস্ত থাকে।"

"দেশে থাকতে আপনার কবিতা পড়তে যে কী ভাল লাগত তা বোঝাতে পারবোনা রবিবাবু। আপনার কতো কবিতা যে মুখস্ত করেছিলাম তার ঠিক নেই। এখন অবশ্যি প্রায় সবই ভুলতে বসেছি।"

'রবিবাবু' সম্বোধন শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু চমকে উঠলেন। লণ্ডন ছাড়ার পর এই প্রথম আবার এই সম্বোধন শুনতে পেলেন।

বসন্ত রায় বলতে লাগলেন, "শুধু আপনার সঙ্গে পরিচয়ই নয়, আমার আসার আরও একটি কারণ আছে। সেটি হচ্ছে আপনাকে বলা যে আমি ঠিক করেছি যে এখানকার পত্র-পত্রিকায় আপনাকে নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখবো।"

"সে ক্ষেত্রে আপনি কলমেরই অপব্যয় করবেন," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন।

"না না, কী যে বলেন! বাংলা তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি আপনি। আপনাকে এ দেশে পরিচয় করিয়ে দেওয়া আমি পরম কর্তব্য মনে করি।"

নিজের প্রশংসা শুনলে রবীন্দ্রনাথ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠেন, কোন কথা বলতে পারেন না! এ ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটলোনা।

বসন্ত রায় এ-কথাটি বললেন বটে, কিন্তু মনে মনে তিনিও জানেন যে ভারতীয় তো দূরস্থান, অনেক শিক্ষিত বাঙালীই একথা স্বীকার করে না। শিকাগোতে কয়েকজন বাঙালী থাকে, তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। একজন বলল, "রবীন্দ্রনাথের থেকে আরো অনেক বাঙালী কবি আছেন যাদের স্থান তাঁর উঁচুতে। কেন, নবীন সেন, এমন কী ডি. এল. রায় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের থেকে বড় কবি। আর রবীন্দ্রনাথ এখানে যে সব বক্তৃতা দিচ্ছেন, তার মূল কথা তো উপনিষদেই আছে, নতুন কিছুতো তিনি বলছেন না।"

বসন্ত রায় বললেন, "আপনি এখন আর্বানায় আছেন রবিবাবু। কিন্তু আর্বানায় থাকলে তো এদেশের জ্ঞানী-গুণী মহলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন না। এ তো আর লণ্ডন, প্যারিস বা বার্লিন নয় যে সে সব দেশের বিদগ্ধজনরা এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছেন। এ দেশ এতো বিশাল যে এখানকার সব জায়গায়ই তাঁরা

বাস করছেন। নিউইয়র্ক, শিকাগো, বস্টন বলুন, আবার লস্ এঞ্জেলেস বা সান্‌ফ্রান্সিসকো বলুন, এরা সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন।"

"সেটা ঠিক, তবে আমি সাত-আট দিনের মধ্যে শিকাগোতে যাচ্ছি," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "সেখানে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার আমন্ত্রণ এসেছে। তবে আর্বানায় সাধারণ মানুষদের জীবনযাত্রা যতটুকু দেখেছি তার তুলনা হয় না। আমার অবাক লাগে যে এরা কর্মের উৎকর্ষতায় এতো উন্নত হোল কী করে! ব্যবসায়ী হিসেবে নিপুণ ব্যবসায়ী, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে সেরা ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী হিসেবে সেরা বিজ্ঞানী—মনে হয় ভাগ্যদেবী দু-হাত দিয়ে এদের ওপর কৃপাবর্ষণ করেছেন।"

"চাষের দিকেই দেখুন না। এগ্রিকালচার-এ এদের তুলনা পাওয়া ভার।"

"সে কথা সত্যি, কিন্তু তার ফলে 'কালচার' এদের জীবনে একটু থিতিয়ে পড়েছে," রবীন্দ্রনাথ একটু মুচকি হেসে জবাব দিলেন।

বসন্ত রায় বললেন, "সে যাই হোক, রবিবাবু, এদেশের লোকের পক্ষে আপনার লেখার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে আপনার লেখা ইংরেজীতে আরো অনুবাদ করা উচিত। তাহলেই লোকে সত্যিকারে আপনার লেখাকে জানতে পারবে।"

"শুনে খুশী হবেন বসন্তবাবু যে আমি 'গীতাঞ্জলি'র পরেও আরও কিছু কবিতা ইতিমধ্যে ইংরেজীতে তর্জমা করেছি। লণ্ডন থেকে 'দি গার্ডেনার' নামে তা প্রকাশ করার চেষ্টা হচ্ছে।"

"আপনাকে আমি বলছি রবিবাবু, আপনার প্রধান কবিতাগুলি যদি ইংরেজীতে অনুবাদ করা হয়, তাহলে আপনার খ্যাতি শুধু পৃথিবীব্যাপীই ছড়িয়ে পড়বেনা, সাহিত্যে আপনি নোবেল পুরস্কার অবধি পেয়ে যেতে পারেন।"

"নোবেল পুরস্কার?" রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। "কিন্তু

এশিয়াবাসীরা কী নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনীত হতে পারে ?”

“নিশ্চয়ই। নোবেল পুরস্কারে তো কোন রেস্, ক্রীড্ বা রিলিজিয়ানের বাধা নেই।”

“তা হয়ত নেই, কিন্তু কজন এশিয়াবাসী পেয়েছেন বলুন। যখন দেখি যে জগদীশচন্দ্র বসুর মতো স্বনামধন্য বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পাননা, তখন এ কথাটি মনের মধ্যে জেগে ওঠে ঠিকই।”

“সেটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই, তবু বলছি রবিবাবু, আপনি আপনার কবিতার ইংরেজীতে অনুবাদ চালিয়ে যান। মনে রাখবেন, আপনার গৌরবে শুধু বাংলা নয়, ভারত তথা এশিয়া-বাসীরাই গৌরবান্বিত হবে।”

এমন সময়ে প্রতিমা একটি কাগজের ব্যাগে কিছু খাবারের কৌটো ও আনাজ নিয়ে ফিরল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একজন অপরিচিত ভদ্রলোক বাংলাভাষায় কথা বলছে দেখে চমকে গেল।

“বৌমা এস। তোমার সঙ্গে মিঃ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিই। বসন্তবাবু সাংবাদিক ও লেক্চারার, এখানে প্রায় স্থায়ীভাবে আছেন। শিকাগো থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?”

প্রতিমা আনাজগুলি রান্নাঘরের টেবিলে নামিয়ে রেখে বসন্ত রায়কে প্রতিনমস্কার করে রবীন্দ্রনাথকে উত্তর দিল, “এই মিসেস সিমুরের সঙ্গে একটু ওপেন মার্কেটে গিয়েছিলুম বাবামশায়। মিঃ রায়, আপনি তো অনেক দূর থেকে এসেছেন, আপনাকে একটু চা ও জলখাবার করে দিই ?”

“আমাকে শুধু চা দিন মিসেস ঠাকুর। আবার জলখাবারের আয়োজনের মধ্যে যাবেন না।”

“তা কী হয়, আপনি শিকাগো থেকে এসেছেন। আপনারা কথা বলুন, আমার তৈরী করতে বেশী সময় লাগবেনা।”

একটু পরে রথী কলেজ থেকে ক্লাশ করে হাজির। বসন্ত রায়কে

দেখে সে-ও বিস্মিত। রবীন্দ্রনাথ তার সঙ্গে যথারীতি মিঃ রায়ের পরিচয় করিয়ে দিলেন।

বসন্ত রায় বললেন, "আমি তো রবিবাবুকে বলছিলাম যে আপনার কবিতার যদি যথার্থ ইংরেজী অনুবাদ হয়, তাহলে পৃথিবীময় আপনার নাম ছড়িয়ে যাবে। একদিন না একদিন আপনি ঠিক নোবেল পুরস্কার পাবেন।"

"আপনি দেখছি আমাকে নোবেল পুরস্কার না পাইয়ে ছাড়বেন না," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন। "ঠিক আছে, নোবেল পুরস্কার যদি কোনদিন পাই, তাহলে সেই টাকা দিয়ে বোলপুরে শিল্প উন্নয়ণের বিভাগ খুলবো। কিন্তু আজ বিকেলে আমরা যেন একটু বেশী কাল্পনিক হয়ে পড়ছি, তাই না ?"

রবীন্দ্রনাথের কথায় ওরা দুজনেই হেসে উঠল।

রথী জিজ্ঞাসা করল, "বাবামশায়, আপনি ওঁকে বলেছেন যে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী সংস্করণ লণ্ডন থেকে বেরিয়েছে ?"

রবীন্দ্রনাথ ঘাড় নেড়ে জানালেন, হ্যাঁ।

বসন্ত রায় বললেন, "কিন্তু শুধু একটি মাত্র বইতে তো হবে না, ইংরেজীতে বেশ কয়েকটি বই প্রকাশ করতে হবে। আমার সংকল্প আছে রবিবাবুর লেখাগুলি নিয়ে এখানকার লিটারারী ম্যাগাজিনে প্রবন্ধ লেখা।"

এমন সময় প্রতিমা লুচি, আলু ও বেগুন ভাজা ও চা নিয়ে এল। একটি লুচি ভেঙ্গে মুখে পুরতে পুরতে বসন্ত রায় বললেন, "মিসেস ঠাকুর, আপনি জানেন না, কতদিন পরে এরকম লুচি খাচ্ছি। একলা থাকি, নিজে রান্না করে খাই। ডাল, চিকেনকারি বা ভাত রান্না করতে পারি, তা বলে তো লুচি ভাজতে পারি না।"

"কেন লুচি ভাজা এমন কিছু শক্ত কিসের," প্রতিমা হেসে উত্তর দিল।

"আপনাদের মেয়েদের কাছে কিছু নয়। কিন্তু আমাদের আনাড়ি

হাতে তা কী আর ফুলবে! একদিন দেশের মতো করে মাছের ঝোল রান্না করতে গিয়েছিলাম, একরকম পদার্থ হোল ঠিকই, কিন্তু দেশের মাছের স্বাদ কী আর এখানে পাওয়া যায়!"

"তার প্রমাণ আমরা ইতিমধ্যেই অনেকবার পেয়েছি," রথী বলল।

খাওয়ার পাট চুকতেই আর কিছু সামান্য কথা বলে বসন্ত রায় বিদায় নিলেন। বললেন যে কবির সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রাখবেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হলে তার কপি শান্তিনিকেতনে পাঠাতে ভুলবেন না।

বসন্ত রায় চলে যেতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কী রকম অমায়িক লোক! আমি এখানে আছি জেনে শিকাগো থেকে দেখা করতে এলেন। তবে ভদ্রলোক ওই নোবেল প্রাইজের কথা উল্লেখ না করলেই পারতেন।"

রথী একটু প্রতিবাদের সুরে বলল, "কেন বাবামশায়, কবি ইয়েটস্, স্টার্জ মোর, মে সিংক্লেয়ার ইত্যাদি সবাই আপনার কবিতার যেমন ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, তাতে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়া কিছু অসম্ভব নয়।"

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন। তারপর কথার মোড় অন্যদিকে ঘুড়িয়ে দেবার জন্য জিজ্ঞাসা করলেন, "শিকাগো যাবার সব ব্যবস্থা করেছো রথী? আর এক সপ্তাহ পরেই তো রওনা দিতে হবে।"

"হ্যাঁ," রথী উত্তর দিল, "পোয়েট্রি পত্রিকার এডিটর মিস্ হ্যারিয়েট মনরো, মিসেস হ্যারিয়েট ভন্ মুডী নামে এক ভদ্রমহিলার বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছেন। মিস্ মনরো লিখেছেন যে মিসেস ভন্ মুডীর স্বামী উইলিয়াম ভন্ মুডী দু বছর হোল মারা গেছেন। তিনি নাকি আমেরিকার এক নামকরা কবি ছিলেন।"

"আমি অবশ্যি তাঁর নাম শুনিনি। তবে সাক্ষাৎ হলে তাঁর বই চেয়ে নিয়ে পড়ব। আমেরিকা বিশাল দেশ, তার কত লেখক-

লেখিকা আছেন। কিন্তু আমাদের দেশে কজনের বই-ই পৌঁছায় বলো। তবু তো শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীতে কবি ওয়াল্ট হুইটম্যান ও দার্শনিক এমার্সনের যতগুলি বই পেরেছি কেনার চেষ্টা করেছি।”

রথী বলল, “বাবামশায়, রেভারেণ্ট ভেইল্ আমাকে ডেভিড থোরো বলে একজন লেখকের ‘ওয়াল্ডেন্’ বলে একটি বই পড়তে দিয়েছেন। পড়ে দেখলুম অপূর্ব, সম্পূর্ণ অন্য ধরণের বই।”

“বেশতো, আমাকে দিও, আমি পড়ে দেখবো,” রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

“ভারি সুন্দর ভাষা বইটির”, রথী বলে চলল। “ম্যাসাচুসেট্স্ রাজ্যের একটি জলাশয়ের পাশে দিনের পর দিন একা একা বাস করেছেন, আর যা ভেবেছেন তাই লিখেছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তিনি অন্যায় আইনের বিরুদ্ধে ‘সিবিল ডিস্ওবিডিয়েন্স’ আন্দোলন করার কথা বলেছেন।”

“দ্যাখো, উনিশষ পাঁচ সালে আমরা বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেছিলুম, তার মূল কথাই ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে সেই ঘৃণীত আইনের প্রতিবাদ করা। অনেকেই আমাকে বলেছে কেন আমি সেই আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালাম। আমি তো মনে-প্রাণেই সেই আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, কিন্তু যেদিন বুঝলুম যে এই আন্দোলন হিংসার দিকে যাচ্ছে, তখন সেখান থেকে সরে যাওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। ভারতীয় সভ্যতার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবদানের কথা আমরা বলি, সেখানে তো হিংসার কোন স্থান নেই।”

প্রতিমা এতক্ষণ চুপ করে ওদের কথা শুনছিল। বাবামশায় যখন বলতে শুরু করেন তখন তাঁর কথা শুনতে এত ভাল লাগে! আর তার স্বামীও যেন আমেরিকায় নিজের পরিচিত স্থানে এসে আরও সপ্রতিভ হয়েছে। সেই আগেকার লাজুক ভাব সব কোথায় চলে গেছে।

হঠাৎ ওর একটা কাজের কথা মনে পড়ল। রথীকে বলল, "বাবামশায় লণ্ডনে থাকতে বলেছিলেন যে অর্শের ব্যথার জন্য শিকাগোতে হোমিওপ্যাথির চিকিৎসা করবেন। এখন আমরা যখন শিকাগোতে যাচ্ছিই, তখন তার একটা ব্যবস্থা করলে হয়না?"

রথী বলল, "ঠিকই বলেছো। আমি আজই ডাক্তার নেইস্‌কে লিখছি। কিন্তু কতটা কাজ হবে বুঝতে পারছি না। আমার এখনও মনে হয় লণ্ডনে আপনার অপারেশন করিয়ে নেওয়া উচিত ছিল।"

"না না, অতো খরচের মধ্যে আমি কখনোই রাজী হতে পারিনা। দেখছো আমাদের এখানে কী রকম খরচ হচ্ছে। তারপর শান্তি-নিকেতনের আর্থিক অবস্থা একটুও ভাল নয়। কীরকম ভাবে ওরা সবাই চালাচ্ছে তা ভাবতেই আমার খারাপ লাগে। কিন্তু ভাবছো কেন? হোমিওপ্যাথির ওপর আমার বিশ্বাস আছে। দেখো ঠিক ভাল্ হয়ে যাবে।"

প্রতিমা একটু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করল, "আপনার অষুধের বাক্সের জন্য কিছু পুরিয়া নিয়ে যাবেন না?"

"অষুধের বাক্স নিয়ে ঠাট্টা কোরনা বৌমা। জানোতো ওই বাক্স অনেককেই আরোগ্য করেছে। সেই সমস্ত গরীব সাঁওতালী চাষী, তাদের তো টাকা-পয়সা নেই। অষুধের ফলের থেকেও এর প্রতি ওদের অখণ্ড বিশ্বাসের জন্যই বেশী কাজ হয়।"

একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ নিজের ঘরে গিয়ে পড়াশুনোর টেবিল চেয়ারে বসলেন। তাঁর মনে হোল তিনি যেন বক্তা হিসেবে আর এক কেরিয়ার-এর সম্মুখীন হয়েছেন। এখন আর কবিতা লেখার প্রেরণা আসে না। এই বক্তৃতা তৈরী করতেই সব সময় চলে যাচ্ছে।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে কী বিষয় নিয়ে বলবেন তা ভাবতে লাগলেন। এখানে তো পরপর সপ্তাহ উপনিষদের শিক্ষার ওপর বললেন। সেই মূল ধারা বজায় রেখেই কিছু বলতে চান তিনি।

প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা নিয়ে কিছু বললে কেমন হয়? তাঁর লেখা ভারতীয় ইতিহাসের ধারার ওপর প্রবন্ধগুলির কিছু অংশ এখানে কাজে লাগানো যেতে পারে। এইসব চিন্তা করেই তিনি ঠিক করলেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতাটির নাম দেবেন: 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ'।

॥ ছয় ॥

শিকাগোর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরো অনেক ত্যাগ, পরিশ্রম ও অর্থকষ্টের মধ্য দিয়ে এই পত্রিকা বার করেছেন। কোনদিন বিয়ে করেননি, সাহিত্যকে ধ্যান-জ্ঞান করে তার বেদীতেই জীবন সমর্পণ করবেন স্থির করেছেন। প্রথম জীবনে কবিতা ও গল্প লিখে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চেয়েছিলেন। তা যখন হোল না, তখন শিকাগোর 'ট্রিবিউন' পত্রিকার আর্ট-ক্রিটিক্ হলেন কিছুদিন। আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্য তখন এক স্কুলে আবার সপ্তাহে চার ঘণ্টা করে পার্ট টাইম পড়াতেন।

উনিশশ এগার সালে জানুয়ারী মাসে পৃথিবী পরিভ্রমণ করে শিকাগোয় ফিরে আসার পর হঠাৎ তাঁর এই পত্রিকা বার করার চিন্তা মাথায় এলো। শিকাগো আর্ট ইন্স্টিটিউটে তখন এক বড় এক্জিবিশন চলছিল, তা দেখে হঠাৎ তাঁর মনে হোল যে আর্টিষ্টরা ছবি এঁকে বা স্থপতিরা মূর্তি গড়ে খ্যাতি ও পয়সা পান, কিন্তু কবিদের উপায় কি! অধিকাংশ পত্র-পত্রিকার এক কোণে টুকরো-টুকরো কবিতা ছাপা হয়, বা স্পেশাল এডিশনে কয়েক পৃষ্ঠা বেশী থাকে। তা দিয়ে না হয় সুনাম, না হয় বিশেষ কোন অর্থাগম। তিনি ভাবলেন যদি এমন একটি ম্যাগাজিন বার করা যায় যেখানে

শুধুমাত্র কবিতাই প্রকাশ হবে, তাহলে তা কবিদের প্রতিষ্ঠিত করার এক উপযুক্ত বাহন হতে পারে।

কিন্তু তিনি কী তা প্রকাশ করতে পারবেন? তাঁর তো নিজের যথেষ্ট অর্থ বা সামর্থ নেই। কিন্তু এই কল্পনা মাথা থেকে ছাড়লো না, দিনদিনই কেবল ঘনীভূত হতে লাগল। এই নিয়ে শিকাগোতে তাঁর ঔপন্যাসিক ও বিত্যবান বন্ধু ডোয়ার্ট চ্যাটফিল্ডটেলরের সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁকে নিরস্ত করার বদলে প্রচুর উৎসাহই দিলেন। তারপরই এই পত্রিকার জন্য টাকা তোলার ব্যাপারে হ্যারিয়েট মনরোর এক অভিনব পরিকল্পনা মাথায় এল। 'পোয়েট্রি'র জন্য তিনি একশ জন পৃষ্ঠপোষক জোগাড় করবেন যারা প্রত্যেকে বছরে পঞ্চাশ ডলার করে চাঁদা দেবেন এবং পাঁচ বছরের জন্য গ্রাহক হবেন। এই টাকা উঠলে অন্তত পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে এই পত্রিকা চালানো যাবে।

তাই করা হোল। সেই টাকা তোলার ধান্ধায় তাঁকে শিকাগোর কত লোকের অফিসে, বাড়িতে ধর্ণা দিতে হোল তার ইয়ত্তা নেই অধিকাংশই কিন্তু এই প্রস্তাবে উৎসাহ দেখালেন। তারা চান শিকাগো সহর শুধু মাংস-প্রস্তুতি ও শস্যভাণ্ডারের কেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত নয়, সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান হিসেবেও খ্যাতি-লাভ করুক তাই একশর জায়গায় প্রায় দেড়শজন গ্রাহক মিলল, পঞ্চাশ ডলারের জায়গায় অনেকেই একশ-দেড়শ ডলার চাঁদা দিলেন।

অবশেষে উনিশশ বারো সালের জানুয়ারী মাসে অনেক আশা নিয়ে প্রথম সংখ্যা বেরোল। এই বছরেরই ডিসেম্বরের সংখ্যাতে রবীন্দ্রনাথের ছটি ইংরেজী কবিতা প্রকাশিত হোল যা এজরা পাউণ্ড 'পোয়েট্রি'র বৈদেশিক প্রতিনিধি হিসেবে লণ্ডন থেকে পাঠিয়েছিলেন। হ্যারিয়েট মনরো প্রথম যখন এই কবিতাগুলি পেয়েছিলেন, তখন সেগুলি ছাপানো সম্পর্কে তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। 'পোয়েট্রি'

হবে আধুনিক কবিতার বাহন, নতুন কবিতা আন্দোলনের অন্যতম অগ্রদূত। সেখানে এইসব ভক্তিমূলক কবিতা ছাপানো কী ঠিক হবে! কিন্তু এই কবিতাগুলি এত মধুর, এত লিরিক্যাল যে একবার পড়লেই মন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, বারবার পড়তে ইচ্ছে করে।

এগুলির সঙ্গে রয়েছে আবার এজরা পাউণ্ডের সুদীর্ঘ ভূমিকা। এজরাকে সামলানো মুস্কিল। যার দিকে যখন সে ঝোঁকে, তখন তাকে নিয়ে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে! কিন্তু টেগোর ইণ্ডিয়ার পোয়েট, ভারতবর্ষ থেকে আর কোন কবির নাম তাদের জানা নেই। আর 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিন তো শুধু আমেরিকার নয়, আন্তর্জাতিক কবিতা আন্দোলনের মুখপাত্র হতে চায়। তাই হ্যারিয়েট মনরো ঠিক করলেন যে ডিসেম্বরের সংখ্যাতেই কবি ইয়েটস্-এর কবিতার সঙ্গে এই কবিতাগুলি প্রকাশ করবেন।

তারপর রথীর চিঠি পেয়ে যখন তিনি জানতে পারলেন যে ভারতবর্ষের সেই কবি এখন শিকাগো সহরের এত কাছে আছেন, তখনই কবিকে শিকাগোয় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো ঠিক করলেন।

কিন্তু টেগোর এসে উঠবেন কোথায়! 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের তো অতিথিদের অভ্যর্থনা করার মতো কোন ভাণ্ডার নেই, বিশেষ করে যে অতিথি এত দূর দেশ থেকে এসেছেন।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল আর এক হ্যারিয়েটের নাম, হ্যারিয়েট ভন্ মুডীর। আমেরিকার বিখ্যাত কবি উইলিয়াম ভন্ মুডীর বিধবা স্ত্রী। উইলিয়াম হঠাৎ মারা যাবার পর এখন ভীষণ একা ও শোকাভূত হয়ে পড়েছেন। উইলিয়াম বেঁচে থাকতে ওরা ওদের বাড়িতে অনেক সাহিত্যিক-শিল্পীকে আপ্যায়ন করেছেন। কিন্তু এই ভারতীয়কে অতিথি হিসেবে গ্রহণ করবেন কী? যদি করেন তাহলে রবীন্দ্রনাথকে আর হোটেলের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকতে হবেনা।

মিস্ মনরো ফোন তুলে মিসেস মুডীর বাড়িতে ফোন করলেন।

"হ্যালো, হ্যারিয়েট, আমি হ্যারিয়েট মনরো বলছি। এখন কেমন আছো?"

"এই চলে যাচ্ছে। কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করছি।"

"সেটি খুব ভাল কথা। কাজের মধ্যেই সবকিছু ভুলে থাকতে পারবে। শোনো, যে জন্য তোমাকে বিশেষভাবে ফোন করছি। উইলিয়াম মারা যাবার পর তো তুমি ভীষণ নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছো, আগের মতো আর শিল্পী-সাহিত্যিকদের আপ্যায়ন কর না। ইণ্ডিয়া থেকে একজন বিখ্যাত কবি এখানে আসছেন, তুমি কী তাঁকে কয়েকদিনের জন্য তোমার বাড়িতে রাখতে পারবে?"

'ইণ্ডিয়া' শুনে মিসেস মুডী ইতঃস্তত করলেন। "দ্যাখো, আমার এমনি রাখতে আপত্তি নেই। কিন্তু আমি তো কোন এশিয়ার লোককে কোনদিন আপ্যায়ন করিনি, ওদের কালচার আলাদা।"

"তার জন্য তুমি ভেবোনা। এজরা পাউণ্ড লণ্ডন থেকে লিখেছে যে মিঃ টেগোর অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি, দেখতে নাকি সেইন্ট্-এর মতো। সঙ্গে ওঁর পুত্র ও পুত্রবধূ আছে। মাত্র কয়েকদিনের জন্যই এখানে থাকবেন।"

"কিন্তু তুমি তো জানো, উইলিয়াম মারা যাবার পর বলতে গেলে এন্টারটেইন্মেন্ট করা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

"আই আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড", মিস্ মনরো বললেন। "আচ্ছা এখন রাখছি, পরে আবার কথা হবে", বলে তিনি ফোন ছেড়ে দিলেন।

ফোনটা রেখে দেবার পর হ্যারিয়েট ভন্ মুডীর মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল, ভাল হোস্টেস হিসেবে শিকাগোর সংস্কৃতি মহলে তাঁর সুনাম আছে। যদিও ইদানীং স্বামী মারা যাবার পর সে সব স্থগিত আছে, তবু এ একটি স্পেশাল কেস।

হ্যারিয়েট মনরো 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিন বের করে শিকাগোকে

পৃথিবীর সামনে আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম কেন্দ্রস্থল করে তুলতে চায়। উইলিয়াম বেঁচে থাকলে এ ব্যাপারে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করতেন। এ অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতেন না।

পরের দিন সকালে উঠেই তিনি হ্যারিয়েট মনরোকে ফোন করলেন।

"হ্যারিয়েট, আমি হ্যারিয়েট মুডী বলছি। শোন, মিঃ টেগোরদের গেষ্ট্ হিসেবে গ্রহণ করতে আমার কোন আপত্তি নেই। উইলিয়াম বেঁচে থাকলে তো এই বিদেশী কবিকে কাছে পেয়ে ধন্য হয়ে যেত, কত আদর আপ্যায়ন করতো। তাঁর স্মৃতির কথা স্মরণ করেই আমি টেগোরদের আপ্যায়ন করতে চাই।"

"তার জন্য তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ হ্যারিয়েট। তোমার সঙ্গে কালকে কথা বলার পর আমি একটু চিন্তায় পড়েছিলাম। জানোতো, 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের বাইরের কোন লোককে আপ্যায়ন করার মতো আর্থিক সংগতি নেই। এ পত্রিকার তুমি একজন বড় পেট্রন। সেইজন্যই গতকাল তোমাকে ফোন করেছিলাম।"

"না, না, তুমি আমাকে ফোন করে ঠিকই করেছো। গতকাল 'না' বলার জন্য আমি সত্যিই দুঃখিত। ওরা কবে আসবেন তা আমাকে আগেই জানিও।"

"নিশ্চয়ই। আমি আজকেই ওদের এখানে আসার জন্য লিখে দিচ্ছি। ওদের চিঠি পেলেই দিনক্ষণ সব তোমাকে জানাবো।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন তাহলে রাখছি", বলে মিসেস ভন্ মুডী টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।

হ্যারিয়েট মনরোর মত হ্যারিয়েট ভন্ মুডীও নিজের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তাঁর বাবা উইলিয়াম টিণ্ডেল্ শিকাগোতে গরুর ব্যবসা করে অনেক পয়সা করেছিলেন, কিন্তু শেয়ার বাজারের

ফাটকাবাজিতে সব খোয়ালেন। তিনি যখন মারা গেলেন, তখন ওদের সংসার চালানো দায়। ফলে ওয়াবাস্ অ্যাভেন্যুর বিরাট বাড়ি ইত্যাদি সবই বিক্রী করতে হোল। দুই ভাই, কিন্তু আর্থিক ব্যাপারে তারাও স্বচ্ছল নয়, সবকিছুর ভার এসে পড়ল হ্যারিয়েটের ঘাড়ে।

হ্যারিয়েট ইতিমধ্যে কর্ণেল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েট হয়ে শিকাগোর এক স্কুলে চাকরি করছিলেন। ডাক্তারী পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাবার বাধায় তা হোলনা। এখন স্কুলের এই মাইনেই প্রধান ভরসা। বাবা বেঁচে থাকতেই এডুইন ব্রেইনার্ড বলে একজনকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই সেই বিয়ে ভেঙ্গে গেল।

নিতান্ত ভাগ্যচক্রেই তিনি কেটারিং-এর ব্যবসায়ে ঢুকে পড়েছিলেন। এই ব্যাপারে শিকাগোর মার্শাল ফিল্ড দোকানের অন্যতম কর্মচারী হ্যারি সেল্‌ফ্রিজ খুব সাহায্য করেছিলেন। ধাক-ধাক করে সেই ব্যবসায়ে উন্নতি হোল। সেই থেকেই এই বাড়ি-গাড়ি-সম্পত্তি হয়েছে। এখন তার তৈরী রান্না না হলে শিকাগোর রেল-রোড কারের ধনী প্যাসেঞ্জারদের মুখে রোচেনা।

এর কিছুদিন পরেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের তরুণ অধ্যাপক উইলিয়াম ভন্ মুডীর সঙ্গে পরিচয় ও ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হোল। উইলিয়াম ততদিনে কবি ও নাট্যকার হিসেবে খুবই বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। তাঁর 'ফায়ার-ব্রিংগার' কাব্যগ্রন্থ ও 'দি গ্রেট ডিভাইড' নাটক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তাঁর নাম আমেরিকার শিক্ষিত সমাজে খ্যাতি এনে দিয়েছে। কিন্তু হ্যারিয়েটের সঙ্গে ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে গ্রীসে এক টিলা থেকে পড়ে গিয়ে সেই যে ব্যথা হোল, শত চেষ্টাতেও তা আর সারলনা। তার কিছুদিন আগে হ্যারিয়েটেরও পড়ে গিয়ে বাঁ পা এমনভাবে মচকে গেল যে সেটিও আর আরোগ্য হোলনা। সেই থেকে একটু খুঁড়িয়ে চলেন।

কিন্তু হ্যারিয়েট যেই বুঝলেন যে উইলিয়ামের আরোগ্য হবার আর সম্ভাবনা নেই, তখন কোন অনুষ্ঠানের মধ্যে ফিরে না গিয়েই তাকে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করলেন। ততদিনে তাঁর জীবন-দীপ নির্বাপনের পথে। উনিশয দশ সালে তিনি যখন মারা গেলেন, তখন তার বয়স মাত্র এক্‌চল্লিশ বছর।

স্বামীর অকাল মৃত্যুতে হ্যারিয়েটের ভূবন যেন শূন্য হয়ে গেল। যে দিকে তাকান উইলিয়ামের স্মৃতিচিহ্ন দেখতে পান। বাড়িতে স্বামীর আঁকা অসংখ্য ছবি ঝুলছে, টেবিলের ওপর 'ডিয়ার হ্যারিয়েট' বলে স্বামীর সব চিঠি জড়ো করে রাখা হয়েছে। মনে হয় উইলিয়াম যেন কোথায় বেড়াতে গেছেন, এই শিগ্রিই ফিরবেন।

কিন্তু এ সব সত্বেও কেটারিং এর ব্যবসা চালিয়ে যেতে হবে। অনেক লোকের রুজি-রোজগার তাঁর ওপর নির্ভর করে আছে। আজ এই খাবারের ব্যবসার মধ্যে ডুবে থেকেই তিনি যেন তাঁর সব কিছু দুঃখ ভুলে থাকতে চাইলেন।

হ্যারিয়েট ভন্ মুডীর, বাড়ি শিকাগো সহরের ২৯৭০ নম্বর গ্রোভল্যাণ্ড অ্যাভেন্যুতে। লাল রংয়ের তেতলা ইটের বাড়ি। সামনে 'রট্ আয়রন' এর ফ্রেম দিয়ে ঢাকা। ভেতরে ঢুকে হলঘরে দাঁড়ালেই ডানদিকে লিভিং রুম পড়ে সেখানে গ্রাণ্ড পিয়ানো ও অনেক ছবি ও মূর্তি রয়েছে। হলঘরের সামনে একটি বিরাট ফায়ার প্লেস আছে ও তার সামনে এক বিরাট দোলনা ঝোলানো আছে, যেটি হচ্ছে গৃহকর্ত্রীর প্রধান আসন। চারদিকে বই আর বই। পেছন দিকে ডাইনিং রুম। এখানের এক দেয়ালে মিঃ মুডীর আঁকা 'হ্যারিয়েট' তৈল্যচিত্র ঝুলছে, এই ঘরের বিরাট 'বে' উইণ্ডোর নিচে একটি ছোট ডেস্ক ও চেয়ার আছে যেখানে বসে মিসেস মুডী তার ব্যবসা ও গৃহকর্মের কাগজপত্র দেখেন।

রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমাকে নিয়ে যখন মিসেস মুডীর বাড়িতে

পৌঁছলেন, তখন বিকেল হয়ে গেছে। কলিং বেল টিপতেই মিসেস মুডীর অনেক দিনের পুরোনো জার্মান শোফার-বাটলার অ্যান্টন স্কেডল এসে দরজা খুলে দিল। রবীন্দ্রনাথ যখন হলঘরেতে ঢুকলেন, তখন দেখেন যে এক মধ্যবয়সী সুসজ্জিতা ভদ্রমহিলা হাসিমুখে তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন। তিনি সামান্য একটু খুড়িয়ে চলেন, কাছে থেকে লক্ষ্য না করলে যা বোঝা যায়না।

"মিঃ টেগোর, আমি হ্যারিয়েট ভন্ মুডী। ওয়েলকাম টু শিকাগো।"

রবীন্দ্রনাথ ধন্যবাদ দিয়ে তাঁর সঙ্গে রথী ও প্রতিমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এই আমার ছেলে রথী ও পুত্রবধূ প্রতিমা।"

"ওহ, হোয়াট এ চার্মিং ডটার-ইন-ল ইউ গট মিঃ টেগোর," মিসেস মুডী ওদের লিভিং রুমের সোফায় বসিয়ে বললেন। "আমি হ্যারিয়েট মনরোকেও আজকে আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবার জন্য নিমন্ত্রন করেছি। আপনার সঙ্গে তো ওর সাক্ষাত হয়নি?"

"না, ওর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।"

রবীন্দ্রনাথকে দেখে মিসেস মুডী চমকে গেছেন। ভারতীয় বলাতেই তিনি ভেবেছিলেন ছোট-খাট একজন সাধারণ চেহারার লোক হবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘদেহ, শ্মশ্রুমণ্ডিত, জোব্বাপড়া চেহারা দেখে তাঁর মনে পড়ল মিস মনরোর বর্ণনা। এজরা পাউণ্ড নাকি লিখেছে যে তাঁর চেহারা প্রাচীন ভারতের আর্য ঋষিদের মতো। আবার কবির কণ্ঠস্বর কী মিষ্টি, কী নম্র কথাবার্তা!

মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি নিশ্চয়ই খুব থাষ্টি। আপনাকে একটি ছোট ড্রিঙ্ক দেবো?"

"ক্ষমা করবেন, মিসেস মুডী। আমরা কেউই ড্রিঙ্ক করিনা। আপনি আমাদের অনুগ্রহ করে ফ্রুট জুস্ দিতে পারেন।"

মিসেস মুডী তখন ট্রেতে করে নিজের হাতে রান্নাঘর থেকে ফ্রুট

জুস্ নিয়ে এলেন। তারপর সোফার টেবিলে সেটি নামিয়ে রেখে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন যে আমার পরলোকগত স্বামী উইলিয়াম একজন কবি ছিলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর নাটক নিউইয়র্ক সহরের ব্রডওয়েতেও অভিনীত হয়েছিল বেশ কিছুদিন ধরে। উইলিয়াম আজ বেঁচে থাকলে আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে কী-খুশীই না হোত!"

"এ দুঃখ আমারও মিসেস মুডী। ওর কাছ থেকে আমেরিকান সাহিত্যের অনেক কিছু পাওনা ছিল যা অপূর্ণই রয়ে গেল।"

"মিঃ টেগোর, উইলিয়াম মারা গেছে আজ দুবছরের ওপর হোল, কিন্তু এখনও আমার মনে হয় ও এই সেদিনও আমাদের মধ্যে ছিল। কেন এমন হয় বলুন তো?"

"মিসেস মুডী, আমরা যাদের ভালবাসি, তারা বোধহয় ঈশ্বরেরও অতীব প্রিয়, নইলে এত তাড়াতাড়ি কেন নিজের কাছে টেনে নেবেন? গত দশ বছরের মধ্যে আমার স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র মারা গেছে, কিন্তু আমার প্রায়ই মনে হয় তারা আমাদের ছেড়ে বেশী দূর যায়নি, এই কিছুদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।"

মিসেস মুডী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখের জল মুছলেন। তারপর বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই পথশ্রমে ক্লান্ত। চলুন, আপনাদের থাকার জন্য গেষ্টরুম দুটি দেখিয়ে দিই।"

দোতলার দক্ষিণদিকে দুটি ঘর স্থির হয়েছে। রথীদের ঘরটি দেখিয়ে মিসেস মুডী রবীন্দ্রনাথের জন্য নির্ধারিত ঘরে তাঁকে নিয়ে গেছেন। "মিঃ টেগোর, এই হচ্ছে আপনার ঘর। এর জানালা দিয়ে আপনি শিকাগো নদী অবধি দেখতে পাবেন।"

সত্যি, এই গেষ্ট রুমটি ভারী সুন্দর। মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট, পালঙ্কের খাট, জানলার কাছে লেখার জন্য টেবিল ও চেয়ার। কোণে অন্যদের বসবার জন্য একটি 'সেটি' ও তার পাশে বিরাট ক্লসেট্। ঘরের সঙ্গে আবার লাগোয়া বাথরুম রয়েছে। দেয়ালে

বেশ কয়েকটি ছবি ঝুলছে, কিন্তু প্রথমেই চোখে পড়ে শিয়রের দেয়ালে এক বিরাট অয়েল পেন্‌টিং। মাথায় পালক-পড়া এক ইণ্ডিয়ানের ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ছবিটি দেখে বললেন, "বাঃ, ভারি অথেন্টিক ইণ্ডিয়ানের ছবি তো!"

মিসেস মুডী ঘাড় নাড়লেন, "হ্যাঁ, অথেন্টিক ইণ্ডিয়ানই বটে। এ ছিল এখানকার এক ইণ্ডিয়ান ট্রাইব-এর চিফ্। বিল্-এর আঁকা ছবি। বিল্-এর আবার ইণ্ডিয়ান আর্টিফ্যাক্ট যোগাড় করার হবি ছিল।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আপনি এখন আবার এক ইণ্ডিয়ান আর্টিফ্যাক্ট যোগাড় করেছেন। তফাং হচ্ছে আমরা হচ্ছি ইস্ট ইণ্ডিয়ান।"

"তা কেন মিঃ টেগোর। আপনি হলেন অত্যন্ত মান্য অতিথি। আপনার মুখ দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান শোনার জন্য আমরা খুবই উৎসুক।"

"আমার যতটুকু সাধ্য তা আমি সানন্দেই ব্যাখ্যা করব," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, সাহিত্যে আমার বরাবরই আগ্রহ। কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট পড়ার সময় আমি প্রফেসর হাইরান্ কর্সন্-এর ছাত্রী ছিলাম, চসার ও ব্রাউনিং-এর কবিতার ওপর যার ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। ওঁর ছোট মেয়ে হঠাৎ অকালে মারা যাবার পর উনি ভীষণ স্পিরিচুয়ালিজম্-এর দিকে ঝোঁকেন এবং মাদাম ব্লাভাৎস্কির থিয়োসফিক্যাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন।"

"এতো দেখছি এক আশ্চর্য ব্যাপার। যেখানেই যাই সেখানেই মাদাম ব্লাভাৎস্কির ছায়া পড়ছে। লণ্ডনে কবি ইয়েট্‌স্ দেখলাম তাঁর একজন ভীষণ ভক্ত। আবার এখন শিকাগোতেও দেখছি আপনি তাঁর ভক্ত।"

"আমি তাঁর তত ভক্ত নই, খ্রীশ্চিয়ান সায়েন্স-এর আন্দোলনের দিকেই আমার আকর্ষণ অনেক বেশী। প্রফেসর কর্সন-এর বাড়িতে গেলেই মাদাম ব্লাভাৎস্কির কথা শুনতাম।"

"আপনি ওঁকে কোনদিন দেখেছিলেন ?"

"হ্যাঁ, জাহাজঘাটে, যখন একই বোটে করে একই সহরের দিকে যাচ্ছিলাম। তিনি আমার হাত ধরে অনেক কথা বললেন, বললেন থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে যোগ দিতে। ভীষণ ষ্ট্রং পার্সোনাটিলির মহিলা।"

এমন সময় সদর দরজায় কলিং বেল বাজার শব্দ শোনা গেল। তাই শুনে মিসেস মুডী বললেন, "ওই বুঝি মিস্ মনরো এলেন। চলুন আমরা নিচে গিয়ে ওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি।"

ওরা নিচে নামতেই রবীন্দ্রনাথ দেখলেন মধ্যবয়েসী এক ভদ্র-মহিলা বাটলারের হাতে হ্যাট-কোট দিচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন দীর্ঘকায় পুরুষও এসেছেন।

মিসেস মুডী ওদের দেখে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে করমর্দন করে বললেন, "গুড্ ইভিনিং হ্যারিয়েট, গুড ইভিনিং মিঃ ফিলিপ্‌স্। আপনাদের সঙ্গে মিঃ টেগোরের পরিচয় করিয়ে দিই। মিঃ টেগোর, ইনিই 'পোয়েট্রি' সম্পাদিকা মিস্ হ্যারিয়েট মনরো, আর মিঃ জন ফিলিপ্‌স্ হচ্ছে শিকাগোর একজন বিজনেস্‌ম্যান।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে মিস্ মনরো বললেন, "ওহ্, মিঃ টেগোর, আপনার কবিতাগুলি প্রকাশ করার পর তার প্রশংসা করে যে কত চিঠি ও টেলিফোন এসেছে তা বলবার নয়। 'শিকাগো ট্রিবিউন' পত্রিকায়ও আপনার কবিতার প্রশংসা বেড়িয়েছে তা বোধহয় শুনেছেন ?"

রবীন্দ্রনাথ লজ্জিতভাবে মাথা নেড়ে বললেন 'হ্যাঁ'।

"আপনি আপনার কবিতার আরও ইংরেজী অনুবাদ করুন মিঃ

টেগোর। তাহলে দেখবেন ইংরেজীভাষী জগতেও কবি হিসেবে আপনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।"

এমন সময় রথী ও প্রতিমা ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে লিভিং রুমে এসে হাজির হোল। ওদের সঙ্গেও মিস্ মনরো ও মিষ্টার ফিলিপ্স্-এর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোল।

মিঃ ফিলিপস্ বললেন "মিঃ টেগোর, আমি সাহিত্যিক নই। আমি একটু শুকনো কাঠ-খড়ের মানুষ, কিন্তু হ্যারিয়েটের এই 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের সংগঠনের মধ্যে আমিও জড়িয়ে পড়েছি, মূলত 'ফাণ্ড-রেইসার' হিসেবে। সত্যি বলতে কী, আমিও এখন সাহিত্যের ওপর আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "কেউ তো আমরা সাহিত্যিক হয়ে জন্মাইনি মিঃ ফিলিপস্। শুধু চেষ্টা ও লেগে থেকেই আমরা যেটুকু হতে পেরেছি।"

মিস্ মনরো সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে বললেন, "না, না, মিঃ টেগোর। ঈশ্বর আপনাকে কবিতা লেখার প্রতিভা দিয়েছেন। শুধু চেষ্টা করে অমন সুন্দর কবিতা লেখা যায় না! আমার দিকে তাকালেই তার নিদর্শন দেখতে পাবেন।"

রবীন্দ্রনাথ সামান্য একটু হেসে চুপ করে রইলেন, একথার কোন উত্তর দিলেন না।

মিসেস মুডী বললেন, "হ্যারিয়েট, আমি রেভারেণ্ড ক্লিমেন্স-কেও ডিনারে আমন্ত্রন করেছি। তুমি তো ওঁকে চেন।"

"নিশ্চয়ই, ওঁর সার্মন একাধিকবার শুনেছি। সত্যি, ভারী সুন্দর ধর্মোপদেশ দেন।"

ওর কথা শেষ হতে না হতেই আবার সদর দরজায় ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। রবীন্দ্রনাথ দেখলেন যে একজন মোটাসোটা বয়স্ক পাদ্রীর কলার-পড়া পুরুষ ঘরের ভেতর ঢুকছেন। বাটলার তাঁর কাছ থেকে হ্যাটটি নিতেই মিসেস মুডী এগিয়ে এসে তাঁর করমর্দন

করেই রবীন্দ্রনাথের দিকে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, রেভারেণ্ড ক্লিমেন্সের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই। রেভারেণ্ড, মিঃ টেগোর ইণ্ডিয়ার খুব খ্যাতনামা কবি।"

"ওহ্, ভারত থেকে আপনি এসেছেন? জানেন মিঃ টেগোর, অনেক দিন আগে এই শিকাগোতেই আমি ভারত থেকে একজন রিলিজিয়ান মিশনারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম। তাঁর নামটি ভুলে গেছি, ক্ষমা করবেন সেটি খুবই সুদীর্ঘ নাম। কিন্তু কী জোরাল ও তেজস্বী বক্তা! তিনি আমাদের চার্চে বক্তৃতা দিতে এসেছিলেন, আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনেছিলাম।"

"আপনি নিশ্চয়ই স্বামী বিবেকানন্দের কথা বলছেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ ওই তাঁর নাম। এখন তিনি কেমন আছেন?"

"অত্যন্ত দুঃখের বিষয় রেভারেণ্ড যে তিনি কিছুদিন হোল মারা গেছেন।"

"ওহ, হোয়াট এ লস্! তাঁর মতো বাগ্মী সচারাচর সাক্ষাত মেলেনা। এ দেশে হিন্দুধর্মের মূল বাণী প্রচার করতে তিনি খুবই সক্ষম হয়েছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এ শুধু হিন্দুধর্মের ক্ষতিই নয়, সারা ভারতের সমাজজীবনেরও ক্ষতি। কিন্তু তিনি তাঁর অনেক শিষ্যকে ট্রেনিং দিয়ে গিয়েছিলেন। তারাই ওঁর কাজ সব চালিয়ে যাচ্ছেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিবেকানন্দের সম্পর্ক একটু অমসৃণ। কবি বিবেকানন্দের বাংলা লেখার খুবই প্রশংসা করতেন, তাঁর আমেরিকায় আসার চলিত ভাষায় বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লেগেছিল। কিন্তু কবির বাংলা লেখা নিয়ে বিবেকানন্দের বক্রোক্তি তাঁর কানে এসেছে, বিশেষ করে তাঁর ভাবালুতাপূর্ণ লেখা নিয়ে মন্তব্য। এ কথা রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করেছে ঠিকই, কিন্তু এ সম্পর্কে তিনি কারুকেই কিছু বলেননি। বরং ভগিনী নিবেদিতার বাড়িতে যেদিন বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন তিনি

ভীষণ আনন্দিত হয়েছিলেন। অনেকক্ষণ ধরে গল্প ও ধর্মসঙ্গীতের পালা চলেছিল। বিবেকানন্দের সঙ্গে সেই সাক্ষাত তাঁর মনে চিরদিন জাগরুক থাকবে।

তারপর তুজনের পথ তুদিকে সরে গেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্কুল নিয়ে আর বিবেকানন্দ তাঁর মিশনের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তুজনের সঙ্গে আর বিশেষ দেখা হয়নি। তারপর অকালে বিবেকানন্দের মৃত্যু হোল। শুনে রবীন্দ্রনাথ এত তুঃখ পেয়েছিলেন! আধুনিক হিন্দুধর্ম প্রবর্তনে এই তরুণ সন্ন্যাসী ভারতবর্ষে ধর্মের যে বন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, তার রেশ বহুদিন বজায় থাকবে বলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস।

ডিনার টেবিলে বসে মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, আমি কুক্‌কে রোস্ট্‌ টার্কি রান্না করতে বলেছি, জানিনা আপনাদের ভাল লাগবে কিনা। এখানে এই পরবের সময়ে ক্রান্‌বেরী সস্‌ দিয়ে টার্কি খাওয়া একটি রীতি বলতে পারেন।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "ইংলণ্ডে যখন আমি ছাত্রাবস্থায় ছিলুম, তখন খৃস্টমাসের সময় টার্কি খেয়েছি। কিন্তু অনুগ্রহ করে আমাকে কিডনী পাই দেবেন না। সেটি আমার খুব প্রিয় বস্তু নয়।"

"না না। আপনাদের জন্য পাম্প্‌কিন্‌ পাই করতে বলেছি। এখানে তো টার্কির সঙ্গে সেটারই চল বেশী।"

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, "এটিও আমার খুব একটা প্রিয় বস্তু নয়।"

রেভারেণ্ড ক্লিমেন্স বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি তো অনেক চার্চের সমাবেশে গেছেন। এদেশের ধর্ম সম্পর্কে আপনার কী অভিমত?"

"রেভারেণ্ড, আপনি যদি আমাকে মনের কথা খুলে বলবার অধিকার দেন তাহলে বলি, প্রথমেই যে জিনিষটি আমার চোখে

পড়ে তা হোল পশ্চিম জগতের লোকদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা থেকে ধর্মকে কী রকম আলাদাভাবে ভাগ করে রাখা হয়েছে। মানুষ এখানে সপ্তাহে ছদিন কাজ করছে, আর সপ্তম দিন রোববার সকলে চার্চে গিয়ে ঈশ্বরের উপাসনা করছে। কিন্তু বাকি ছদিন নয় কেন? ভারত থেকে ইংলণ্ডে আসার সময় জাহাজেও সেই জিনিষটি লক্ষ্য করেছি। সবাই বলড্যান্স করছে, খানাপিনা করছে বা ফুর্তি করছে, আবার ঠিক রোববার হলেই রেভারেণ্ডের সামনে বসে ধর্মোপদেশ শুনছে। অথচ, ভারতে যারা ধর্মোপাসনা করে, তারা সব সময়েই ঈশ্বরের আরাধনা করে, ঈশ্বরের নাম-গান করে। তার জন্য তাদের বিশেষ দিন-ক্ষণ লাগে না। নদীর ঘাটে বা মন্দিরে-মসজিদে গেলে দেখা যাবে সকাল-সন্ধ্যায় মানুষ আসন পেতে তাতে উপবিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন আছে।”

“কিন্তু মিঃ টেগোর, একটি কথা মনে রাখবেন। তা হোল এখানকার লোক রুজি-রোজগারের ধান্ধায় বড় ব্যস্ত। তাদের জীবন-যাত্রার মান-উন্নয়ণের প্রচেষ্টায় এতই সময় ব্যয় করে, প্রত্যহ চার্চে গিয়ে উপাসনা করার সময় পায়না।”

“প্রত্যহ চার্চে যাবার দরকার কী?” রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন। “বাড়িতে বসেই সবাই ঈশ্বরের উপাসনা করতে পারে। ভগবানের ধ্যান করতে তো বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। আমাদের হিন্দুধর্মে তাই গায়ত্রী মন্ত্রের প্রবর্তন আছে। গুরুর কাছ থেকে এই মন্ত্র নিয়ে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা ধ্যান করা বিধি। আমার সব চাইতে কী অদ্ভুত মনে হয় জানেন রেভারেণ্ড?”

“বলুন।”

“জীবন থেকে ধর্মের এই পার্থক্যকরণ। আপনারা জীবনকে বড় কম্পার্টমেন্টালাইজ করেছেন। ধর্ম যে জীবনকে প্রতিপদে চালনা করবে, তাই আপনারা ভুলতে বসেছেন। কিন্তু যে ধার্মিক জীবন-যাপন করবে, তার কাছে জীবনযাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপই ঈশ্বরের

নির্দেশে চালিত হবে, তার সমগ্র জীবনই ঈশ্বরের প্রতি নিবেদিত হবে।”

সবাই মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথের এই সব কথা শুনছিলেন। মিসেস মুডীর মনে হোল যেন প্রাচীন ভারতের আর্য-ঋষি ধর্মের, পবিত্রতার ও সৌন্দর্যের বাণী শোনাতে তাঁর বাড়িতে এসেছেন! অনেকদিন পরে তিনি প্রাণে শান্তি পেলেন। স্বামী উইলিয়ামের মারা যাবার পর শুধু দুঃখের রাতই কেটেছে, এখন ভারতের এই কবি এসে তাঁর চিত্তে শান্তি ও সন্তাপের আশ্বাসবানী শোনাচ্ছেন। এ যেন ঈশ্বরেরই বিচিত্র অভিপ্রায়, নইলে রবীন্দ্রনাথকে আতিথ্য দিতে প্রথমে তিনি নারাজই হয়েছিলেন।

পরের দিনই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা দেবার কথা। মিসেস মুডীর বাড়িতে লাঞ্চ খেয়ে সবাই চলল ইউনিভার্সিটির দিকে। মিসেস মুডীরই গাড়ী, তাঁর শফার সবাইকে নিয়ে চলল।

জানুয়ারী মাসের শীত, সারা শিকাগো সহরকে যেন হাড়কাঁপুনি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে। চারদিক সাদা বরফে ছেয়ে আছে, শুধু রাস্তা-ঘাট পরিস্কার, গাড়ী ও মানুষের চলার জন্য।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা খুব আন্তরিকতার সঙ্গেই গৃহীত হোল। এখানে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শ ব্যাখ্যা করলেন। তিনি বললেন ঃ

“প্রাচীন ভারতের প্রধান আদর্শই হচ্ছে প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করা। অর্থাৎ বাইরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাকে নষ্ট না করে তার ভেতরকার নিগূঢ় যোগকে আয়ত্ত করা। সেই আর্য-অনার্যের সংঘাত থেকে আরম্ভ করে পরবর্ত্তীকালে গ্রীক, শক, হুন ইত্যাদি সবারই

ভাল গুণগুলি আত্মসাৎ করে ভারতবর্ষ বহুর মধ্যে একককে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

"এই একককে প্রত্যক্ষ করা ও ঐক্যবিস্তারের চেষ্টা করা ভারতবর্ষের পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। তার এই স্বভাবই তাকে চিরদিন রাষ্ট্রগৌরবের প্রতি উদাসীন করেছে। তার প্রধান কারণ যে রাষ্ট্রগৌরবের মূলে আছে বিরোধের ভাব। পরকে একান্ত পর বলে সর্বান্তঃকরণে অনুভব না করে তারা রাষ্ট্রগৌরবলাভকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করতে পারেনা। পরের বিরুদ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করবার যে চেষ্টা তাই পলিটিক্যাল উন্নতির ভিত্তি। আর পরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধবন্ধন ও নিজের ভেতরকার বিচিত্র বিভাগ ও বিরোধের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা, এই হচ্ছে ধর্মনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির ভিত্তি।

"আমরা দেখি যে ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করেছে তা বিরোধমূলক, কিন্তু ভারতীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করেছে তা মিলনমূলক। ইউরোপের পলিটিক্যাল ঐক্যের মধ্যে সামঞ্জস্য নেই, তাই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদাই জাগিয়ে রেখেছে। আইনের পর আইন করে এই সকল বিসদৃশ বিরোধী অঙ্গগুলিতে কোনমতে জোড়াতালি দিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু ভারতবর্ষ বিসদৃশকেও সম্বন্ধবন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছে। যেখানে যথার্থ পার্থক্য আছে, সেখানে সেই পার্থক্যকে যথাযোগ্যস্থানে বিন্যস্ত করে, সংহত করে তবেই তার ঐক্যদান সম্ভব। পৃথককে বলের দ্বারা এক করলে তারা একদিন বলপূর্বকই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, সেই বিচ্ছেদের সময় প্রলয় ঘটে। ভারতবর্ষ মিলনসাধনের এই রহস্য জানত। ভারতবর্ষের লক্ষ্য ছিল সকলকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা, কিন্তু তার উপায় ছিল স্বতন্ত্র। ভারতবর্ষ সমাজের সমস্ত প্রতিযোগী বিরোধী শক্তিকে সীমাবদ্ধ ও বিভক্ত করে সমাজ কলেবরকে এক এবং বিচিত্র কর্মের উপযোগী

করেছিল, নিজ নিজ অধিকারকে ক্রমাগত লঙ্ঘন করবার চেষ্টা করে বিরোধ বিশৃঙ্খলা জাগিয়ে রাখতে দেয়নি। ঐক্যনির্ণয় মিলনসাধন এবং শান্তি ও স্থিতির মধ্যে পরিপূর্ণ পরিণতি ও মুক্তিলাভের অবকাশ, এই ছিল ভারতবর্ষের লক্ষ্য।

"বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টেনে এনেছেন। ভারতবর্ষ সমস্ত গ্রহণ করেছে, সমস্তই স্বীকার করেছে। যে সমাজে শৃঙ্খলা আছে, ঐক্যের বিধান আছে, সকলেরই স্বতন্ত্র স্থান ও অধিকার আছে, সেই সমাজেই পরকে আপন করে নেওয়া সহজ। হয় পরকে মেরে, কেটে, খেদিয়ে নিজের সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করা, না হয় পরকে নিজের বিধানে সংযত করে সুবিহিত শৃঙ্খলার মধ্যে স্থান করে দেওয়া। ইউরোপ প্রথম প্রণালীটি অবলম্বন করে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে বিরোধ উন্মুক্ত করে রেখেছে, আর ভারতবর্ষ দ্বিতীয় প্রণালী অবলম্বন করে সবাইকে ক্রমে ক্রমে ধীরে আপনার করে নেবার চেষ্টা করেছে। যদি ধর্মের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা থাকে, যদি ধর্মকেই মানবসভ্যতার চরম আদর্শ বলে স্থির করা যায়, তবে ভারতবর্ষের প্রণালীকেই শ্রেষ্ঠতা দিতে হবে।

"পরকে আপনার করতে প্রতিভার প্রয়োজন। ভারতবর্ষের মধ্যে সেই প্রতিভাকে আমরা দেখতে পাই। তার ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলাস্থাপন শুধু সমাজব্যবস্থায়ই নয়, ধর্ম-নীতিতেও দেখতে পাই। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তা বিশেষরূপে ভারতবর্ষের। ইউরোপের 'রিলিজিয়ান' শব্দ দিয়ে ভারতবর্ষের এই ধর্মকে ঠিক মতো বোঝা যাবেনা, কারণ ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটাতে বাধা দিয়েছে— আমাদের বুদ্ধি-বিশ্বাস-আচরণ, আমাদের ইহকাল-পরকাল, সমস্ত জড়িয়েই ধর্ম। ভারতবর্ষের ধর্ম সমস্ত সমাজেরই ধর্ম, তার মূল মাটির ভেতরে এবং মাথা আকাশের মধ্যে। তার মূলকে স্বতন্ত্র ও মাথাকে স্বতন্ত্র করে ভারতবর্ষ দেখে নি—ধর্মকে ভারতবর্ষ দ্যুলোক-

ভূলোক ব্যাপী, মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখেছে।”

বক্তৃতা অন্তে দীর্ঘ করতালির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ সম্বর্ধিত হলেন। উপস্থিত যারা ছিলেন, তাদের অনেকেরই মনে হোল তাঁরা যেন বিখ্যাত আমেরিকান দার্শনিক রাল্‌ফ্‌ ওয়াল্ডো এমার্সন-এর বক্তৃতা শুনছেন। সেই একই রকম মনোমুগ্ধকর বলার ভঙ্গি, শান্ত উচ্চারণ, বক্তব্য বিষয়ের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এই সময়ে মিঃ এডুইন লিউইস-এর আলাপ হোল। কয়েক বছর হোল তিনি শিকাগোতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার জন্য ‘লিউইস্‌ ইন্‌স্টিচুট’ স্থাপন করেছেন। তিনি নিজে এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, “মিঃ টেগোর, আপনার বক্তৃতা শুনে আমি মোহিত হয়ে গেছি। জানি বিশ্বের সভ্যতায় ভারতের অবদান মিশর বা চীনের সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু সেই ঐতিহ্যের ধারা যে আজও সেদেশে প্রবহমান, তা আগে উপলব্ধি করতে পারিনি।”

“মিঃ লিউইস, এই কথাটিই আমি বারবার বলতে চেয়েছি যে অন্যান্য প্রাচীন সভ্যতার মতো ভারতীয় সভ্যতা মৃত বা অদৃশ্য নয়, তার প্রকৃত মর্মবাণী আজও আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করে, যা গ্রহণ করে সারা পৃথিবীই উপকৃত হতে পারে।”

“মিঃ টেগোর, আমি এখানে যে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিচুট্‌ করেছি, সেখানে এখন দু-একজন ভারতীয় ছাত্র আছে, তাদের কাছে ভারতের কথা শুনেছি। কিন্তু তাদের তো এ সম্বন্ধে আপনার মতো জ্ঞান বা ধারণা নেই। আপনাকে একদিন আমাদের বাড়িতে আসতেই হবে, সেখান থেকে আমার ইন্‌স্টিচুটে নিয়ে যাবো। আমাদের ছাত্ররা আপনার বক্তৃতা শুনে খুবই আনন্দ পাবে। কোথায় উঠেছেন আপনি?”

“এই মিসেস. হ্যারিয়েট ভন্‌ মুডীর বাড়িতে,” বলে রবীন্দ্রনাথ

পাশে দাঁড়ানো মিসেস মুডীর সঙ্গে মিসেস লিউইস-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

মিসেস মুডী, আমি অবশ্যিই মিঃ মুডীর নাম শুনেছি। কবি হিসেবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে তো উনি ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন। ওর অকাল মৃত্যুতে আমেরিকা তথা শিকাগোর সাংস্কৃতিক জীবনই অনেক নিঃস্ব হোল।"

"আপনার ইনস্টিচুটের কথাও শুনেছি, প্রফেসর লিউইস। শুনলাম শীঘ্রি এটি ইলিনয় ইন্স্টিচুট অফ্ টেকনলজির অন্তর্গত হবে।"

"হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার প্রসারের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে এটি মিড্ ওয়েষ্ট-এ প্রযুক্তি বিদ্যার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠতে পারে। মিঃ টেগোর, আপনাকে আর ধরে রাখবো না। এই হোল আমার কার্ড, এতে আমার বাড়ির ঠিকানা লেখা আছে। আপনি ফোন করলেই আমি আপনার বক্তৃতার সব ব্যবস্থা করবো। আপনার পুত্র ও পুত্রবধূকেও সঙ্গে আনতে ভুলবেন না।"

"আপনার বাড়ি ও ইনস্টিচুটে নিশ্চয়ই যাবো প্রফেসর লিউইস। আপনার এই আমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ," বলে রবীন্দ্রনাথ ওর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

পরের দিন সকালে রথী ও প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে হ্যারিয়েট মুডী তাঁর গাড়িতে করে শিকাগো দেখাতে চললেন। গাড়ির শফার হচ্ছে অ্যান্টন্ স্কেডেল্, তাঁর বহুদিনের বিশ্বস্ত কর্মচারী। সে জাতিতে জার্মান, কিন্তু এতদিন আমেরিকায় থাকা সত্ত্বেও তার জার্মান-ভাষী অ্যাক্সেন্ট আর হারাতে পারেনি।

তখন জানুয়ারী মাসের শেষ, মিড্-ওয়েষ্ট-এর কঠিন বরফে চারদিক আচ্ছন্ন। যে দিকে তাকানো যায়, সেদিকেই যেন তুষারের চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুধু যে রাস্তার আশেপাশে বরফ জমে আছে

তাই নয়, পত্রহীন গাছের ডালগুলিতেও বরফ ঝুলে আছে। শীতের মরা রদ্দুরে সে বরফের গলার কোন লক্ষণই নেই।

গাড়িতে চলতে চলতে হ্যারিয়েট মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, কী দুর্ভাগ্য যে আপনারা শীতকালে এলেন। নইলে দেখতেন যে গ্রীষ্মকালে শিকাগো সহর খুব সুন্দর। বিশেষ করে মিশিগান লেকের ধারটা।"

রথী বলল, "আমি আর্বানায় থাকতে গ্রীষ্মের ছুটিতে বেশ কয়েকবার শিকাগোয় এসেছি। একবার লেক মিশিগানে বোটে করে ঘুরেছিলুম। তার ঢেউ দেখে মনে হয় আমরা যেন সমুদ্রের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি।"

মিসেস মুডী বলতে লাগলেন, "আজ শিকাগো সহরের এত বাড়বাড়ন্ত, অথচ আঠারশ সালেও এ ছিল নির্জন প্রেইরী ভূমি। কিছু আমেরিকান ইণ্ডিয়ান থাকত, আর লক্ষ লক্ষ বাইসন ঘুরে বেড়াত। এখন এটি আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম সহর।"

রবীন্দ্রনাথ সায় দিয়ে বললেন, "সত্যি, অবাক হতে হয় যে মাত্র একশ বছরের মধ্যে সেই শূন্য প্রান্তরের ওপর এতো অট্টালিকা ভরা বিশাল সহর গড়ে উঠেছে। পৃথিবীর আর কোথাও এটি হয়েছে কিনা জানা নেই।"

"একশ বছর কোথায়, মিঃ টেগোর! সত্যি বলতে কী, এই সহরের বর্তমান চেহারা দাঁড়িয়েছে গত চল্লিশ বছরের মধ্যে। আঠারশ একাত্তর সালে সেই বিশাল শিকাগোর আগুনে প্রায় অর্ধেক সহর ধ্বংস হয়েছিল, আঠার হাজারের মতো বাড়ি-ঘর পুড়ে গিয়েছিল। প্রবাদ আছে যে মিসেস ও'রাইলী বলে এক ভদ্রমহিলার গরুই নাকি তার খামার ঘরে লাথি দিয়ে এক কেরোসিনের লণ্ঠন খড়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, তাই থেকে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড শুরু হয়। এখনো এ সহরের কিছু খারাপ ঘটলে লোকে মিসেস ও'রাইলীর গরুকে দোষ দেয়!"

মিসেস মুডীর কথায় সব হেসে উঠল।

যদিও শিকাগোর স্টেট্ স্ট্রীটের দুধার দিয়ে সব বড় বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর স্থাপিত হয়েছে বা মিশিগান লেকের ধার দিয়ে ধনীদের বিশাল ইমারত গড়ে উঠেছে, তবু এই সহরের যন্ত্র-সভ্যতার কদর্যতাও কম ফুটে ওঠেনি। স্টক্ইয়ার্ড-এ সব কষাইখানা ও মাংস তৈরীর ফ্যাক্টরী-গুলি যেমন তৈরী হয়েছে, তেমনি রকফেলারের স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কম্পানীর রিফাইনারী ও অন্যান্য কারখানার কয়লার কালো ধোঁয়ায় বাতাস নিয়তই দূষিত হচ্ছে। দেখেই মনে হয় যে এই সহর যান্ত্রিক উন্নতিতে তাড়াতাড়ি সবাইকে ধরে ফেলতে চায়, তার জন্য সে সব দাম দিতে প্রস্তুত।

আঠারশ তিরানব্বুই সালের 'শিকাগো ফেয়ার' যেন তার এই প্রচেষ্টাকে দুহাত তুলে প্রশংসা করল, পৃথিবীর কাছে ঘোষণা করল এই সহরের সাফল্য ও তার ভবিষ্যত গতিপথ। রবীন্দ্রনাথের কিন্তু খুবই মনে পড়ছিল এইচ্. জি. ওয়েলস্-এর 'ফিউচার ইন্ আমেরিকা' বইয়ে শিকাগো সহরের বর্ণনা। সৌন্দর্যের চেয়ে সেখানে কলুষিতাই যেন বেশী করে বর্ণনা করা হয়েছে।

সহরের সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হচ্ছে বিশাল মিশিগান হ্রদের তীর। গাড়ি সেখানে পৌছতে রবান্দ্রনাথ দেখলেন যে তীরের কাছে মিশিগানের জল বরফে জমে ইটের মতো শক্ত হয়ে গেছে। তার ওপর রোদ্দুর পরে চিক্চিক্ করছে। খালি চোখে তাকানো যায় না।

আবার সেই বরফের মধ্যেই কোন কোন স্থান পরিষ্কার করে স্কেটিং রিং তৈরী করা হয়েছে এবং সেখানে ছোট-খাটো ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে স্কেটিং করে চলেছে। গাড়ির ভেতরে বসেই জানালা দিয়ে ওরা কিছুক্ষণ সেই দৃশ্য দেখলেন।

আর একটি দৃশ্য দেখে রবীন্দ্রনাথ চমকে উঠলেন। কবি দেখলেন যে অনেক জায়গায় সেই বরফের মধ্যেও ছোট্ট তাঁবু

খাটিয়ে একজন বা ছজন লোকে ছিপ ফেলে বসে আছে। ব্যাপারটা ভারী অবাক লাগল রবীন্দ্রনাথের।

হ্যারিয়েট মুডী বুঝিয়ে বললেন যে ওরা 'আইস ফিশিং' করছে। বরফের মধ্যেই গভীর গর্ত খুঁড়ে তার স্বচ্ছ জলের মধ্যে টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে দেয়, মাছে সেই টোপ গিললেই তখন তা সুতো টেনে তুলে ফেলে।

রবীন্দ্রনাথ ভাবলেন কত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই না জীবের প্রাণ বেঁচে থাকে! ওপরে অত শক্ত বরফ, অথচ তার নিচেই স্বচ্ছ জল, আর সেই জলে জ্যান্ত মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছে। আবার সেই মাছ নিধন করে লোকে জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করছে।

কিছুক্ষণ পরেই গাড়ী শিকাগোর 'ডাউন টাউন' এলাকায় এসে দাঁড়াল। মিসেস মুডী বললেন, "চলুন, আপনাদের একটি বড় ডিপার্টমেন্ট স্টোর ঘুরে দেখাই। যদি দরকার হয়, তাহলে কিছু টুকিটাকি কিনতে পারেন।"

প্রতিমা বলল, "আমার হাতের একটা গ্লাভ্‌স্‌ হারিয়ে গেছে, আর্বানায় থাকতে কিনেছিলুম। বাবামশায়, আপনার জন্যও এক জোড়া গ্লাভ্‌স্‌ কিনি?"

রবীন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিলেন, "আমার আবার গ্লাভ্‌স্‌-এর কী দরকার! ঠাণ্ডা লাগলেই এই জোব্বার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিই।"

মিসেস মুডী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "না না, মিঃ টেগোর। ওরকম ঝুঁকি নেবেন না। হাত একটুক্ষণের জন্য বাইরে থাকলেও এত ঠাণ্ডায় 'ফ্রস্ট্‌ বাইট্‌' হতে পারে।"

তা সত্যি, বিশেষ করে শিকাগোর ঠাণ্ডায় কনকনানি আর তাঁর ওভারকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে থামানো যায় না। রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল কার কাছে শুনেছিলেন যে এই শিকাগোতেই এসেই নিরাশ্রয় হয়ে প্রথমদিন স্বামী বিবেকানন্দের এত ঠাণ্ডা লেগেছিল

যে আর থাকতে না পেরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কংক্রিটের এক বড় পাইপের মধ্যে ঢুকে থেকে শীতের তীব্রতা থেকে আত্মরক্ষা করে-ছিলেন।

গাড়ী স্টেট স্ট্রীটে 'মার্শাল ফিল্ড' নামে ডিপার্টমেণ্ট স্টোরের সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ি থেকে নেমে দোকানের মধ্যে ঢুকতেই সেই প্রথম ফ্লোর-এর বিশালতা দেখে রবীন্দ্রনাথ অবাক হয়ে গেলেন। কী বিরাট হল ঘর, আর তার মধ্যে থরে থরে কত বিচিত্র সব জিনিষ সাজানো আছে !

দোকানের ক্রেতা, সেলস্ ক্লার্ক ইত্যাদি সবাই রবীন্দ্রনাথের লম্বা দাড়ি ও দীর্ঘ আলখাল্লা-পরা চেহারা দেখে অবাক, যেমন অবাক শাড়ি পরা প্রতিমাকে দেখে। রবীন্দ্রনাথের কিন্তু সে সবের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। লোকের এরকম তাকানো বা বক্রোক্তি তাঁর গা-সওয়া হয়ে গেছে।

কবির মনে পড়ল, প্রথমবার যখন ইংলণ্ডে এসেছিলেন, তখন গরমের সময় তাঁর মেজদাদা ঠিকই প্যাণ্ট-স্যুট পরে ঘোরাঘুরি করতেন, আর রবীন্দ্রনাথ অনেকবারই ধুতি-পাঞ্জাবী পরে লণ্ডনের পথে বেরোতেন। তখন তাঁকে দেখার জন্য রাস্তায় লোক জমা হয়ে যেত, তাদের ভাবটা, যেন মঙ্গলগ্রহের কোন অধিবাসী পৃথিবীতে বেড়াতে এসেছে। কিন্তু তাতে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি নিজের মনে রাস্তা দিয়ে ঠিকই চলতে শুরু করতেন।

প্রতিমা পশমী জামাকাপড়ের কাউণ্টার থেকে ইতিমধ্যেই দু জোড়া গ্লাভ্স্ ও একটি সোয়েটার পছন্দ করেছে। তারপর দাম দেবার বেলায় মিসেস মুডী বাধা দিলেন।

"মিঃ টেগোর, আমাকে দামটা দিতে দিন।"

"না, না, তা কী কোরে হয় মিসেস মুডী ! আপনি একেই আমাদের আশ্রয় দিয়ে কত কষ্ট স্বীকার করেছেন, আর তো কোন গিফ্ট নিতে পারি না। রথী, তুমি দামটা দিয়ে দাও," রবীন্দ্রনাথ

রথীকে নির্দেশ করলেন।

"আমি সে অর্থে বলিনি, মিঃ টেগোর। আপনার 'ব্রাইড মাদার'-এর জন্য আমার তো কোন গিফ্‌ট্‌ কেনা হয়নি, তাই। যাক গে, সে পরে দেখা যাবে। এখন চলুন, আমরা মিস্‌ মনরোর বাড়িতে যাই। ওর ওখানে তো লাঞ্চের নেমন্তন্ন আছে।"

প্রতিমার 'ব্রাইড মাদার' নাম রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া। তিনি যখন ওকে 'বৌমা' বলে সম্বোধন করতেন, তখন মিসেস মুডী, মিসেস সিমুরের মতোই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'বৌমা' কথাটির অর্থ কী। তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝিয়ে বললেন যে বৌমা হচ্ছে 'ডটার-ইন্‌-ল', তবে আক্ষরিক অর্থে 'বৌ-মা'-র মানে 'ব্রাইড্‌-মাদার'। সেই থেকে প্রতিমার প্রসঙ্গ উঠলেই মিসেস মুডী তাকে মাঝে মাঝে 'ব্রাইড মাদার' বলে অভিহিত করতেন।

হ্যারিয়েট মনরোর বাড়িতেই হচ্ছে 'পোয়েট্রি' পত্রিকার অফিস। বাড়ি মানে হচ্ছে চারটি ঘরের অ্যাপার্টমেণ্ট রাস্‌ ও ওহাইও স্ট্রীটের মোড়ে। এক ঘরে ওর মা থাকেন, আর এক ঘর মিস মনরোর শোবার ঘর। লিভিং রুম বাদ দিলে বাকি ঘরটিই 'পোয়েট্রি'র অফিস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন সদলবলে ওদের অ্যাপার্টমেণ্টে এসে পৌঁছলেন, তখন মিস মনরোই নন, ওর মা-ও ওদের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছিলেন। সঙ্গে ছিলেন 'পোয়েট্রি'র সহ-সম্পাদিকা।

মিস্‌ মনরোই দরজা খুলে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করলেন। "'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনের তরফ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি, মিঃ টেগোর। ইনি হচ্ছেন আমার মা. আর এই হচ্ছে 'পোয়েট্রি'র সহ-সম্পাদিকা অ্যালিস কর্বিন। মা, তুমি তো মিসেস মুডীকে চেনই।"

"হ্যাঁ," বলে তিনিও এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথ ও মিসেস মুডীর সঙ্গে করমর্দন করলেন। রবীথনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে সবাইকে

পরিচয় করিয়ে দিলেন।

"মিঃ টেগোর, আপনি এই বেতের আরাম-কেদারাটিতে বসুন," মিস মনরো বললেন, "এই চেয়ারটির একটু ইতিহাস আছে। আমাদের 'পোয়েট্রি' অফিসে যত কবি আসেন, তাদেরই আমি এই চেয়ারটিতে বসাই।"

"তাহলে চেয়ারটিরই মর্যাদা ভঙ্গ হবে। আমি তো ইংরেজী মহলে প্রতিষ্ঠিত কবি নই," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন।

"কী যে বলেন মিঃ টেগোর। 'পোয়েট্রি'র ডিসেম্বর সংখ্যায় আপনার কবিতা পড়ে সবাই উচ্ছ্বসিত। এই নিন, ভুলে যাবার আগেই আপনাকে অতিরিক্ত কপিগুলি দিচ্ছি। দেখুন, এজরা পাউণ্ড আপনার কবিতার কী সুন্দর ভূমিকা লিখেছে।"

"সত্যি, আমার কবিতা সম্পর্কে পাউণ্ডের উৎসাহের যেন শেষ নেই। লণ্ডনে থাকতে আমাকে খালি বলত, আমার বাংলা কবিতার অনুবাদ করে যেতে। 'গীতাঞ্জলি'র পরে 'দি গার্ডেনার' নামে যে পাণ্ডুলিপি রোদেনস্টাইনের হাতে দিয়ে এসেছি, সেটিও ওর পড়া হয়ে গেছে। বলেছে যে 'কোর্টনাইটলি' পত্রিকায় আমার কবিতা নিয়ে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখবে।"

"এজরা ওই রকমই। যাকে যখন ধরে তাকে আর ছাড়তে চায় না। জানেন তো, ও হচ্ছে আমাদের 'পোয়েট্রি' পত্রিকার বৈদেশিক প্রতিনিধি। এক রকম বলতে গেলে যেচেই ও এই পদ নিয়েছে। এখন 'ইমেজিসম' নামে কবিতা আন্দোলন শুরু করেছে। তাছাড়া ইয়েটস্-এর সেক্রেটারী হিসেবে তো কাজ করছেই। এই সংখ্যায় ও ইয়েটস্-এর কবিতাও সংগ্রহ করে পাঠিয়েছে। আপনি তো ইয়েটস্‌কে দেখেছেন লণ্ডনে, তাই না?"

"হ্যাঁ, ইয়েটস্-এর মতো বন্ধুবৎসল ব্যক্তি খুবই বিরল। আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয়না। উনিই তো আমার 'গীতাঞ্জলি' কাব্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন।"

"মিঃ টেগোর, আপনার বইয়ের এক আমেরিকান সংস্করণ এদেশে বার করা উচিত। তাহলে লোকে আপনার কবিতার সঙ্গে সম্যকভাবে পরিচিত হতে পারবে।"

"মিস মনরো, আপনারা আমার এই বইয়ের খুব বেশি গুরুত্ব দেবেননা," রবীন্দ্রনাথ লজ্জার সুরে বললেন, "এই সব ভক্তিমূলক গীতিকবিতার পাঠক সংখ্যা কখনোই খুব বেশী হবেনা।"

রথী বলল, "বাবা বলছেননা যে লণ্ডনের ম্যাকমিলান কম্পানী ইতিমধ্যেই এই বই সম্পর্কে আগ্রহ দেখিয়েছে।"

"তাহলে তো খুব ভাল হয়। নিউইয়র্কের ম্যাক্‌মিলানের সঙ্গে তো ওদের যোগাযোগ আছে। এখানেও তার একটি এডিসন বেরোতে পারে।"

ইতিমধ্যে লিভিংরুমে এক কোণায় লাঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে। মিস মনরোর মা-ই সব রান্না করেছেন। রবীন্দ্রনাথের জন্য পরিবেশন করা হয়েছে চিকেন স্যুপ, চিজ স্যাণ্ডুইচ ও নানা রকম ফলের প্লেট। একটি বিরাট পট্‌ভর্তি চা পাশের টেবিলে রেখে দেওয়া হয়েছে।

খেতে খেতে মিস মনরো বললেন, "মিঃ টেগোর, কী দুঃখের বিষয় যে আমাদের এই কবিতার পত্রিকা বেরোল আর উইলিয়াম মুডীও আমাদের মধ্যে থেকে চলে গেল। ও আজ বেঁচে থাকলে সব চাইতে খুসী হোত। আপনি ওর 'ফায়ার-ব্রিংগার' বইটি পড়েছেন কী?"

"না, এখনও আমার পড়া হয়নি। মিসেস মুডী গতকাল দিয়েছেন। কিন্তু শিকাগো ইউনিভার্সিটির ওই বক্তৃতাটি তৈরী করতেই সময় চলে গেল। আজ রাতে নিশ্চয়ই পড়ব।"

"পড়ে দেখবেন, কী রকম ক্লাসিক কাব্যধর্মী প্রতিভা ছিল উইলিয়ামের।"

সবাই চুপ করে রইলেন। উইলিয়াম ভন্ মুডী নেই, কিন্তু

তাঁর অনুপস্থিতি যেন কেউই ভুলতে পারেনা। না হ্যারিয়েট ভন্ মুডী, না হ্যারিয়েট মনরো। রবীন্দ্রনাথের মনে হোল তাঁর স্ত্রীও অনেকদিন হোল তাঁদের জীবন থেকে চলে গেছেন, তবু শান্তিনিকেতনে বা শিলাইদহে তাঁর অদৃশ্য উপস্থিতি যেন তিনি নিয়তই অনুভব করেন।

সেই রাত্রে রবীন্দ্রনাথ যখন উইলিয়াম ভন্ মুডীর 'ফায়ার ব্রিংগার' পড়ছিলেন, তখন বুঝলেন কেন তার বন্ধুবান্ধবরা তাঁর প্রতিভার এত প্রশংসা করেন। 'ফায়ার-ব্রিংগার'-এর মূল বিষয় গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া। সেই প্রমিথিউসের স্বর্গ থেকে মর্তের মানুষের জন্য আগুন চুরি করে আনা ও তার জন্য স্বর্গের প্রধান দেবতা জিউস-এর হাতে তার কঠিন শাস্তি পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথের সব চাইতে ভাল লাগল এই গ্রন্থের শেষ দৃশ্য যখন প্রমিথিউস, প্যাণ্ডোরাকে পিরহাস-এর কোলে রেখে কুয়াশাচ্ছন্ন পথে অদৃশ্য হওয়ার আগে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে বলছে ঃ

"O rude and dazed spirits ! ye shall grope
And wonder toward a knowledge and a grace
That now we dream not of ; then loneliness
Shall flee away, and enmity no more
Be spectral in the houses and the streets
Where walk your prinal hearts in the large
light
That floods the after-earth,
Out of these stones
I build my rumoring city, based deep
On elemental silence ; in this soil
I plant my cool vine and my shady tree
Whose roots shall feed upon the central
fire !"

পরের দিন রথীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার নেইস্-এর চেম্বারে গিয়ে দেখা করলেন। রথী আগেই চিঠি লিখে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় স্থির করেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ সেখানে যেতেই ডাঃ নেইস্ তাঁকে সাদরে নিজের ঘরে নিয়ে বসালেন। তারপর অনেকক্ষণ পরীক্ষা করে ও কবির বংশের রোগ-ইতিহাস জেনে নিয়ে অনেকগুলি পুরিয়া দিলেন। তিনি একটু অবাকই হয়ে গেলেন যখন শুনলেন যে ভারতে হোমিও-প্যাথি চিকিৎসার খুবই প্রচলন হয়েছে এবং এই মহলে তাঁর নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। বিদায় নেবার সময় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে রবীন্দ্রনাথ কেমন থাকেন তা জানাতে ওদের যেন ভুল না হয়।

শিকাগোতে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথ একদিন দুপুরে পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে অধ্যাপক লিউইস-এর বাড়িতে গেলেন। সেদিন ভীষণ ঠাণ্ডা পড়েছিল, তার মধ্যেই বাসে করে ওরা সেখানে গেলেন। কলিং বেলের শব্দ শুনে দরজা খুলেই মিঃ লিউইস দেখেন ওরা তিন জনে শীতে কাঁপতে কাঁপতে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

"আসুন, আসুন, মিঃ টেগোর," বলে তাড়াতাড়ি ওদের লিভিং-রুমে নিয়ে গিয়ে মিসেস লিউইসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ওদের মেয়ে কাছে আসতেই রবীন্দ্রনাথ তার হাতে একটি ছোট প্যাকেট দিলেন যার ভেতরে ক্যাণ্ডি ভর্তি।

"আপনি আবার এসব আনলেন কেন, মিঃ টেগোর," মিসেস লিউইস অনুযোগ করলেন।

"বাচ্চাদের মন জয় করবার আর কী সহজ উপায় আছে বলুন," রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

ওর কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

কবিকে সোফায় বসিয়ে অধ্যাপক লিউইস বললেন, "মিঃ টেগোর, সেদিন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার বক্তৃতা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটি প্রধান

জিজ্ঞাস্য আছে। সেটি হোল, পাশ্চাত্যের সভ্যতা কী শুধুই বস্তুতান্ত্রিক, তার মধ্যে কী আধ্যাত্মিক আদর্শবাদ নেই?"

"প্রফেসর লিউইস, আমার বক্তৃতায় যদি এই ধারনা সৃষ্টি হয়ে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত। আমি বিশ্বাস করি যে মানব-সমাজের যেখানেই আমরা যে কোন মঙ্গল দেখি না কেন, তার গোড়াতেই আধ্যাত্মিক শক্তি আছে। ইউরোপ-আমেরিকায় মানুষের আজ যে এত উন্নতি, সে উন্নতির মূলে মানুষের আত্মা আছে, এ শুধু জড়ো সৃষ্টি নয়। কেবল বস্তু-সঞ্চয়ের ওপর কেন জাতিই উন্নতিলাভ করতে পারেনা, যেমন শুধুমাত্র বিষয়-বুদ্ধির জোরেই কোন জাতি বললাভ করেনা। এর মূলশক্তি নিঃসন্দেহে ধর্মের জোর।"

"আপনার এই কথা শুনে আমি খুব আস্বস্তবোধ করছি। আমি মনে করি আমাদের এই সমাজ ধর্মের ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠিত। ম্যাসাচুসেটস্ ও পিলগ্রীমরা এসে যে সমাজ গড়েছিলেন, তার মূল কথাই ছিল ধার্মিক জীবন যাপন করা। আবার দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে এ-দেশের চিন্তা ও মনন ধর্মের বাঁধন থেকে মুক্ত হয়েই স্বাধীন চিন্তার পথ বেছে নিয়েছে।"

"কিন্তু যে ধর্মের কথাই বলুন না কেন অধ্যাপক লিউইস, আমাদের এ কথা ভুললে চলবেনা যে বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্ম 'টোটাল ম্যান্' বা মানুষের সমন্বিত জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা মাত্রা আমাদের সরন, প্রকাশন ও কর্মের সম্যক রূপায়ন বলেই সত্যধর্ম প্রকৃতপক্ষে মূর্ত হয়। জীবনে সমন্বয়, সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য উপলব্ধির পক্ষে এই তিন শক্তিরই প্রয়োজন।"

"আপনার কথা শুনে হার্বার্ট স্পেন্সারের জৈবিক অভিব্যক্তিবাদের কথা মনে পড়ছে।"

"আপনি ঠিকই ধরেছেন অধ্যাপক লিউইস। এককালে স্পেনসারের 'সমন্বিত দর্শন'বাদের দিকে আমি খুবই ঝুঁকেছিলুম। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখলুম তা শুষ্ক ও অনুভূতিশুন্য। ঈশ্বর সম্বন্ধে বোধহীনতা ও

স্পেনসারের অজ্ঞেয়বাদ আমার মনকে তৃপ্ত করতে পারলনা। আপনি কেয়ার্ড-এর লেখা পড়েছেন আশা করি। স্পেনসার যাকে কেবল কার্যকারনের ঘাতপ্রতিঘাতজাত ঘটনা বলেছেন, কেয়ার্ড তা মঙ্গলময় পরমেশ্বরের প্রকাশরূপ দেখেছেন। আমিও সেই কথা বিশ্বাস করি। মানব-ইতিহাসের বিবর্তনকে আমিও বিধাতার মঙ্গল ইচ্ছার অভিব্যক্তি হিসেবে দেখি।"

"মিঃ টেগোর, আপনার কথা শুনলে বুঝতে পারি মানুষের জীবনে ধর্ম কত জীবন্তরূপ ধারন করে। আপনার অস্তিত্বই যেন ঈশ্বরের এই মঙ্গলরূপ প্রচার করা।"

"ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না অধ্যাপক লিউইস, আমার লেখার মধ্য দিয়ে আমি কতটুকুই বা ঈশ্বরের লীলাময়তা ব্যক্ত করতে পারি। তাঁর প্রকাশ তো অবিজ্ঞেয় ও অমেয়, আর আমার ক্ষমতা অতিক্ষুদ্র, সমুদ্রে এক ফোঁটা জল ফেলার মতো।"

এমন সময় মিসেস লিউইস একটি ট্রে এনে ওদের সামনে ধরলেন। "মিঃ টেগোর, এই নিন, আপনাদের জন্য আমি একটু এগ্‌নগ্‌ তৈরী করেছি। আশাকরি খুব খারাপ হয়নি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বললেন, "মিসেস লিউইস, খুব ভাল হয়েছে। মিসেস মুডীর বাড়িতে আমি বেশ কয়েকবার এগ্‌নগ্‌ খেয়েছি।"

"সত্যি, কী দুঃখের কথা যে মিঃ মুডী এত তাড়াতাড়ি মারা গেলেন। আমরা শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ওর লেকচার শুনেছি। ওঁর নাটক তো শিকাগোতেও অভিনীত হয়েছিল।"

"হ্যাঁ, ওর মৃত্যু সত্যি আমেরিকান সাহিত্যের পক্ষে এক বিরাট ক্ষতি। গতরাত্রে আমি ওর কবিতা পড়ছিলুম। ওর প্রতিভার ব্যাপ্তি দেখে অভিভূত হয়ে গেছি।"

"মিসেস্ মুডী এখন ওর কেটারিং-এর ব্যবসার মধ্যে ডুবে থেকে সব ভুলে থাকতে চাইছেন। খুবই অসাধারণ মহিলা।"

তারপর হঠাৎ প্রতিমার দিকে তাকিয়ে মিসেস লিউইস জিজ্ঞাসা করলেন, "এক্সকিউজ মি, আপনার হাতে এই সাদা ব্যাঙ্গেল ও কপালে এই লাল চিহ্নের অর্থ কী?"

প্রতিমা হেসে যথারীতি শাখা ও সিঁদুরের অর্থ ব্যাখ্যা করল।

অধ্যাপক লিউইস বললেন, "মিঃ টেগোর, একটু পরেই কিন্তু আমাদের উঠে পড়তে হবে। আমি ওদের তিনটের সময়ে আপনার বক্তৃতার সময় ধার্য করতে বলেছি।"

প্রফেসর লিউইসের গাড়িতে করে ওরা ইন্‌স্টিচুটে যেতেই দেখেন শিক্ষক ও ছাত্রের এক বিরাট জনতা রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে মিসেস মুডীর বাড়ি এক আড্ডাস্থল হয়ে উঠল। শুধু হ্যারিয়েট মনরোই নয়, পোয়েট্রি পত্রিকার সহ সম্পাদিকা অ্যালিস কর্বিন ও তাঁর চিত্রশিল্পী স্বামী উইলিয়াম হেণ্ডারসন প্রায় নিয়মিতই সন্ধ্যেবেলায় এসে হাজির হতে লাগলেন। মিসেস মুডীর সঙ্গীতকার বন্ধু জোনাথান গারফিল্ড্ একদিন হাজির হলেন। রেভারেণ্ড ক্লিমেন্সও মাঝে মাঝে আসেন। মিঃ হেণ্ডারসনের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথকে একদিন সিটিং-এ বসতে হোল তিনি ছবি আঁকবেন বলে। পরে সবাই সেই ছবি দেখে প্রশংসা করেছিল।

তখন জানুয়ারী মাসের দুঃসহ ঠাণ্ডায় প্রায় প্রতি রাত্রেই বরফ পড়ত। সন্ধ্যেবেলায় ডিনার খাবার পর ফায়ার প্লেসের আগুনের উত্তাপে সব আলোচনা জমে উঠত। প্রধান বক্তা অবশ্যি রবীন্দ্রনাথ। এই রকম প্রত্যেক জমায়েতেই কবিকে তাঁর ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ বা 'দি গার্ডেনার'-এর পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু কবিতা পড়ে শোনাতে হোত। তারপর আসত গানের অনুরোধ। যদিও এসব গানের ভাষা ওরা বুঝতেন না, সুরও ইউরোপীয় সঙ্গীত থেকে একদম আলাদা, তবু

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠের যাদুতে ওরা মুগ্ধ, বুঝতেন এ সব গানে প্রকৃতি তথা ঈশ্বরের প্রতি প্রাণের আকুতি অনাবিলভাবে ঝরে পড়ছে। তন্ময় হয়ে ওরা সব শুনতেন।

কিন্তু এই সব জমায়েতে সাহিত্য ও সঙ্গীতের আলোচনাই শুধু হোতনা, রাজনীতির আলোচনাও উঠত। একদিন উঠল ভারতে বৃটিশ রাজের শাসন ও ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের ব্যবহার।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ভারতীয় জীবন আজ অনেক ভাবেই ক্ষুণ্ণ। হিন্দু ভারত তো বহুদিন ধরেই বিগত। তারপর যখন তুর্কি ও মোগল শাসন এল, তখনও শাসক ও শাসিতের মধ্যে এত ভেদাভেদ ছিলনা এখন যতটা আছে, কারণ তারা বিদেশী হলেও আস্তে আস্তে ভারতীয়ই বনে গিয়েছিল। এই দেশকে তারা নিজেদের দেশ বলে মেনে নিয়েছিল, চেয়েছিল তাদের বিদ্যাবুদ্ধিমতে দেশের কল্যান করতে। তারা আর আফগানিস্থান, তুরস্কে বা মধ্যএশিয়ায় ফিরে যেতে চাইলনা, এই দেশেই জীবন কাটাতে চাইল। কিন্তু ইংরেজ শাসন হোল অন্যরকম। তারা সবসময়েই ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা বিদেশী, তারা শাসক সম্প্রদায়। ভারতীয় সমাজের অংশ হওয়া তো দূরের কথা, পারত পক্ষে ভারতীয়দের ছায়া দেখতেও তারা নারাজ।"

"বৃটিশদের এই ব্যবহার এ দেশেও ছিল মিঃ টেগোর, যখন তারা ম্যানহাটন দ্বীপ দখল করে এদেশে জাঁকিয়ে বসল। তখন সেই বৃটিশ সমাজ ডাচ্ বা অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে মিশতে চাইতনা।"

"ঠিকই, কিন্তু আপনারা সবাইতো ইউরোপিয়ান, সাদা চামড়ার লোক। তাই কালক্রমে বৃটিশরা আর সব আমেরিকানদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশের লোকদের তামাটে চামড়া বলে কখনোই আমরা বৃটিশদের সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারিনি, আর বৃটিশরাও কখনো আমাদের হাত ধরে তাদের পাতে বসায়নি। সবচেয়ে দুঃখের বিষয় হোল আমাদের প্রতি বৃটিশদের হেয় মনোভাব, আমরা সব সময়েই সেকেণ্ড ক্লাশ সিটিজেন, প্রতিপদে আমাদের বুঝিয়ে দেয় যে আমরা

সমপংক্তির লোক নই, এক আসন নিচে বসাই আমাদের শ্রেয়।"

"কালার বার এদেশেও আছে মিঃ টেগোর," মিঃ হেণ্ডারসন বললেন। "নিগ্রোদের এখনও আমরা আমাদের সমাজে সমপর্যায়ভুক্ত করতে পারিনি, যদিও এব্রাহাম লিঙ্কন নিগ্রোমুক্তির ঘোষণা পঞ্চাশ বছর আগেই জাহির করেছিলেন।"

"সে আমি জানি এবং শিকাগোতে নিগ্রোদের দেখে তাদের অবস্থা আমি কিছুটা বুঝতে পেরেছি। তবু আপনাদের চেষ্টা আছে, আপনারা জানেন যে নিগ্রোরা এই সমাজেই আপনাদের সঙ্গে থাকবে, আফ্রিকায় ফিরে যাবেনা। তাই এই সমস্যা একদিন আপনাদেরই সমাধান করতে হবে। রথীর মুখে যে 'মেল্টিং পট্'-এর কথা শুনেছি, সেই মেল্টিং পটে তাদেরও এক করে নিতে হবে। কিন্তু ভারতে বৃটিশদের ব্যবহার একেবারেই অন্য। তারা আমাদের দূরেই সরিয়ে রাখতে চায়, কাছে টেনে নিতে চায়না। ভারতীয় জীবন আজ বৃটিশের বুটের তলায় নিস্পেশিত। কিন্তু এ অবস্থার একদিন পরিবর্তন হবেই, রাতের পরে দিনের মত আবার নতুন ভোরের সূর্য ঠিকই উঠবে।"

উপস্থিত সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের কথা শুনছিলেন।

এমন সময়ে নিগ্রো পরিচারিকা কফি ও কেক পরিবেশন করতে এল। মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার জন্য আজ আমি নিজে এই জিঞ্জারব্রেড-এর কেক তৈরী করেছি। খেয়ে ভাল লাগল কিনা বলতে হবে।"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু রন্ধনশিল্পীর কেক কী কখনো খারাপ হতে পারে ?"

রবীন্দ্রনাথের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।

এই জিঞ্জারব্রেডের কেকের একটু ইতিহাস আছে। মিসেস মুডীর কেটারিং ব্যবসা বলতে গেলে এই জিঞ্জারব্রেডের কেক দিয়েই শুরু হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর আগে মিসেস মুডী যখন শিকাগোর এক স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, তখন হঠাৎ শুনলেন যে মার্শাল ফিল্ড দোকানের 'টি-রুম'-এর অধিকর্তা মিঃ হ্যারি সেলফ্রিজ জিঞ্জারব্রেড দিয়ে

কেক তৈরীর জন্য লোক খুঁজছেন। হ্যারিয়েট মুডী সেই খবর পেয়েই স্কুলের পর সারারাত ধরে নিজের বাড়ির ছোট্ট উনুনে সেইসব একগাদা কেক তৈরী করে অর্ডার সাপ্লাই করলেন। সেই থেকেই শুরু হোল তাঁর 'হোম ডেলিকেসিস অ্যাসোসিয়েশন' নামে কেটারিং-এর ব্যবসা যার থেকে এই বাড়ি-গাড়ি ইত্যাদি সবই হয়েছে। এখন কথা চলছে লণ্ডনে তার এক ব্রাঞ্চ খোলার।

কফিতে চুমুক দিয়ে রেভারেণ্ড ক্লিমেন্স জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর, শুনলাম কাল আপনি ইউনিটেরিয়ান হল্-এ বক্তৃতা দেবেন। কিসের ওপর বলবেন?"

"ঠিক করেছি পাপের সমস্যা নিয়ে বলব," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "এব্রাহাম্ লিঙ্কন সেণ্টারেও কাল বক্তৃতা আছে। এই একই বিষয়ের ওপর বলব।"

"এটি খুব ভাল বিষয় হবে। খৃষ্টান ধর্মে পাপবোধ এক বড় জিনিষ। আমরা সবাই আদম ও ইভের পাপের ফলে স্বর্গোদ্যান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছি। খ্রাইষ্টকে তো আমাদের পাপের জন্যই ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়েছিল। হিন্দুধর্মেও কী পাপের এই ব্যাখ্যা?"

"না। খৃষ্টান ধর্মে পাপকে এক বিভীষিকা হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু উপনিষদের শিক্ষা হোল 'আনন্দং তদ্ ব্রহ্মং', জীবন আনন্দের আধার। সেখানে বলা হয়েছে যে অনন্ত আনন্দ-স্বরূপের সঙ্গে চিত্তের মিলন হওয়া মাত্রেই সমস্ত পাপ দূর হয় ও সমস্ত পূণ্য লাভ হয়।"

সেই কথাই রবীন্দ্রনাথ পরদিন তাঁর দুই বক্তৃতায় বললেন ঃ

"যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি জগতে পাপ আছে কেন, তাহলে যেন প্রশ্ন করা হবে জগতে অসম্পূর্ণতা আছে কেন, বা সৃষ্টিই বা কেন হয়েছে, বা আমরাই বা আছি কেন। আসল প্রশ্ন হচ্ছে ঃ এই অসম্পূর্ণতাই কী শেষ সত্য, পাপই কী চরম ও শেষ কথা?"

রবীন্দ্রনাথ নিজেই তার উত্তর দিলেন ঃ "না, বিস্ময় এই নয় যে পৃথিবীতে বাধা ও দুঃখ থাকবে, বরং এই যে আইন ও শৃঙ্খলা থাকবে,

সৌন্দর্য ও আনন্দ থাকবে, হিত ও প্রেম থাকবে। মানুষের মধ্যে যে ভগবান আছেন সেই বিশ্বাসই সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের বস্তু। সুখের মত দুঃখ বা বেদনা আমাদের জীবনে যেমন চিরস্থায়ী নয়, তেমনি পাপও নয়। পাপ সভতই অপসৃত হয়, এর ধারণাতীত বিশালতা সত্ত্বেও পাপ আমাদের জীবনের গতি রুদ্ধ করে না এবং আমরা দেখি যে জীবের জন্য মাটি, জল ও বায়ু সুমিষ্ট ও শুদ্ধই থাকে।

"জীবন যেমন মৃত্যুকে গুরুত্ব দেয় না, মৃত্যুর মুখের ওপরই সে নাচে, গান গায়, অন্যকে ভালবাসে, তার প্রধান কারণ মৃত্যু জীবনেরই অংশ, এ কখনো চূড়ান্ত বাস্তবতা নয়।

"আমরা যখন অনন্তের দিকে আমাদের লক্ষ্য স্থির করি, তখনই আমাদের সত্যদর্শন হয়। পাপ আমাদের জীবনের গতিকে স্তব্ধ করতে পারে না। পাপ চলে যায়, তাকে চলে যেতে হয়, যা থেকে ভালত্ব জন্মায়, পাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে লড়াই করতে পারে না। মানুষ পাপকে বিশ্বাস করে না, যেমন সে বিশ্বাস করে না যে বেহালার তারে বেসুরো আওয়াজই বেশী বেরোবে। জীবন হচ্ছে আশাবাদী, জীবন এগিয়ে চলতে চায়, মঙ্গলময়তা মানুষের জীবনের ধর্ম। এই হিত কিসে জন্মায়? যখন মানুষ তার বিশাল সত্তাকে বুঝতে পারে, তার নৈতিক প্রকৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে।

"যে জন মানবতার জন্য, আদর্শের জন্য বা রাষ্ট্রের জন্য বাঁচে, জীবন তার কাছে অর্থপূর্ণ, তখন বেদনার দাম অনেক কম। এই পুণ্যভাবে জীবন যাপনই হচ্ছে অনন্তকে পাওয়া। বুদ্ধ যেমন বলেছেন, মানুষ যখন তার ব্যক্তিসত্তাকে নিখিলের মধ্যে মিলিত করে তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছয়, তখন সে দুঃখের অতীত হয়। মানুষের বোঝা উচিত যে জীবনে শুধু যে বেদনা আছে তাই নয়, সেই বেদনাকে আনন্দে পরিবর্তিত করার শক্তিও তার আছে। পাপের ভেতর দিয়েই আমাদের পুণ্যের পথে যাত্রা করতে হয়, যেমন বেদনার ভেতর দিয়েই হয় আনন্দের পরিপূর্ণ উপলব্ধি।"

কয়েকদিন পরেই শিকাগো থেকে রবীন্দ্রনাথের নিউইয়র্ক রাজ্যের রচেষ্টার সহরে যাওয়ার কথা। 'ফেডারেশন অফ্ রিলিজিয়াস লিবারাল্স্'-এর তরফ থেকে কবির কাছে বক্তৃতা দেবার নিমন্ত্রণ এসেছে। রবীন্দ্রনাথ এটি আগ্রহের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা যতটা পারেন ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতার কথা বিদেশে প্রচার করা।

শুনে মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি এসে এতো তাড়াতাড়ি আবার যাবেন ভাবতেই পারিনি। যদি সম্ভব হোত তাহলে আমি আপনার সঙ্গে যেতাম। কিন্তু এখানে আমার বিজনেস দেখতে হচ্ছে। আপনি শরীরের প্রতি যত্ন নিতে ভুলবেন না।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "কিছু ভাববেন না মিসেস মুডী। এ শরীর অত সহজে যাবে না। কিন্তু তার জন্য আপনাদের ভোগান্তি তো কম করছি না।"

"অমন কথা বলবেন না মিঃ টেগোর। আপনি এ কয়দিন মাত্র এসেছেন, তাতেই আমাদের কী ভাল লেগেছে তা বলবার নয়। অবশ্যি আপনি প্রমিস্ করেছেন যে বস্টন থেকে ঘুরে এসে কয়েকটা দিন আমাদের কাছে থাকবেন।"

"আপনার যঁদি কোন কষ্ট না হয়, তাহলে আপনার আতিথ্য সানন্দেই গ্রহণ করবো," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

সত্যি, রবীন্দ্রনাথের এই কয়েকদিনের উপস্থিতিতেই মিসেস মুডীর মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আগে স্বামী উইলিয়ামের অকালমৃত্যুর জন্য সারাক্ষণ হা-হুতাশ করতেন, এখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসে জীবনের যেন এক নতুন্ উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়েছেন। বুঝেছেন যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের আপ্যায়ন করা, তাদের সৃষ্টিকর্মে সাহায্য করার জন্য মনোরম পরিবেশ তৈরী করার মধ্যে উইলিয়ামের ইচ্ছাই ফলবতী হবে, তাঁর স্মৃতি বেঁচে থাকবে।

॥ সাত ॥

রবীন্দ্রনাথ আর্বানায় থাকতেই বক্তা হিসেবে তাঁর যে সুখ্যাতি হয়েছিল, তারই সূত্র ধরে রচেষ্টারে অনুষ্ঠিত 'কংগ্রেস অফ্ দি ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ্ রিলিজিয়াস্ লিবারাল্স্' থেকে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ এল। এটি পেয়ে কবি খুবই খুশী হলেন। আর্বানা ও শিকাগোর পরে বাইরে ভারতের মর্মবাণী প্রচার করার এই হবে প্রথম সুযোগ। তারপর রচেষ্টারে থিওলজিক্যাল কলেজের খুব নাম আছে, বহু জাতি ও ধর্মসম্প্রদায়ের সমন্বয় সেখানে। তাদের সঙ্গে মেশার জন্য কবির প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠল। সহধর্মী ও সহমর্মী ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই উদ্‌গ্রীব।

রচেষ্টার সহর নিউইয়র্ক সহর থেকে তিনশ মাইলের ওপর। রবীন্দ্রনাথ যখন রথী ও প্রতিমার সঙ্গে ট্রেনে করে রচেষ্টারে পৌঁছলেন, তখন শীতের প্রকোপে সে সহর একেবারেই মুহ্যমান। রচেষ্টারে ভীষণ বরফ পড়ে। আর জানুয়ারীর শেষেই সেখানে ঠাণ্ডা পড়ে সবচাইতে বেশী। অনেক সময়েই থার্মোমিটারের পারা মাইনাস কুড়ি-ত্রিশ ডিগ্রির কাছে গিয়ে পৌঁছোয়।

কিন্তু শীতের সহর শিকাগো থেকে আসার পরে রবীন্দ্রনাথের আর তত কষ্ট হোল না। রেলওয়ে স্টেশনে রচেষ্টার থিওলজিক্যাল কলেজের অধ্যাপক জর্জ প্রেষ্টন্ রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। গাড়ি থামার পর রবীন্দ্রনাথ প্লাটফর্মে নামতেই তিনি এগিয়ে এসে বললেন, "ওয়েলকাম্ টু রচেষ্টার, মিঃ টেগোর। আর্বানার রেভারেণ্ড ভেইলের চিঠিতে আপনার কথা শুনেছি। আপনার জন্য সময় ধার্য হয়েছে কাল বিকেলে। আপনার বক্তৃতা শোনার জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।"

"সেটি আপনাদের অসীম অনুগ্রহ, রেভারেণ্ড প্রেষ্টন," রবীন্দ্রনাথ

সবিনয়ে বললেন।

"চলুন আপনাদের জন্য যে হোটেল রিজার্ভ করেছি সেখানে নিয়ে যাই। আজ সন্ধ্যেবেলায় সব অতিথিদের জন্য ব্যাঙ্কোয়েটের আয়োজন করা হয়েছে। আপনি যে হোটেলে থাকবেন সেখানেই এই ভোজসভা হবে।"

সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে যখন সেই হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে ঢুকলেন, তখন কবি দেখলেন যে হলঘর প্রায় ভর্তি হয়ে গেছে। রেভারেণ্ড প্রেষ্টন দরজার মুখেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথকে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার সঙ্গে একজন অতিথির পরিচয় করিয়ে দিতে চাই যিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য অতীব আগ্রহী। তাঁর পাশেই আপনাদের আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।" এই বলে রবীন্দ্রনাথকে একটু দূরে উপবিষ্ট এক সৌম্য বৃদ্ধের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, "অধ্যাপক অয়কেন, ইনি হচ্ছেন মিঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোর। মিঃ টেগোর, অধ্যাপক রুডল্‌ফ্‌ অয়কেন, নোবেল্‌ লরিয়েট্‌ ও জার্মানীর যেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিটিং প্রফেসর। উনিও এই সভায় বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন।"

"ওহ্‌ মিঃ টেগোর, আপনার সঙ্গে সাক্ষাতভাবে পরিচিত হয়ে আমি এতো আনন্দিত," প্রফেসর অয়কেন বললেন। "আপনার সঙ্গে পত্রালাপ তো কমদিন হোল না।"

"প্রফেসর অয়কেন, আমিও আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে পেরে কৃতার্থ," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "কেন, আমিও তো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েই যাচ্ছি। ফিলজফি ডিপার্টমেণ্টের প্রফেসর জেমস্‌ হফটন্‌ উড্‌স্‌ ওর সেমিনারে বক্তৃতা দেবার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন।"

"তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমার বাড়িতে আপনাদের ডিনারের নিমন্ত্রণ রইল।"

"তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

"মিঃ টেগোর, আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য আমি যে বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলাম তার প্রধান কারণ হচ্ছে আমি আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ পড়ে ভীষণভাবে মুগ্ধ। কী সুন্দর আপনার অনুভূতি, ঈশ্বরের প্রতি আপনার কী অনাবিল আকুতি! আশাকরি এই বই সম্পর্কে আমার যে মন্তব্য আপনাকে ডাকযোগে পাঠিয়েছিলাম তা আপনার ভাল লেগেছে। আমার স্ত্রী তো আপনার কবিতার ভীষণ ভক্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন।"

"সেটি হবে আমারই পরম সৌভাগ্য। প্রফেসর অয়কেন, জার্মানীর প্রতি আমারা ভারতীয়রা আজ গভীরভাবে ঋণী। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ করে বিশ্বসমাজে যেভাবে প্রচার করেছেন, তার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।"

"সত্যি, আমি যেদিন প্রথম কালিদাসের 'শকুন্তলা' পড়ি, আমার সে বিস্ময় আপনাকে ব্যক্ত করতে পারবো না। তারপর অবশ্য আমি উপনিষদ ও গীতা পড়েছি, দেখেছি হিন্দুধর্মের ভিত্তিভূমি কিরকম সনাতন ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।"

"এই জিনিষটি আমারও খুব অবাক লেগেছে অধ্যাপক অয়কেন। ইংলণ্ডে যখন ছিলুম, তখন অনেক ধর্মযাজকই অবাক হয়ে যায় আমরা সত্যধর্মের প্রতি কি কোরে আকৃষ্ট হতে পারি। আমাকে বলে, "তোমাদের 'টেন্‌ কমাণ্ড্‌মেন্ট্‌স্‌' নেই, তোমরা কি কোরে জানবে যে মিথ্যা বলা অধর্ম?' এরা ভুলে যায় যে উপনিষদের বা বৌদ্ধধর্মের প্রধান শিক্ষাই হচ্ছে কখনো মিথ্যাচারণ করবেনা ঃ 'মিথ্যা মা বদ,'—কদাচ মিথ্যাকথা বলবেনা।"

অধ্যাপক অয়কেন একটু বিষন্নের হাসি হেসে বললেন, "সবাই তো মাক্সমূলারের অনুবাদ পড়েনি যে জানতে পারবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার অবদান কতখানি। মনে হচ্ছে ভারত ও জার্মানী আজ

একই পথে চলেছে। সেটি হচ্ছে ধর্মের নবজাগরণের পথ। মিঃ টেগোর, এর খানিকটা দায়িত্ব আপনার ওপরও বর্তাচ্ছে কিন্তু। আপনি এখন এদেশে আছেন, ভারতীয় সভ্যতার প্রধান অবদান কিছুটা প্রচার করুন।”

“সে চেষ্টার আমি ত্রুটি করছিনা। এখানে আসার আগে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ভারতের আদর্শ নিয়ে এক বক্তৃতা দিয়ে এসেছি।”

“এখানে কী নিয়ে বলবেন?” অধ্যাপক অয়কেন জিজ্ঞাসা করলেন।

“জাতি সংঘাত নিয়ে বলব। আজকের পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে যে দ্বন্দ, যে সংঘর্ষ, ভারতের প্রাচীন শিক্ষার আলোকে কী ভাবে তা উপশম করা যায় তার ওপর বলব ঠিক করেছি।”

“এটি খুবই ভাল বিষয় হবে। আমি আগ্রহ নিয়েই আপনার বক্তৃতা শুনতে আসব।”

অধ্যাপক অয়কেনকে দেখে রবীন্দ্রনাথের তাঁর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা বারবার মনে হচ্ছিল। সেই সাদা চুলদাড়িসমন্বিত বৃদ্ধ, স্বভাবে শিশুর মত সরল আবার জীবনোৎসাহে সর্বদাই পূর্ণ। দুজনেই মহা দার্শনিক। গভীরতর অর্থের অন্বেষায় ব্যস্ত।

রচেস্টার সহরের ফার্স্ট ইউনিভার্সালিস্ট চার্চ-এ এই ধর্ম সম্মেলনের অধিবেশন বসেছিল।

পরের দিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা খুব আগ্রহভরেই তাঁর কথা শুনছিলেন। এই বক্তৃতায় কবি বললেন যে মানব-ইতিহাসে জাতি-সংঘাতের সমস্যা চিরদিনই রয়েছে। সকল বড় সভ্যতার মূলেই এই সংঘাত লক্ষ্য গোচর হয় এবং একে পাশ কাটিয়ে চলা ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন একটি ঐক্যসূত্র খুঁজে বার করা যা সব বৈচিত্র্যকেই এক করে গাঁথতে পারে। তাঁর মতে সেই অন্বেষনই হচ্ছে সত্যের অন্বেষন—বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টির অন্বেষণ।

"প্রাচীন কালে নানা প্রাকৃতিক বাধা, খাদ্যের অভাব বা অনুকূল স্থানের অভাব মানুষকে সন্দিগ্ধ বা স্বার্থপর করে তুলেছিল। কিন্তু সেই সময়েও ভারতবর্ষ তার বিশাল মহাদেশের বিপুল বৈচিত্র্যকে এক চিরন্তন আদর্শের মধ্যে বাঁধার চেষ্টা করেছিল, নানা ভাঙ্গা-গড়া ও সংকোচ-প্রসারণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েও এই ঐক্যসূত্রটি হারায়নি। আজ যে পৃথিবীর মানুষ আবার এই জাতিসংঘাতের সম্মুখীন হয়েছে, সে এক নতুন সুযোগও এনে দিয়েছে। আজ বিশ্বমানবের চেতনার মধ্যে মানুষের যে নবজন্ম হয়েছে, যে মহাআশ্বাস ধ্বনিত হচ্ছে, মানুষ্যত্বের উচ্চতর প্রকৃতি সেই ডাকে সাড়া একদিন দেবেই।

"এটি সত্য যে শক্তি ও জাতীয় গর্বের মদোন্মত্ত উম্মাদনায় অনেকেই সেই আহ্বানকে উপহাস করবে, তা শুন্য ভাবুকতা ও দুর্বলতার পরিচায়ক বলে উপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু এক সময়ে এই বোধ তার মানসপটে উদ্ভাসিত হবেই যে নিজের অন্তর্নিহিত সর্বোচ্চ সত্তাকে আঘাত করা আত্মহত্যারই সমতুল্য। যখন জাতীয় স্বার্থপরতা, পরজাতিবিদ্বেষ ও বানিজ্যের স্বার্থান্বেষণ অত্যন্ত অনাবৃতভাবে তাদের বীভৎসরূপ প্রকাশ করে, তখনই মানুষের উপলব্ধি হয় যে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে বা ব্যাপকতার বানিজ্যের আয়োজনে বা সামাজিক কোন যন্ত্রবৎ নতুন ব্যবস্থায় মানুষের মুক্তি নেই। জীবনের গভীরতর রূপান্তর সাধনে, চৈতন্যকে সর্ব বাধা হতে প্রেমের মধ্যে মুক্তিদানে এবং নরের মধ্যে নারায়ণের সম্পূর্ণ উপলব্ধিতেই মানুষের যথার্থ মুক্তি।"

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই ভাষণ শুনছিলেন। বক্তৃতার শেষে যে দীর্ঘ করতালি পড়েছিল তাতেই বোঝা গিয়েছিল যে উপস্থিত জনতা কত আগ্রহের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী গ্রহণ করেছিল। পরের দিন স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র 'খৃশ্চিয়ান রেজিষ্টার' লিখল যে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার ফলে সেই ধর্মমহাসভার সমস্ত সুর এক উচ্চগ্রামে উঠেছিল। পত্রিকার মতে তাঁর মতো অতো গূঢ়ভাবাপন্ন কথা আর কেউ বলেননি।

রচেষ্টার থেকে নিউইয়র্ক সহরে এসে রবীন্দ্রনাথ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার একটু নিরিবিলিতে কয়েকদিন থাকা যাবে। আগের বার আর্বানায় যাবার পথে মাত্র একদিনের জন্য এখানে ছিলেন, ভাল করে এ সহরটিকে দেখা যায়নি। এবার নিশ্চিন্ত মনে একটু ঘুরে নিউইয়র্কের চরিত্র খানিকটা বুঝতে পারবেন।

রথী ও প্রতিমার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'হোটেল আর্ল' নামে একটি হোটেলে উঠেছিলেন। লোয়ার ম্যানহাটনের এই জায়গাটি একটু খোলামেলা, আপার ম্যানহাটনের মতো অত স্কাই-স্ক্রেপার দিয়ে ভর্তি নয়। রবীন্দ্রনাথের এই সব উঁচু উঁচু বাড়ি একটুও ভাল লাগেনা। তাঁর মনে হয় যেন খাঁচার মধ্যে মানুষকে বন্দী করে রাখার প্রচেষ্টা এগুলি।

পরের দিন ওরা আর সব ট্যুরিষ্টের মতো নিউইয়র্ক সহর দেখতে বেড়োলেন। রথীকে কবি বললেন, "নিউইয়র্ক সহরের মিউজিয়াম খুব বিখ্যাত শুনেছি। চলো আজ দুপুরে সেখান থেকে ঘুরে আসি।"

তখন মিউজিয়ামের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম। ঘুরে ঘুরে ওরা তাই দেখলেন। এই সব ঐতিহাসিক জীবজন্তুর কংকাল দেখে কবির মনে হোল ঈশ্বরের সৃষ্টি এই পৃথিবীতে সব প্রাণীরই বাঁচার অধিকার আছে। অথচ আমরা মানুষ অজ্ঞানবশত তাদের শত্রু ভেবে নির্মূল করতে ব্যস্ত। ভুলে যাই যে নির্বিচারে তাদের হনন করলে আমাদের নিজেদের জীবনই রিক্ত হবে, আমরাই প্রকৃতির বৈচিত্র্য থেকে মুক্ত হবো।

মিউজিয়াম দেখার পর সেন্ট্রাল পার্কে ওরা ট্যাক্সি করে এলেন। এই একটি পার্ক যা ম্যান্‌হাটন দ্বীপের ঠিক মাঝখানে এক বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে।

পার্কের 'ডাক্ পণ্ড' তখন বরফে জমে স্কেটিং রিং-এ-পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা ঘুরে ঘুরে স্কেটিং করছে। গাড়ি থামিয়ে ওরা তা খানিকক্ষণ দেখতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ছাখো, সহরের মাঝখানে এমন বিশাল পার্ক

সবারই এখানে ভ্রমন করার অধিকার আছে, ঠিক যেমন লণ্ডনের হাইড পার্কে দেখেছিলুম। অথচ কলকাতার ইডেন গার্ডেন শুধু সাদা সাহেবদের জন্য রক্ষিত। নিজের দেশে থেকেও আমরা পরবাসী।"

রথী বলল, "শুধু ইডেন গার্ডেন কেন, কলকাতার চৌরঙ্গীর অনেক জায়গাতেই আমাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তার কারণ হিসেবে বলা হয় আমরা ভাল জিনিষ রাখতে পারিনা, আমাদের ব্যবহারে এসব নষ্ট হয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথ দুঃখের হাসি হেসে বললেন, "পরাধীনতার অভিশাপ যে অনেক, তা এই সব বাধা নিষেধ আমাদের যেন নতুন কোরে জানিয়ে দেয়।"

ট্যারি হ্যারল্ড স্কোয়ারের কাছে আসতেই ওরা সেখানে নেমে পড়লেন। এর কোণে রয়েছে 'মেসিস্' নামে বিখ্যাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর। রবীন্দ্রনাথের মনে হোল বিশালতায় এটি শিকাগোর 'মার্শাল ফিল্ড'-এর থেকেও বড়। এখানে ঢুকে প্রতিমা টুকিটাকি কিছু কিনল।

রথী একটু পরে বলল, "বাবা মশায়, চলুন স্কাই-স্ক্রেপারের ওপরে উঠে ম্যানহাটনের সবদিকটা দেখি।"

"রথী, ওই সব উঁচু বাড়িতে ওঠার আমার একটুও লোভ নেই। তুমি তো জানো এই সব স্কাই-স্ক্রেপার দেখে আমার মনে হয় মানুষ যেন খাঁচা তৈরী করে তার ভেতর থাকতে ভালোবাসে। তাই শান্তিনিকেতনে আমি চাই সব নিচু বাড়ি হোক যাতে আলো-বাতাস অনাবিলভাবে ঢুকতে পারে। উঁচু বাড়িতে উঠলেই আমার মনে হয় যেন প্রকৃতির স্পর্শ থেকে দূরে সরে আছি। তবে তোমরা যখন যেতে চাইছো তখন চলো।"

লিফ্‌টে করে ম্যানহাটনের সবচেয়ে উঁচু বাড়ির অবসারভেশন ডেকের ওপর দাড়িয়ে ম্যানহাটনের অনেকটা দেখা যায়। সিটি হল, ব্যাটারি পার্ক, ওয়াল ষ্ট্রীট এলাকা ইত্যাদি আশ্চর্যভাবে অতি নিকটে বলে মনে হয়।

রথী বলল, "ভাবা যায়না বাবা মশায় যে এককালে এইসব জায়গা একেবারে জঙ্গলে ভর্তি ছিল, শুধু ইণ্ডিয়ানদের 'টিপি' আর বুনো জন্তুতে ভরা ছিল। ডাচ্‌রা এসে সব পরিস্কার করে বসতি করল, তারপর ইংরেজরা এসে তাদের হটিয়ে সব দখল করে বসল।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠলেন, "ঠিক কলকাতার মতো আর কী! তবে কলকাতা সম্বন্ধে বলতে হয় যে ইংরেজরা নিজেরাই সব পরিস্কার করে ডোবা-নালা বুজিয়ে এই সহর তৈরী করেছে।"

ঘুরতে ঘুরতে ওরা ব্রুকলিন্ ব্রীজের কাছে এসে পড়লেন। কয়েক বছর আগেই এটি তৈরী হয়েছে ব্রুকলিন্ বরোর সঙ্গে ম্যানহাটনকে যুক্ত করার জন্য। এটিই হচ্ছে তখনকার সবচাইতে বড় সাস্‌পেন্‌শন ব্রীজ। তার ওপর দিয়ে গাড়ির স্রোত অনবরতই চলছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র যে যন্ত্রসভ্যতার তুঙ্গে উঠেছে এই ব্রুকলিন ব্রীজের ওপরে দাড়ালেই যেন তার খানিকটা হদিস পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভাল লাগল যখন বিকেল বেলায় পশ্চিমদিকে সূর্য অস্ত গেল। ম্যান্‌হাটন দ্বীপের স্কাই-স্ক্রেপারগুলির পেছনে লাল আভা বিচ্ছুরিত করে গগনদেব যখন সেদিনের মতো বিদায় নিলেন, রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হোল এমন দৃশ্যের বুঝি তুলনা মেলা ভার।

এই 'হোটেল আর্ল'-এ থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোদেন-স্টাইনের আমেরিকান বন্ধু জন্ জে. চ্যাপমানেরআলাপ হোল যার সাথে কবি আগের বার নিউ ইয়র্কে থাকার সময়ে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলেন। চ্যাপমানও সাহিত্যিক—প্রবন্ধ ও নাটক লেখেন। আগে আইনজীবী ছিলেন, এখন সেই পেশা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত হতেই চ্যাপমান বললেন, "মিঃ টেগোর, আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনি যখন নিউইয়র্কে এসেছিলেন, আমি তখন ম্যাসাচুসেট্‌স্-এ ছিলাম। উইল্-এর চিঠিতে জানলাম যে আপনি একজন ভারতীয় কবি। আমিও অবশ্যি আগে কবিতা ও গান

লিখেছি, কিন্তু প্রবন্ধ ও নাটক লেখাতেই এখন আমার বিশেষ উৎসাহ।”

রবীন্দ্রনাথ বললেন, “আপনার সঙ্গে দেখছি আমার অনেক ব্যাপারে মিল। আমিও নাটক ও প্রবন্ধ লেখায় কবিতার মতই উৎসাহ পাই।”

“রোদেনস্টাইন লিখেছে যে আপনার ‘সং অফারিংস্’ বলে কাব্যগ্রন্থ ইতিমধ্যে ইংরেজীতে প্রকাশিত হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্য যে এটি পড়ার সুযোগ এখনও আমার হয়নি। শুনলাম আপনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে যাচ্ছেন। কী নিয়ে সেখানে বলবেন?”

“আমার বলার পুঁজি তো সামান্যই মিঃ চ্যাপমান। তবে ছেলেবেলা থেকে উপনিষদের গ্রন্থগুলি থেকে যা শিখেছি, সেইগুলির ওপর ভিত্তি করে কিছু বলতে পারি। আমার মনে হয় পশ্চিমে আমরা যে ভোগবাদের আধিক্য দেখছি, সেখানে উপনিষদের ত্যাগের বাণী প্রচার করা হয়ত অসমীচীন হবেনা।”

“মিঃ টেগোর, আমার মনে হয় আমরা এই প্রাচ্যের বাণী ইদানীং যেন একটু বেশীই শুনতে পাচ্ছি। আপনি আবদুল বাহার নাম শুনেছেন? তিনি তাঁর পিতার বাহাই ধর্ম প্রচার করতে কিছুদিন আগে এখানে এসেছিলেন।”

“হ্যাঁ, আমি আর্বানায় থাকতে রেভারেণ্ড ভেইল-এর মুখে তাঁর কথা শুনেছি।”

“আশাকরি আবার আমাদের দেখা হবে মিঃ টেগোর,” মিঃ চ্যাপমান যেন তাড়াতাড়িই উঠে পড়লেন। “উইল্ রোদেনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাত হলে আমার কথা বলবেন।”

এই সাক্ষাতের বিবরণী যখন রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে পরের চিঠিতে লিখলেন, তখন তিনি মিঃ চ্যাপমানের সজোর ব্যক্তিত্বের প্রশংসাই করলেন। কিন্তু রোদেনস্টাইন তো জানেন যে রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই সেরকম ব্যক্তি হতে পারবেন না। তাঁর শান্ত ও নম্র স্বভাবের

জন্য হয়ত কোন কোন স্থানে একটু অসুবিধের মধ্যেই পড়েন, তবু তাঁর স্বভাব ও চরিত্রকে তো পরিবর্তন করতে পারেননা, তিনি যা তাঁকে সেইভাবেই নিতে হবে।

চ্যাপমান রোদেনস্টাইনকে লিখলেন যে রবীন্দ্রনাথকে দেখে তাঁর মনে হোল যে তিনি যেন একটু অসুস্থ। তাঁর কণ্ঠস্বরও চ্যাপমানের বিশেষ ভাল লাগেনি। তাঁর মনে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ বড় বেশী নীতিবাদী, 'ফুল্ অফ্ হট্ হাউস্।'

কিন্তু বন্ধু-বান্ধবহীন নিউ ইয়র্ক সহর রবীন্দ্রনাথের আর ভাল লাগছিল না, বিশেষ করে আর্বানা ও শিকাগোয় জমাটি অড্ডার পর। হোটেল থেকে সেদিন রাত্রেই মিসেস্ মুডীকে ফোন করলেন, "মিসেস্ মুডী, আমি রবীন্দ্রনাথ টেগোর বলছি।"

"কেমন আছেন আপনি?"

"বিশেষ ভাল নেই।"

"মিঃ টেগোর, আপনি এখন কোথায় আছেন?"

"নিউইয়র্ক সহরে, এবং আপনার সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে মনস্তাপে দিন কাটাচ্ছি। আপনার নিউ ইয়র্কে আসার কি হোল?"

"মিঃ টেগোর, আমি আমার বিজনেসের ব্যাপারে আটকা পড়ে আছি। আপনারা কোথায় উঠেছেন?"

"হোটেল আর্ল-এ।"

"ওয়েল, আমি গেলে আপনারা আমার গ্রীনিচ ভিলেজের অ্যাপার্টমেন্টেই উঠবেন। আমি তিন-চার দিনের মধ্যেই যাবার চেষ্টা কোরবো।"

সেই কথামতো কয়েক দিনের মধ্যেই মিসেস মুডী নিউ ইয়র্কে এসে গেলেন। তারপর ঠাকুরদের সবাইকে ওর গ্রীনিচ্ ভিলেজের ওয়েভারলি প্লেসের অ্যাপার্টমেণ্টে তুললেন।

যদিও তিনি শিকাগোতে থাকেন, তবু নিউ ইয়র্ক সহরের এই অ্যাপার্টমেণ্ট মিসেস মুডী ছাড়েননি। স্বামী উইলিয়ামের বড় প্রিয়

ছিল এটি। এইখানে তিনি তাঁর অনেক সাহিত্যিক বন্ধু-বান্ধবদের আপ্যায়ন করেছেন। মুডীরা নিউইয়র্কে এলেই তাঁদের ঘিরে সাহিত্যিকদের আড্ডা বসত।

এই বাড়ির সর্বত্রই উইলিয়ামের স্মৃতি জড়ানো। মনে হয় কিছুদিনের জন্য বাইরে গেছেন, এই আবার ফিরবেন। কিন্তু তিনি তো আর ফিরে আসবেন না, জীবনের পরপারে সবার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন তিনি।

মিসেস মুডীর জীবনের সবচাইতে করুণ মুহূর্ত হচ্ছে উইলিয়ামের উদ্দেশ্যে সমুদ্রতীরে স্মৃতিতর্পন যা পরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর দশ দিন পরে হ্যারিয়েট তাঁর ননদ শার্লট মুডী ও তাদের পরমবন্ধু ফার্দিনাণ্ড স্কেভিল্-এর সঙ্গে উইলিয়ামের চিতাভস্ম একটি আধারে নিয়ে নিউইয়র্ক সহরে এসেছিলেন। সেখানে কবি রিজ্‌লি টরেন্স-ও যোগ দিলেন ওদের সঙ্গে।

পরের দিনটি ছিল মেঘ-রৌদ্র মিশ্রিত ও কন্‌কনে হাওয়া ভর্তি। পেন্‌সিল্‌ভেনিয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে করে ওরা ফার্‌ রক্‌ওয়েতে এলেন এবং সেখান থেকে আটলান্টিক সমুদ্র-সৈকত হেঁটেই চলে এলেন। এখানে উইলিয়ামের ছুই বন্ধু বালুতীরের টুকরো কাঠ জড়ো করে গ্রীক্ 'মিথলজি'র অনুসরণে আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর ভারী কম্বলে নিজেদের জড়িয়ে তারা সেই আগুনের চারিপাশে বসে পড়লেন এবং স্কেভিল ও টরেন্স উইলিয়াম মুডীর 'ফায়ার ব্রিংগার' কাব্যগ্রন্থ পরপর পড়ে চললেন। হ্যারিয়েট মুডী পড়লেন বাইবেল থেকে ৯১ নম্বর 'সাম'। তারপর স্কেভিল ঢেউয়ের একেবারে কাছে গিয়ে সেই ফেনিল ও উত্তাল সমুদ্রের উদ্দেশ্যে উইলিয়ামের চিতাভস্ম সমর্পণ করলেন।

তার অনেক দিন পরেই আবার হ্যারিয়েট মুডী নিউইয়র্কে এলেন। এই অ্যাপার্টমেণ্টের কথা তিনি যেন মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। এখন রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আবার সেই সব কথা তাঁর

মনে এল।

সেদিন রাত্রে ডিনার টেবিলে কবি রিজ্‌লি টরেন্স-ও যোগ দিলেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হবার পরই তিনি বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' আমি ইতিমধ্যেই পড়েছি। অপূর্ব হয়েছে, ইংরাজী সাহিত্যে এমনটি আর লেখা হয়নি। আপনি এখন কি লিখছেন?"

রবীন্দ্রনাথ একটু ইতঃস্তত করে উত্তর দিলেন, "গীতাঞ্জলি' পর্যায়ের আরো কিছু কবিতার ইংরেজী তর্জমা করছি। এর অধিকাংশই লেখা হয়েছিল গীতাঞ্জলির আগে। তাই একটু সংকোচ বোধ হচ্ছে পাঠক পাঠিকাদের ভাল লাগবে কিনা।"

"আপনি এ নিয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না। আপনার এই সব কবিতা যেন অন্য এক জগতে নিয়ে যায়, আমাকে বার বার বাইবেলের 'সাম্' এর কথা মনে করিয়ে দেয়। কী নাম দিয়েছেন বইটির?"

"ভাবছি নাম দেবো 'ফ্রুট্ গ্যাদারিং'।"

"খুব তাৎপর্যপূর্ণ নাম হবে। হ্যারিয়েটের কাছে শুনলাম আপনি শিশুদের নিয়ে লেখা কিছু কবিতারও অনুবাদ করেছেন। এই বইটির কী নাম দেবেন?"

"ক্রেসেণ্ট্ মুন্' নাম দেবো ঠিক করেছি।"

"অপূর্ব নাম। আপনি এর থেকে একটু পড়ে শোনান প্লিজ।"

রবীন্দ্রনাথ তখন পাশের ঘর থেকে তাঁর খসড়ার খাতাটি নিয়ে এলেন। ফায়ার প্লেসের তপ্ত আলোর সামনে সবাই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বসলেন। হ্যারিয়েটের মনে পড়ল এমনি করে এই অ্যাপার্টমেণ্টে কত রাত্রে উইলিয়ামকে ঘিরে কবিতা পড়া হোত, সাহিত্য আলোচনায় রাত ভোর হয়ে যেত। সে সব কথা ভাবতেই হ্যারিয়েটের চোখের কোনে জল এসে গেল।

রবীন্দ্রনাথের পড়া শেষ হয়ে গেল। কবিতাগুলির আবেশ যেন কুয়াশার মতো ওদের ঘিরে রাখছিল। নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে মিসেস্ মুডী

টরেন্সকে অনুরোধ করলেন তাঁর লেখা থেকে কিছুটা পড়ে শোনাতে। টরেন্স তখন তাঁর 'লাইট্' কবিতাটি পড়ে শোনাতে লাগলেন। সবাই মোহমুগ্ধের মতো সেই লাইনগুলি শুনছিলেন :

"Not this light, not the lightfall on earth, on sea
or on meadow,
But the light at light's heart, the unfading, the
light without shadow.
Yes, the light that falls in the darkness on land
and sea medow,
This broken, this exile splendor that wanders in shalow.
Yes this earth, yes this hope, yes this love, joy and
grief for the lover
Yes these opbs, homs, faces, these dreams that a
dream may recover".

রথী ও প্রতিমা ছাড়া মিসেস্ মুডীও সঙ্গী হলেন রবীন্দ্রনাথের বোস্টন যাত্রায়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিলজফি ডিপার্টমেণ্টের অধ্যাপক জেমস্ হর্টন্ উড্স্ এর আমন্ত্রণে তিনি সেখানে যাচ্ছেন, তাঁর সেমিনার ক্লাশে বক্তৃতা দেবার জন্য।

রেল স্টেশনে প্রফেসর উডস্ নিজেই এসে ওদের স্বাগত জানালেন। তারপর নিয়ে গেলেন হার্ভার্ড-এর ফেল্টন্ হল-এ যেখানে ওদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

পরের দিন অধ্যাপক উডস্-এর ক্লাশে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত হলেন বক্তৃতা দেবার জন্য। ক্লাশে ছাত্র সংখ্যা খুব কমই ছিল। অধ্যাপক উডস্ যেন তার জন্য একটু লজ্জিতই হলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তাতে ভ্রুক্ষেপ ছিলনা, কারণ শান্তিনিকেতনে এর থেকে ছোট ক্লাশেও তিনি অনেক গুরুগম্ভীর বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তাঁর বক্তৃতার বিষয়

হচ্ছে ‘দি প্রব্লেমস্ অফ্ ইভিল্’, যে ভাষণ তিনি শিকাগোতে ইতিমধ্যেই দিয়ে এসেছেন।

সেই কথাই এখানে আবার বললেন। ‘ইভিল্’ বা পাপবোধ খৃষ্টান ধর্মতত্ত্বের এক বড় বিষয়। খৃষ্টান ধর্মের মতে আমরা জন্মমাত্রই পাপী, ‘উই আর অল্ সিনারস’। একমাত্র যিশুর ভজনা করেই আমরা তা থেকে ত্রাণ পেতে পারি। খৃষ্টের প্রদর্শিত পথই হচ্ছে একমাত্র মুক্তির উপায়। তাঁর শরণ নেওয়া ছাড়া আমাদের আর গতি নেই, কারণ পাপের বেতন হচ্ছে মৃত্যু।

এখানেও রবীন্দ্রনাথ বললেন যে পাপ জীবনের শেষ কথা নয়। পাপ অপসৃত হয় যখন মানুষ আনন্দের পূর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। বাঁচতে গেলে আমরা যেমন পাপকাজ করি, তেমনি পুণ্যকর্মও করি, দুইই হচ্ছে আমাদের জীবনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ। পাপবোধ জীবনে থাকবে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সে চিরস্থায়ী নয়। মানুষ যখন আনন্দরূপ ব্রহ্মের সন্ধান পায়, যখন সে ঈশ্বরের চরণে সম্পূর্ণরূপে প্রাণ-মন সমর্পণ করে, তখন সে সত্যিকারে পাপমুক্ত হয়।

সেদিন রাত্রে অধ্যাপক উডস্-এর বাড়িতে রথী, প্রতিমা ও মিসেস মুডীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ডিনারের নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়িতে ঢুকতেই মিসেস উডস্ এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করে ওদের লিভিং রুমে নিয়ে বসালেন। কবি দেখলেন যে ফায়ার প্লেসে গনগন্ করে আগুন জ্বলছে।

ডিনার খেতে খেতে অধ্যাপক উডস্ বললেন, “মিঃ টেগোর, আপনার আজকের বক্তৃতা আমার ভীষণ ভাল লেগেছে, বিশেষ করে পাপের এই নতুন ব্যাখ্যায়। আশা করি এই বক্তৃতাগুলি যথাসময়ে প্রকাশ করবেন। বই আকারে ছাপা হলে শিক্ষিতমহলে আপনি অনেক পরিচিত হবেন।”

“আর বেশী পরিচিত হবার প্রয়োজন নেই প্রফেসর উডস্। লোকের ভীড় বা সভাসমিতির আমন্ত্রণ আমি বিশেষ সহ্য করতে পারিনা, যদিও প্রয়োজনের খাতিরে অনেক সময়েই তা মেনে

নিতে হয়।”

“না না, আপনার বক্তৃতার যে আদর্শপূর্ণ ভাব আছে, সেগুলির প্রকাশ করা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন। আপনি জানেন কিনা জানিনা যে হার্ভার্ড ও আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই এখন প্রাগ্‌মাটিজ্‌ম্‌-এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। যদিও এতে বিজ্ঞান সাধনার সুবিধে হতে পারে, কিন্তু আদর্শবাদও যে জীবনে প্রয়োজন তা অনেকেই ভুলতে বসেছে।”

“সে কী, আমেরিকানরা কাজ নিয়ে এত মত্ত থাকে বলে আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ তো এদের জীবনে আরও বেশী দরকার, নইলে এরা কাজের ভেতরকার অর্থই খুঁজে পাবেনা।”

“সেই কথাই আমার বক্তৃতায় আমি বলি। কিন্তু হার্ভার্ডে এখন বিজ্ঞানীদেরই প্রভাব বেশী। এরা বুঝতে পারেন না যে অতিরিক্ত প্রাগ্‌মাটিজ্‌ম্‌-এর চর্চা করলে বিজ্ঞান সাধনাও ব্যাহত হবে। যাই হোক, আপনার ছেলে আমাকে বলছিল যে বাংলাদেশে আপনি এক স্কুল স্থাপন করে অভিনব পদ্ধতিতে সেখানে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেছেন।”

“কিছুই অভিনব নয় প্রফেসর উডস্‌। ভারতে শিক্ষা বলতে মনে হয় ফ্যাক্টরী থেকে এক ছাচে সব বেরিয়ে আসছে। আমি চেষ্টা করছি প্রকৃতির মুক্তির মধ্যে বাস করে কিভাবে আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য অর্থের প্রয়োজন। যতটা এক্সপেরিমেন্ট করবো ভাবি, অর্থাভাবে তার সিকিটিও করতে পারিনা।”

“কিন্তু মিঃ টেগোর, আপনি এত সুন্দর বলেন। আপনি যদি আর কিছুদিন থাকেন তাহলে পাবলিক্‌ লেকচার দিয়ে আপনার কিছু অর্থাগম হতে পারে।”

“আমার এত অল্প সময়ের অবস্থিতির মধ্যে পাবলিক্‌ লেকচারের আয়োজন কী হয়ে উঠবে প্রফেসর উডস্‌,” রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

কিন্তু শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থাগমের কথাটি রবীন্দ্রনাথকে চঞ্চল

করে তুলল। আর কবির যা স্বভাব, সঙ্গে সঙ্গে এই কাল্পনিক টাকা কি ভাবে খরচা করবেন তার খসড়া করতে অধিক বিলম্ব হোলনা। সেই রাতেই ফেল্টন্ হল্ থেকে শান্তিনিকেতনের সর্বাধ্যক্ষ জগদানন্দ রায়কে লিখলেন, "ওখানে একটা টেকনিক্যাল বিভাগ স্থাপন করা, দুই-একটা ল্যাবরেটরির পত্তন করা, পাকশালের সংস্কার এবং হাসপাতালের প্রসারসাধন খুব দরকার মনে করি। ···আমার ইচ্ছা ওখানে দুই-একজন যোগ্য লোক এক-একটি ল্যাবরেটরি নিয়ে যদি নিজের মনে পরীক্ষার কাজে প্রবৃত্ত হন তাহলে ক্রমশ আপনিই বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হবে। এখানে কয়েকজন খুব ভালো বাঙালি ছাত্র বিজ্ঞান ও দর্শন অধ্যায়ন করছেন।···আমি যদি এদের মতো লোক দিয়ে ওখানে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বালোচনার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পারি তাহলে সেটা ক্রমশ খুব বড়ো হয়ে উঠতে পারে। এইটাই আমার অনেক দিনের সংকল্প—জ্ঞানানুশীলনের একটা হাওয়া বইয়ে দেওয়া চাই—সেই হাওয়া নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে করতে ছাত্রদের মন আপনিই অলক্ষিতভাবে বিকাশলাভ করতে পারবে।" কিন্তু যখনই বুঝলেন যে কল্পনার রথ অনেকদূর এগিয়ে গেছে, অমনিই তার রাশ টেনে ধরে চিঠির শেষে লিখলেন, "এটা আমার আশা মাত্র—যদি সফল হয় তো ভালই, যদি না হয় তাহলে মায়াবিনীকে বিসর্জন দিতে কোন খরচ নেই।"

এই ফেল্টন্ হলে থাকার সময়েই ব্রিটিশ কবি অ্যাল্‌ফ্রেড্ নয়েস্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন যখন কবি তাঁর ঘরে একা বসে চিঠি লিখছিলেন। নয়েস্ 'দি ফ্লাওয়ার অফ্ জাপান,' 'দি কলেক্‌টেড্ পোয়েমস্' ও 'ড্রেক' নামে কাব্য লিখে ইতিমধ্যেই যশস্বী হয়েছেন। উনিশষ দুই সালে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'দি লুম্ অফ্ ইয়ারস্' প্রকাশিত হয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছিল যখন তাঁর বয়েস ছিল মাত্র বাইশ বছর।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত হতেই নয়েস্ বললেন, "মিঃ টেগোর,

আপনার ‘গীতাঞ্জলি’ পড়ে আমি ভীষণ মুগ্ধ যা আমার এক বন্ধু লণ্ডন থেকে পাঠিয়ে দিয়েছে। কী অপূর্ব গীতিকাব্যের প্রকাশ, ভাবের মুর্ছনা।”

নিজের কবিতার প্রশংসায় স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। একটু চুপ করে থেকে বললেন, “এক কবির কবিতা যদি আর এক কবিকে আন্দোলিত করে, তার থেকে বড় পুরস্কার আর নেই।”

“সত্যি, এই কবিতাগুলি পড়ে আমার কাছে এক নতুন জগত খুলে গেল। ভেবেছিলাম আপনাকে আমার কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনাবো, কিন্তু আপনার কবিতা কাল রাতে আবার পড়ার পর সেগুলি শোনাতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে।”

“না না, আপনি অনুগ্রহ করে আপনার কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনান। আমেরিকায় থাকতে কজন কবিরই আর দেখা পেলুম! কই, টরেন্স ছাড়া আর কোন কবির স্বকণ্ঠে কবিতা শোনার সৌভাগ্য এখনো আমার হয়নি।”

নয়েস্ তখন তাঁর ‘দি কলেক্‌টেড্ পোয়েম্‌স্’ থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন।

রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বললেন, “মিঃ নয়েস, এতো অল্প বয়সে আপনার কবিতার এতো পরিণতিবোধ দেখে বিস্মিত হতে হয়। আপনার কবিতা শুনে আমার বারবার এজরা পাউণ্ডের কথা মনে পড়ছিল। আপনি ওর ‘personae’ বইটি পড়েছেন?”

“না, সেটি পড়ার সৌভাগ্য এখনও হয়নি।”

“সুযোগ পেলেই পড়ে দেখবেন। ও আমাকে একটি কপি আর্বানায় থাকতে পাঠিয়েছিল।”

“মিঃ টেগোর, আপনি আপনার কবিতার নতুন কোন ইংরেজী অনুবাদ করেছেন কী? করে থাকলে অনুগ্রহ করে তার দু-একটি পড়ে শোনান।”

রবীন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করে বললেন, "'শিশু' বলে ছোটদের জন্য কিছু কবিতা বাংলায় লিখেছিলুম যা ইলিনয়ে থাকতে অনুবাদ করেছিলুম। কিন্তু আপনার বোধহয় সেগুলি ভাল লাগবেনা।"

"'গীতাঞ্জলি'র কবির সব লেখাই আমার ভাল লাগবে, মিঃ টেগোর।"

রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে তখন 'ক্রেসেন্ট্ মুন' থেকে কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালেন। পাঠশেষে মিঃ নয়েস উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, "ওহ্, মিঃ টেগোর, এগুলি অপূর্ব হয়েছে। প্রকাশের কি কোন ব্যবস্থা করেছেন?"

"লণ্ডনেই আমার শিল্পীবন্ধু মিঃ উইলিয়াম রোদেনস্টাইন 'গীতাঞ্জলি'র জনসংস্করণ ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে ছাপানোর ব্যবস্থা করছেন। ওরা সেটি ছাপাতে রাজী হলে আমার বাকি বইগুলিও বোধহয় ছাপাতে রাজী হবে।"

"ছাপাবে ওরা ঠিকই। আপনার এই কবিতাগুলি পড়ার পর ওরা যদি এটি না ছাপায়, তাহলে আমি ওদের মূর্খ বলবো। কিন্তু আমার একটি অনুরোধ আছে। আপনার এই কবিতাগুলি যখন কাব্যাকারে বেরোবে, তখন অনুগ্রহ করে দেখবেন এগুলি যাতে ছবিশুদ্ধ বেরোয়। তাহলে বইটি আরও আকর্ষণীয় হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ওর কথায় হাসলেন। "মিঃ নয়েস, অপনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি, আমার ভালোর দিকটা ইতিমধ্যেই দেখতে শুরু করেছেন। কিন্তু ছবি আঁকার লোক কোথায় পাবো? রোদেনস্টাইনকে বলতে পারিনা, ছবির কমিশন নিয়ে তিনি এখন ভীষণ ব্যস্ত। দেশে আমার দুই শিল্পী ভ্রাতুষ্পুত্র আছে বটে, দেখি তাদের বলে রাজী করাতে পারি কিনা।"

আর কিছু কথা বলার পর মিঃ নয়েস রবীন্দ্রনাথের সময়ের জন্য অনেক ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিলেন।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময়ে রবীন্দ্রনাথের এখানকার বিখ্যাত অধ্যাপক এলারী-সেজ্উইক্ ও জোসিয়া রয়েস্-এর সঙ্গেও সাক্ষাতকার

হোল। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিচয় হোল এখানে একদল বাঙালী ছাত্রের সঙ্গে যারা তখন হার্ভার্ড-এ পড়াশুনো করছিল। এদের মধ্যে দর্শনের ছাত্র নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র যতীন্দ্রনাথ শেঠ ও ব্যবহারিক রসায়নের ছাত্র হীরালাল রায়ই ছিলেন প্রধান।

এরা সবাই যখন দলবেঁধে ফেল্টন্ হলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এল, তখন ওদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তই মুখপাত্র হিসেবে বলল, "রবিবাবু, আপনি আসাতে আমরা যে কী খুসী হয়েছি তা বোঝাতে পারবো না। এতদূর বিদেশে যে আপনার দেখা পাবো তা ভাবতেই পারিনি। আমরা স্টুডেন্ট সেন্টারে আগামীকাল আপনার জন্য একটি ছোট সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছি, আপনার সেখানে অনুগ্রহ করে আসতেই হবে।"

"সে তো ভালো কথা। আপনাদের সঙ্গে আমিও পরিচিত হতে চাই। ঠিক আছে, যথাসময়ে আমাকে নিয়ে যাবেন।"

সেই কথা অনুসারে পরের দিন বিকেলে রবীন্দ্রনাথকে ওরা হার্ভার্ড কলেজের স্টুডেন্ট সেন্টারে নিয়ে এলো। সবার সঙ্গে পরিচয় হবার পর রবীন্দ্রনাথ সেই ঘরোয়া পরিবেশে অন্তরঙ্গের সুরেই বললেন, "এখানে পৃথিবীর এক বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে শিক্ষালাভ করছেন, আপনারা দেশে ফিরে যাবার পর তা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। আপনাদের অনুসন্ধানী মন বিজ্ঞানের নানা দিক আলোকিত করে আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার ভিত্তি যে দৃঢ় করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু মনে রাখবেন যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে মনের মুক্তিও প্রয়োজন, এই দুইকেই মেলাতে হবে জীবনে। সরকারী চাকরি নিয়ে থাকলে হয়ত প্রথমটি হবে, কিন্তু দ্বিতীয়টির হবার সম্ভাবনা খুব কম।"

যতীন্দ্রনাথ শেঠ বলল, "রবিবাবু, আমরা জানি যে বোলপুরে আপনি এক অভিনব স্কুল করেছেন।"

"অভিনব কিনা জানিনা, তবে সেখানে ঠিক এই দুইয়েরই যোগাযোগ ঘটাতে চাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিজ্ঞান চর্চার জন্য প্রকৃত

বিজ্ঞানীর সন্ধান পাচ্ছিনা। আপনাদের মধ্যে কেউ যদি ফিরে গিয়ে সেখানে কাজের ভার নেন, তাহলে আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা থাকবে না।"

"আমাদের পড়াশুনো শেষ হতে এখনও অনেক দেরী আছে," হীরালাল রায় বলল।

"পড়াশুনো শেষ করুন, তার সমাপ্তি না ঘটিয়ে আপনাদের যেতে বলছি না। আমাদের আশ্রমের স্কুলের যন্ত্রপাতিও সামান্য, সুতরাং অনেক কষ্ট স্বীকার করেই সেখানে কাজ করতে হবে। তবু সেখানে এমন এক মুক্ত পরিবেশে আপনারা অধ্যাপনা ও গবেষনা করতে পারবেন যা বোধহয় ভারতের আর কোথাও পাবেন না। আমি মনে করি যে যেখানে অধ্যাপকগণ জ্ঞানের চর্চায় স্বয়ং প্রবৃত্ত, সেখানে ছাত্রগণও বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ দেখতে পায়। বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির আবির্ভাব যেখানে বাধাহীন, অন্তরে সেখানেই মন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়। শান্তিনিকেতনে আপনারা সেই পরিবেশই দেখতে পাবেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই ভাবপূর্ণ কথাবার্তা সবাই একমনে শুনছিল। নরেন সেনগুপ্ত বলল, "রবিবাবু, আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। আপনি সেই যে শোভাযাত্রা পরিচালনা করেছিলেন, তাঁর মধ্যে আমিও ছিলাম। তখন আমরা সবাই ভেবেছিলাম যে আপনি রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হতে যাচ্ছেন। তারপর আপনি সব ছেড়ে দিলেন। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"তার কারণ ব্যাখ্যা করতে আমার কোন আপত্তি নেই। বরং সুযোগ পেলেই অনেকস্থানে এই ব্যাপারে আমার বক্তব্য বলেছি। সেটি হোল আমি মনে করি যে এইরকম আন্দোলন করে বা বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে আমরা আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে পারবোনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যতদিন আমরা গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে গ্রামোন্নয়ন না করি, ততদিন দেশের যথার্থ কল্যাণ নেই। গ্রামে নতুন প্রাণের

জোয়ার আনতে পারলেই ভারতের যথার্থ কল্যাণ হবে বলে মনে করি।”

“আপনার ‘স্বদেশী সমাজ’ প্রবন্ধটি আমরা এখানেও আমাদের মধ্যে অনেক আলোচনা করেছি,” যতীন শেঠ বলল। “আপনি যে লিখে ছিলেন সংঘ করে নয়, বরং মেলার মধ্য দিয়েই আমরা স্বদেশ-বাসীকে কাছে টানতে পারবো, সেটি আমার খুব ভাল লেগেছে।”

“সেই চেষ্টাই আমরা করছি শান্তিনিকেতনে সাতই পৌষের মেলার মধ্য দিয়ে। পারলে আপনারা একবার আসবেন ওদিনে। আপনাদের সবারই সাদর আমন্ত্রণ রইল।” বলে রবীন্দ্রনাথ ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

বস্টন ঘোরার পর মিসেস মুডীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, রথী ও প্রতিমা সহ আবার নিউইয়র্ক সহরে ফিরে এলেন। মিসেস মুডীর আহ্বানে তাঁর নিউইয়র্কের বন্ধুবান্ধবও সব এসে হাজির হোল। গ্রীনিচ ভিলেজের ফ্ল্যাট আবার দেখতে দেখতে সরগরম হয়ে উঠল।

সেদিন সন্ধ্যায় কথাপ্রসঙ্গে রিজ্‌লি টরেন্স বললেন, “মিঃ টেগোর, আপনাকে একটি নতুন ধর্মসম্প্রদায়ের কথা বলি যা নিউইয়র্কে কয়েক বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর নাম হচ্ছে ‘এথিক্যাল্ কালচার,’ ফিলিক্স অ্যাড্‌লার হচ্ছেন এর প্রতিষ্ঠাতা। এই ধর্মসম্প্রদায়ের মূল কথা হচ্ছে—‘ডিড্‌ ওভার ক্রিড্‌’।”

“বাঃ, ভারী সুন্দর কথাটি বলেছেন তো তিনি,” রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন।

“অ্যাডলার চান তাঁর এই ধর্মসম্প্রদায় এথিক্স্‌-এর সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের মানবতাবাদ ও গণতন্ত্রের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এর প্রধান প্রচারবাণী হচ্ছে মহৎ পৃথিবীর জন্য অনুসন্ধান ও অন্যের প্রতি সদ্‌-ব্যবহার করা।”

“সে তো সব ধর্মেরই ভিত্তি ভূমি,” রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"ঠিকই, কিন্তু এই ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা হচ্ছে যে আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ছাড়াই একজন নৈতিকভাবে উত্তম ব্যক্তি হতে পারে।"

"তা হয়ত পারে মিঃ টরেন্স, কিন্তু যে ধর্মবিশ্বাস ঈশ্বরের অস্তিত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তা কতখানি ধর্ম হতে পারে তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে।"

"জানি আপনি একথা বলবেন," টরেন্স হেসে বললেন। "গীতাঞ্জলি'র কবির কাছে জীবন যে ঈশ্বরের করুণা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা, তা আমার ভালোভাবেই উপলব্ধি হয়েছে। যাই হোক, মিঃ টেগোর, এবার তো নিউইয়র্ক সহরে প্রায় এক সপ্তাহ থাকছেন, এর মধ্যে একবার অনুগ্রহ করে আমার গৃহে আপনাদের পদধূলি দিতে হবে। আমাদের এখানে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী আছে যাদের 'গ্রীনিচ্ পোয়েট্স্' বলে একটু খ্যাতি আছে। তাদের কয়েকজনকে আমি আগামী শনিবার সন্ধ্যেবেলায় আমার অ্যাপার্টমেণ্টে ডেকেছি। আপনারা কী সেদিন আসতে পারবেন?"

রবীন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিলেন, "আমি যে এখন মিসেস মুডীর সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। তিনি যখন যেখানে নিয়ে যাবেন সেখানেই যাবো।"

হ্যারিয়েট হেসে বললেন, "ঠিক আছে রিজ্‌লি, আমরা সেদিন সন্ধ্যে সাতটার সময় যাবো। তবে বেশী লোক ডোকানা। মিঃ টেগোরের শরীর তো খুব ভাল নেই, ভীড় একদম সহ্য করতে পারেন না।"

টরেন্সের বাড়ীতে সেই জমায়েত রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লেগেছিল, বিশেষ করে সতীর্থ তরুণ কবিদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে। তাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে টরেন্স অনেক বলেছেন, তাই সবাই কবিকে ঘিরে তাঁর স্বরচিত কবিতার আবৃত্তি, তাঁর গান শুনতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথও তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে অনেক আমেরিকান সাহিত্যিকদের লেখা সম্পর্কে জানতে পারলেন, যেমন তৎকালীন আমেরিকান সাহিত্যে এড্‌গার অ্যালেন পোর কবিতা ও গল্প এবং হেনরী জেম্‌স্-এর

উপন্যাসের প্রভাব। কবি ঠিক করলেন যে সুযোগ পেলেই এদের লেখার সঙ্গে আরো বেশী করে পরিচিত হবেন।

সেই রাত্রেই বাড়িতে ফিরে সবার নিভৃতে রথী বলল, "বাবা মশায়, হর্ভার্ডে থাকতে অধ্যাপক উড্‌স্ আমাকে বলেছিলেন যে উনি আপনার বক্তৃতাগুলি নিজে প্রকাশ করতে রাজী আছেন।"

"কিন্তু রথী, এগুলি রোদেনস্টাইনকে না দেখিয়ে আমার প্রকাশ করার ইচ্ছে নেই। বিশেষ করে আর্ণেস্ট রাইস্‌কে একবার সব পাণ্ডুলিপিটা দেখিয়ে নিতে চাই। আমার মনে মনে সংকল্পও রাইস্‌কে এই বইটি উৎসর্গ করার। মনে আছে তো লণ্ডনে থাকতে আমাদের প্রতি তাঁর মধুর ব্যবহারের কথা?

"সে ব্যবহার আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা।" রথী উত্তর দিল। "কিন্তু অধ্যাপক উডস্ আরও বলেছিলেন যে উনি নিজের খরচায় 'গীতাঞ্জলি'র আমেরিকান সংস্করণ বার করতে রাজী আছেন। এই বই বিক্রী থেকে যে টাকা উঠবে, উনি তার সবটাই শান্তিনিকেতনের স্কুলের জন্য দান করবেন।"

"জানি না এই বদান্যতার জন্য অধ্যপক উডস্‌-কে কিভাবে ধন্যবাদ জানাবো। কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'র আমেরিকান সংস্করণের জন্য রোদেন-স্টাইনতো ইতিমধ্যেই লণ্ডনের ম্যাকমিলানের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন। তারাই নিউইয়র্কের ম্যাকমিলানের সঙ্গে যোগাযোগ করবে বলেছে। তাছাড়া মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্‌-ও এ ব্যাপারে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন, ওর বিনানুমতিতে অধ্যাপক উডস্‌-এর প্রস্তাবে রাজী হওয়া কী ঠিক হবে?"

তারপর একটু থেমে বললেন, "জানো, মাঝে মাঝে ভাবি যে শান্তিনিকেতনের টাকা তোলার জন্য আমার লেকচারের ফি চাইবো, কিন্তু বলতে লজ্জা করে। আমার অবস্থা হয়েছে সেই আমার 'পুরস্কার' কবিতার কবির মতো, গলায় ফুলের মালাই জুটবে, কিন্তু পকেটে বিশেষ কিছু আসবেনা।"

রথী চুপ করে রইল। সে জানে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা ও তার জন্য বাবা মশায়ের অশেষ চিন্তা। হয়ত শীঘ্রই ভগবান মুখ তুলে চাইবেন, বাবা মশায়ের লেখা থেকে অর্থপ্রাপ্তির পথ হয়ত খানিকটা সুগম হবে। ও জানে যে একটি বিষয় ঘিরে একজন মানুষের এতো স্বপ্ন, এতো প্রচেষ্টা তা কখনো বিফল হতে পারেনা। অন্ধকার কেটে গিয়ে আলোর দিন ঠিকই দেখা দেবে।

নিউইয়র্ক সহরে থাকার সময়েই রবীন্দ্রনাথের আর. এফ্. র‍্যাট্রের সঙ্গে পরিচয় হোল। র‍্যাট্রের কথা তিনি দুবছর আগেই শান্তিনিকেতনে অজিতের মুখে শুনেছেন যখন ইংলণ্ডে তাঁর সেই স্বল্পকালীন অবস্থান কালেও অজিত কুমার রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনার ইংরেজী অনুবাদ করে অক্সফোর্ডের বৃটিশ বন্ধুদের শুনিয়েছিলেন। এইগুলি শুনে কবির প্রতি র‍্যাট্রে ভীষণ আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। এখন আমেরিকায় থাকতে এখানকার খবরের কাগজে রচেষ্টার ও বস্টনে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার কথা শুনে তিনি নিজেই ঠিকানা যোগাড় করে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

র‍্যাট্রে এসেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিঃ টেগোর, অজিতের অনুদিত আপনার কবিতা পড়ে আপনার সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছিল আজ চাক্ষুষ দেখার পর সেই ধারণা বদ্ধমূল হোল।"

"কেন, আমার চেহারাটা কী একান্তই কবির চেহারা?" রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে প্রশ্ন করলেন।

"প্রাচ্যের কবি বলতে আমার যা ধারণা ছিল আপনি অবশ্যই তা পূরণ করেছেন। অক্সফোর্ডে অজিত যখন ইংরেজীতে আপনার কবিতাগুলি পড়ে শুনিয়েছিল, তখন তা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। এখন অবশ্যি আপনার 'গীতাঞ্জলি' পড়ে দেখলাম আপনার কবিতার অবেদন কত গভীর, কত বিশাল।"

"এখানে 'গীতাঞ্জলি'র কপি এতো তাড়াতাড়ি পেলেন কি করে?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমার অক্সফোর্ডের বন্ধুরাই পাঠিয়ে দিয়েছে। শুনলাম আপনি কেম্বি্রজে গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন।"

"হ্যাঁ লোয়েল ডিকিন্‌সনের আমন্ত্রনে সেখানে গিয়েছিলুম।"

"মানে 'জন চায়েনাম্যান'। জানেন, ওর 'জন চায়েনাম্যানস্ লেটারস্' যখন বেরোয় তখন আমরা সবাই ভেবেছিলাম এ বোধহয় কোন চাইনিজেরই লেখা। বিশেষ করে প্রাচ্য সভ্যতার এতো প্রশংসা যখন করা হয়েছে।"

"সে ভুল আমারও হয়েছিল," রবীন্দ্রনাথ সহাস্যে বললেন। "শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের এক পত্রিকায় আমি এই বইটির সমালোচনাও করেছিলুম যখন জানতুম না যে এর লেখক আসলে হচ্ছে বৃটিশ। শুধু ডিকিনসনই নন, অক্সফোর্ডে ওর বাড়িতে গণিতজ্ঞ ও দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেল-এর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কী উজ্জল চেহারা, কী ক্ষুরধার বুদ্ধি রাসেলের! প্রথম দর্শনেই বোঝা যায় ভীড়ের থেকে ইনি কত আলাদা।"

"হ্যাঁ, রাসেলের বক্তৃতা আমিও কয়েকটি সেমিনারে শুনেছি। না দেখলে বিশ্বাস করা যায়না যে তাঁর বয়েস এতো কম।"

"রাসেল একদিন হঠাৎ লণ্ডনে আমাদের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টেগোর, হোয়াট ইজ আর্ট?' 'আমি তখন তাঁকে যে উত্তর দিয়েছিলুম, তা অবশ্যি স্বতঃপ্রনোদিত হয়েই, খুব ভেবে বলিনি। তারপর ও নিয়ে অনেক চিন্তা করেছি।"

"আশাকরি এই নিয়ে আপনার লেখা একদিন আমাদের পড়ার সুযোগ হবে। অজিত এখন কী করছে?"

"ও তো শান্তিনিকেতনের স্কুল নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য নিয়ে লিখে যাচ্ছে। তবে ওর শরীর ভীষণ দুর্বল, শারীরিক ক্লেশ বেশী সহ্য করতে পারেনা।"

"সে তো আমি জানিই। ইংলণ্ডে পড়তে এসে অসুস্থতার জন্য তিন মাসের বেশী থাকতে পারল না। কিন্তু সেইটুকু সময়ের মধ্যেই

সাহিত্যের ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। আমরা সবাই ভেবেছিলাম ভারত থেকে সত্যিকারের একজন বুদ্ধিজীবী আমাদের মধ্যে এল যার কাছ থেকে আমরাও অনেক কিছু শিখতে পারবো। তা আর হোল না। কিন্তু দেশে ফিরে গিয়ে অজিতকে আমার কথা বলবেন।"

"নিশ্চয়ই আপনার কথা তাকে বলবো," রবীন্দ্রনাথ তাকে বিদায় দেবার সময় হেসে জানালেন।

নিউইয়র্ক থেকে শিকাগোতে ফিরে এসে আবার মিসেস মুডীর বাড়ি। আবার রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে পরিচিত বন্ধুদের জমায়েত।

সেদিন রাত্রে ডিনারের জন্য সবাই মিলিত হতেই মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর তো এবার হার্ভার্ড-রচেষ্টার সবই জয় করে এসেছেন। যেখানেই গেছেন, সেখানেই লোকে ঘিরে ধরেছে, বলেছে এমনটি তারা আগে কোনদিন শোনেনি। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মিঃ টেগোরের বক্তৃতা শুনতে শুনতে আমার বারবার মনে হচ্ছিল কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের কথা। তাঁর বক্তৃতাও ছিল এমন মর্মস্পর্শী, আর সবার বক্তৃতা থেকে অনেক তফাৎ।"

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের সুরে বললেন, "অনুগ্রহ করে আমাকে হুইট্‌ম্যানের সঙ্গে তুলনা করবেন না। দেশে থাকতে আমি যখন হুইট্‌ম্যানের 'লিভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্র্যাস' পড়েছিলুম, তখন আমাকে সেই কাব্যগ্রন্থ যে কী ভীষণভাবে অভিভূত করেছিল তা বোঝাতে পারবো না।"

মিস মনরো বললেন, "মিঃ টেগোর, হ্যারিয়েট খুব মিথ্যে তুলনা করেনি। আপনার কবিতা যখন আমি প্রথম পড়েছিলাম, তখন আমারও হুইট্‌ম্যানের কবিতা মনে এসেছিল, বিশেষ করে তাঁর 'প্যাসেজ্‌ টু ইণ্ডিয়া' কবিতা। সেই একইভাবে প্রকৃতির প্রতি নিবিড় মনোভাব, তার সৌন্দর্যদর্শনে অতিন্দ্রিয় শিহরণ, প্রকৃতির মধ্যে

ঐশ্বরিক প্রকাশ। আপনার চেহারার সঙ্গে হুইট্‌ম্যানের চেহারারও কিছুটা মিল আছে।"

"কেন, আমার দাড়ি দেখে সেটি মনে হচ্ছে বুঝি?"

রবীন্দ্রনাথের কথায় সবাই হেসে উঠলেন। এমন সময়ে মিসেস মুডীর পরিচারিকা একটি বিরাট থালায় করে নানারকম অর্‌ডোভ্‌ নিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথের সামনে সেটি ধরতেই কবি হাত নেড়ে না করলেন।

মিসেস মুডী সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে এসে বললেন, "না মিঃ টেগোর, না বললে চলবেনা। এটি আপনার জন্য বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে।"

এই সব অর্‌ডোভ্‌ রবীন্দ্রনাথের খুব একটা প্রিয়বস্তু নয়। একটু মুচকি হেসে বললেন, "লণ্ডনে বৃটিশদের মধ্যে গিয়ে তাদের রান্না খেয়ে আর পেরে উঠছিলুমনা। ডিনারের পর ওরা যখন কিড্‌নি পাই এনে দিত, তখন অধিকাংশ সময়েই ভীষণ লজ্জা করত না করতে।"

ফার্দিনান্দ স্কেভিল্‌ হেসে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাকে তার জন্য দোষ দিতে পারিনা। বৃটিশদের রান্না মানেই তো খালি হাড় সেদ্ধ, রোস্ট্‌ বিফ্‌, আর ওই কিডনি পাই। অথচ আশ্চর্য, চার্লস্‌ ডিকেন্স যখন আঠারশ আটচল্লিশ সালে এদেশে বেড়াতে এসেছিলেন, তখন তাঁর 'আমেরিকান নোটবুক্‌' বইয়ে আমেরিকান রান্নার কী নিন্দেই না করলেন, বললেন যে এরা কী অখাদ্য-কুখাদ্য খায় তার ঠিক নেই।"

"ডিকেন্স আমার বড় প্রিয় লেখক," রবীন্দ্রনাথ বললেন। "ওর 'পিক্‌উইক্‌ পেপার্‌স্‌' পড়ে যে কত হেসেছি তার ঠিক নেই। আবার 'ডেভিড কপারফিল্ড'-এ কী সুন্দর নিজের জীবনের ছায়া নিয়ে এক মনোরম উপন্যাস রচনা করেছেন। মহৎ সাহিত্য যে নিজের জীবনের বেদনা থেকে সৃষ্টি হয়, ডিকেন্সের লেখা পড়লেই তা জানা যায়। অবশ্যি ডিকেন্সের প্রভাব এখন সবার লেখার মধ্যেই পড়ে। আমি

যখন এইচ্. জি. ওয়েলস্-এর 'কিপ্স্' উপন্যাসটি পড়ছিলুম, তখন তা বারবার ডিকেন্সের উপন্যাসের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।"

"ওয়েল্স্ তো একজন স্যোসালিস্ট," মিস মনরো মন্তব্য করলেন। "ওর 'ফিউচার ইন্ আমেরিকা' বইটি আমার খুব একটা ভাল লাগেনি। উনি এখানে এসে শিকাগোর শুধু খারাপ দিকগুলিই দেখলেন, আর আমরা যে এই প্রেইরী ভূমিতেও এক সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলছি, তার কোন উল্লেখই তার বইতে নেই।"

"তার জন্য কিছু ভাববেন না মিস্ মনরো", রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন। "আপনার 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিনই শিকাগোকে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিখ্যাত করে তুলবে। বিশেষ করে আপনি যখন এজরা পাউণ্ডের মতো সহকর্মী পেয়েছেন।"

"এজরার উৎসাহের তুলনা হয়না মিঃ টেগোর। যেই শুনেছে যে আমি এক কবিতা পত্রিকা বার করছি, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে জানাল যে ও তার বৈদেশিক প্রতিনিধি হতে রাজী, টাকা-পয়সার জন্য ভাবতে হবেনা। 'পোয়েট্রি'তে আপনার কবিতার কি সুন্দর ভূমিকা লিখেছে পড়েছেন তো? এখন ও আবার কয়েকজন সতীর্থকে নিয়ে 'ইমেজিস্ম্' বলে এক নতুন কবিতা-আন্দোলন শুরু করেছে। আপনি ওর 'Personae' কাব্যগ্রন্থ পড়েছেন?"

"হ্যাঁ, আর্বানায় থাকতে ওর পাঠানো কপিটি পেয়েছি। অপূর্ব হয়েছে, আধুনিক কবিতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।"

এই ডিনারে জেরেমী টাওয়ার বলে এক ভদ্রলোক আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন ফার্মেসিস্ট, মিসেস মুডীর সঙ্গে সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা। তাঁর বাবা ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য এসেছিলেন বলে মনে-প্রাণে তিনি হলেন ভীষণ 'অ্যাংলোফিল্', ইংরেজদের কোন দোষ দেখতে পারেননা। ভারত সম্পর্কে অনেক কিছু খবরও রাখেন দেখা গেল।

এতক্ষণ তিনি চুপ করে ওদের সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনা

শুনছিলেন। এবার তিনিই কথাবার্তার মোড় রাজনীতির দিকে ঘোরালেন।

"মিঃ টেগোর, আপনি তো বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। কাগজে দেখি সেখানে তো টেররিষ্টদের ভীষণ উৎপাত। টেররিজম্ সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে পারি ?"

"মিঃ টাওয়ার, টেররিজমে আমি আদৌ বিশ্বাসী নই," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। আমি মনে করি টেররিষ্টরা যে পথ বেছে নিয়েছে, তাতে ভারতের প্রগতি ক্ষতিগ্রস্তই হবে। কিন্তু একথাও আপনি মনে রাখবেন, ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের যে অধমন্য মনোভাব, আমাদের স্বদেশবাসীদের বিশেষ কোন দায়িত্বশীল পদে নিয়োগ না করা, এগুলিও বৃটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতীয়দের মনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করছেনা।"

"কিন্তু সেখানে ভারতীয়দের উচ্চপদে তো অনেক বসানো হয়েছে," মিঃ টাওয়ার প্রতিবাদের সুরে বললেন।

"সেগুলি হচ্ছে বিচ্ছিন্ন নমুনামাত্র যা হচ্ছে 'টোকেনিজ্‌ম্'। আমাদের শিক্ষিত বাঙালী তথা ভারতীয়দের সংখ্যানুপাতে এই সব পদ অতি নগন্য।"

"আসলে আপনারা শিক্ষিত বাঙালিরা খালি বৃটিশ শাসনের খুঁত বার করতে ব্যস্ত। আর স্থানীয় খবর কাগজের কাজই হয়েছে এই ফুটোগুলোকে বড় করে দেখানো।"

"সেটা সব সত্য নয়। ইংরেজ কী আমাদের কাছে গিয়ে কোনদিন জানতে চেয়েছে কী আমরা চাই, কী আমাদের বেদনা ? সে দূর থেকে সব সংস্রব বাঁচিয়ে কারবার করতে চায়, কোনরকমে উপকারটি করে তাড়াতাড়ি সরে পড়তে চায়। তারপর ক্লাবে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলে আর হুইস্কি খেয়ে যেন এ দেশে বাস করার প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। আগে যখন পাল তোলা জাহাজ ছিল, তখন ইংরেজরা এত ঘনঘন দেশে যেতে পারতোনা, ফলে এ দেশবাসীর সঙ্গে একটু বেশী করে

মিশত। এখন এই কলের জাহাজের কল্যানে ইংলণ্ডে যাওয়া খুব সহজ, তাই সে আবার কখন ফার্লো নিয়ে দেশে যাবে সেই আশায় বসে থাকে, এ দেশের লোকদের সঙ্গে পারতপক্ষে মিশতে চায়না।”

“মিঃ টেগোর, আপনারা একটু বেশী স্পর্শকাতর। আপনি তো বুঝতে পারেন যে পঁচিশ কোটি লোককে সুশৃঙ্খলভাবে শাসন করা সহজ নয়, ভুল ত্রুটি থাকবেই।”

“আসল সমস্যা কোথায় জানেন মিঃ টাওয়ার? সেটা হচ্ছে অন্তরে। ইংরেজ সেখানে দয়া করেনা, উপকার করে, স্নেহ করেনা, খালি আমাদের রক্ষা করতে চায়। ভারতবর্ষের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা নেই, অথচ ন্যায়াচরনের চেষ্টা করে। ইংরেজ শাসনের এই হৃদয়শূন্য উপকার গ্রহণ করে আমরা কোনপ্রকার আত্মপ্রসাদ অনুভব করিনা। আজকালকার অনেক আন্দোলনই এই গুরু মনঃক্ষোভ থেকে জন্মাচ্ছে।”

মিসেস মুডী ফায়ার প্লেসের পাশে তাঁর দোলনার সোফায় বসে এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলেন। এবার বললেন, “এতক্ষণ তো অনেক সাহিত্য ও রাজনীতির কথা হোল, এবার একটু গান হোক না! অ্যালিস্, তুমি পিয়ানোতে কিছু বাজাও।”

অ্যালিস কর্বিন উঠে এসে গ্রাণ্ড পিয়ানোর সামনে বসলেন। মিসেস মুডীকে জিজ্ঞাসা করলেন, “মোৎসার্টের একটি পিস্ বাজাবো কী?”

“নিশ্চয়ই,” মিসেস মুডী সায় দিলেন।

মোৎসার্টের সুর শুনতে শুনতে রবীন্দ্রনাথের মন আবার পরম প্রসন্নতায় ভরে গেল। তাঁর অনেক দিনের আগের এক অতীত স্মৃতির ঘটনা মনে পড়ল। সেই তরুণ বয়েসে লণ্ডনে ডাঃ স্কটের বাড়িতে থাকতে এমনিধারা পিয়ানো শুনতেন। ওদের দুই মেয়ে কী সুন্দর বাজাতো! সেই সব সুর তাঁর মনে অনেকদিন রয়ে গেল। দেশে ফিরে গিয়ে তাঁর ‘বাল্মিকী প্রতিভা’ নাটকের গানগুলির মধ্যে

অনেক সেই সব স্থুর ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

র্কর্বিন-এর বাজানো শেষ হতে সবাই হাততালি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করলেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ছেলেবেলায় লণ্ডনে থাকতে এই সব ইউরোপীয় গানের স্থুরে আমি বেশ কিছু বাংলা গান তৈরী করেছিলুম।"

মিসেস মুডী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি তার দু-একটি আমাদের শোনান।"

এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে বেশী সাধাসাধি করতে হয়না। গান লেখার মতো গান গাইতেও তাঁর সমান উৎসাহ। আস্তে আস্তে তিনি 'তোমার হোল শুরু' গানটি ধরলেন। ওদের বারবার অনুরোধে এই রকম বেশ কয়েকটি বাংলা গান গাইতে হোল।

গান শুনে সবাই চুপ করে রইল। যদিও এসব গানের স্থুর ও কথা আলাদা, তবু এর অন্তর্নিহিত মূর্ছনা হৃদয়কে দোলা দেয় ঠিকই। মন তখন চলে যায় অন্য এক জগতে। যেখানে স্থুরের ঝর্নাধারায় সব কিছু আপ্লুত।

মিস হ্যারিয়েট মনরোর মনে হোল তাঁরা বুদ্ধের পায়ের কাছে বসে আছেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কী এমন করে গান গাইতেন? তাঁর অন্তত তা জানা নেই।

॥ আট ॥

এবার যখন রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে মার্চ মাসের প্রথম দিকে আর্বানায় এলেন, তখন তিনি আর অপরিচিত ব্যক্তি নন। এখন তিনি শিকাগো, রচেষ্টার ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। তার আগে আর্বানায় থাকতে 'ইউনিটি' ক্লাবে যে চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা ওখানকার ক্যাম্পাস্ পত্রিকা 'ডেইলি ইলেনি'তে বড় বড় করে ঘোষনা করা হয়েছিল। তারপর কবির 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থ ইংরেজীতে প্রকাশিত হবার পর সেই বইয়ের সমালোচনা শুধু লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়নি, শিকাগোর 'ট্রিবিউন্' পত্রিকাতেও তা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হয়েছে। এখন তিনি রীতিমত বিখ্যাত কবি। 'ডেইলি ইলেনি'তে এবার তাঁকে ভারতের 'শ্রেষ্ঠতম' কবি বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ওদের ওয়েষ্ট হাই ষ্ট্রীটের বাসায় ফিরে দেখেন যে বেশ কয়েকটি চিঠি তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। রোদেনস্টাইনের চিঠি এসেছে, লিখেছেন যে কবির এই লেক্চারের সাফল্যে তিনি সত্যিই আনন্দিত। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র সাধারণ সংস্কোরনের জন্য ম্যাক্মিলান্ কোম্পানীর মালিক জর্জ ম্যাক্মিলানের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়েছে এবং মনে হয় যে তারা এটি শীঘ্রই প্রকাশ করবে। তাঁর 'দি গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থেরও প্রস্তুতি-পর্ব সমাপ্ত-প্রায়। ইয়েট্স্ তার প্রুফ্ দেখছেন।

রোদেনস্টাইন তাঁর এই চিঠির সঙ্গে লণ্ডনের 'দি নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত এভেলিন্ আণ্ডারহিল্-এর 'অ্যান্ ইণ্ডিয়ান মিষ্টিক্' নামে 'গীতাঞ্জলি'র সমালোচনার একটি কপি পাঠিয়ে দিয়েছেন যা পড়ে রবীন্দ্রনাথের খুবই ভাল লাগল। কিন্তু রোদেনস্টাইনের চিঠিতে কবি এ-ও জানলেন যে 'Athenaeum' পত্রিকা 'গীতাঞ্জলি'র বিরূপ

সমালোচনা করেছে এই বলে যে তারা এর মধ্যে একঘেয়েমিই বেশী দেখেছে।

ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ ভয় সবসময়েই ছিল যে সবাই তাঁর কবিতার যথার্থ মর্ম উপলব্ধি করতে পারবেনা, তাদের কাছে এগুলি একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হবে। আসলে বৈষ্ণব পদাবলী বা ভারতীয় কাব্য ও সঙ্গীতের 'Variations on a theme'-এর অনুসরণে এখানে আছে বিষয়বস্তুর পারস্পরিক মিলন বা ঐক্য যার পরিচয় ইংরেজ কবি ডন্-এর ধর্মমূলক কবিতায় বা উইলিয়াম ব্লেক্-এর রহস্যময় গীতিকবিতায় দেখতে পাওয়া যায়। এদের মতোই রবীন্দ্রনাথের এই কবিতাগুলিতে সাক্ষাত পাওয়া যায় ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে ছলনাময় সম্পর্ক, পাপ ও পুণ্যের আপাত-সংঘাত, বা মানব-জীবনের হতাশাময় নিঃসঙ্গতা।

শান্তিনিকেতন থেকে ও খারাপ খবর এসেছে। সেখানকার আর্থিক অবস্থা সঙ্গীন, নেপাল রায় ও অন্যান্যরা কোন রকমে চালিয়ে যাচ্ছেন। কয়েকজন ছাত্র ইতিমধ্যেই আশ্রম ত্যাগ করার জন্য তৈরী হয়েছে।

চিঠিটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে একটু হাসলেন। তিনি জানেন শান্তিনিকেতনের আসল সমস্যাটি কী। সেটি হোল ছাত্র ও শিক্ষকরা এখন কবিকে তাদের মধ্যে পেতে চায়, তাঁর সঙ্গ ও উপস্থিতির জন্য সবাই সেখানে সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো শীঘ্রই দেশের পথে রওনা দেবেন। এখানকার ঘর-সংসার গুটিয়ে লণ্ডনে কিছুদিন থেকেই তিনি যথারীতি দেশে ফিরবেন। তখন তিনি সারাক্ষণই তাদের সঙ্গে থাকবেন, তাদের পথ-নির্দেশে সাহায্য করবেন। শান্তিনিকেতনের সবাই যেমন তাঁকে পেতে চায়, তিনিও তাদের ছেড়ে আর দূরে থাকতে পারছিলেন না। বোলপুরের রাঙা মাটি ও শাল-বনের ঘন ছায়া তাঁকে যেন অহরহই ফিরে যাবার জন্য ডাকছে।

বেশ কিছুদিন পরে আবার আর্বানায় তাঁর পরিচিত আবেষ্টনীর

মধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগল। পরের শনিবার সন্ধ্যাবেলায় অধ্যাপক সিমুর-এর বাড়িতে আবার কবির ভক্তবৃন্দের অধিবেশন বসল। সবাই এবার ধরে বসল তাঁর নিজের গলায় তাদের সবচেয়ে প্রিয় কবিতাটি পড়ে শোনাতে যা 'দি গার্ডেনার' পাণ্ডুলিপির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে 'যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে' কবিতাটির ইংরেজী অনুবাদ আস্তে আস্তে আবৃত্তি করতে শুরু করলেন ঃ

Though the evening comes with slow step and has signalled for all songs to cease ;
Though your companions have gone to their rest and you are tired ;
Though fear broods in the dark and the face of the sky is veiled ;
Yet, bird, O my bird, listen to me, do not close your wings…

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো রবীন্দ্রনাথের সেই আবৃত্তি শুনছিল। আবৃত্তি শেষ হতেও কারুর মুখে কোন কথা নেই, সেই কবিতার অনুরনন যেন তাদের মনের মধ্যে তখনও ঝংকৃত হচ্ছিল।

মিসেস সিমুর একটু পরে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার অনুপস্থিতিতে আমরা কয়েকবারই এখানে মিলিত হয়েছি। প্রত্যেক-বারই ডঃ কুন্‌জ্‌ আপনার 'গীতাঞ্জলি'র চৌত্রিশ নম্বর কবিতাটি আবৃত্তি না করে ছাড়বেননা। ডঃ কুন্‌জ্‌, আপনি শুরু করুন।"

"না, না, কবির সামনে নয়।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "আমার সামনে লজ্জা পাচ্ছেন কেন ডঃ কুন্‌জ্‌? মনে করুন আমি নেই, বিদেশী পথিক তুদিন থেকেই দেশে চলে গেছে।"

সবার কাছ থেকে ভরসা পেয়ে ডঃ কুন্‌জ্‌ তখন তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে পড়তে লাগলেন ঃ

"Let only that little be left of me whereby I may
name thee my all…"

ডঃ কুন্‌জ্‌-এর জার্মান অ্যাক্‌সেন্টের জন্য সবার এই আবৃত্তি যেন আরও বেশী ভাল লাগল। মনে হোল রবীন্দ্রনাথই যেন আবার আবৃত্তি করছেন গম্ভীর গলায়, কারণ তাঁরও তো উচ্চারণের মধ্যে সামান্য অ্যাক্‌সেন্ট্‌ আছে।

সবশেষে মিসেস সিমুর রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন 'জীবনে যত পূজা হলনা সারা' গানটি গাইতে। আগে যখন সোমেন গেয়েছিল, অধ্যাপক সিমুর তখন তার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে পিয়ানো বাজিয়েছিলেন। এবারও তিনি উঠে পিয়ানোর সামনে বসলেন। তবে এখন আর সোমেনের বেসুরো গলার সঙ্গে নয়, কবির বীনা-নন্দিত কণ্ঠের সঙ্গে তিনি সুর মেলালেন।

বিদায় নেবার সময় ডঃ কুন্‌জ্‌ বললেন, "মিঃ টেগোর, আগের বছর আপনি বক্তৃতা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন বলে আমাদের বাড়িতে আপনাদের ডিনারে ডাকতে পারিনি। এবারে আপনি রথী ও প্রতিমার সঙ্গে সামনের শনিবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়িতে অনুগ্রহ করে আসুন। 'টেগোর সার্কেল'-এর আর সবাইকেও বলবো। রেভারেণ্ড ও মিসেস ভেইল্‌-এ আসবেন বলেছেন।"

'টেগোর সার্কেল' কথাটি শুনে রবীন্দ্রনাথ একটু চমকে গেলেন। জানেন যে ইদানিং এরা মাঝে মাঝে যখন ডিনারে মেলেন, তখন তাঁর সম্পর্কে কিঞ্চিদাধিক আলোচনা হয়। কিন্তু এটি যে একেবারে 'টেগোর সার্কেল'-এ পরিণত হয়েছে তা ভাবতে পারেননি।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট খাবার টেবিলে রথী বলল, "বাবা মশায়, আমি ইতিমধ্যে ল্যাণ্ডলর্ডের সঙ্গে কথা বলেছি। শুধু এই মার্চ মাসের ভাড়া দিলেই হবে। আমরা চলে যাচ্ছি শুনে খুব দুঃখ করলেন, বললেন এরকম বিদেশী ভাড়াটে আর পাবেননা।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "বিশেষ করে যে ভাড়াটেরা সাত মাসের

মধ্যে তুমাসই বাড়িতে নেই।" তারপর পাশে উপবিষ্ট বঙ্কিম রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, "বঙ্কিম, তুমি তো সিমেষ্টার শেষ করেই দেশে যাবে। এখন কী তোমার পুরোনো ডর্মেই ফিরে যাবে?"

"না গুরুদেব, আমি ও আর একজন ভারতীয় ছাত্র একটি ঘর ভাড়া নিয়ে একত্রে থাকবো ঠিক করেছি।"

"তাহলে তো ভালই হয়, রান্না করে খেতে পারবে। বৌমার কাছ থেকে তো কম তালিম নাওনি।"

প্রতিমা রান্নাঘর থেকে সেই শুনে বলল, "তাহলে অর্ধেক দিনই উপোস করে থাকতে হবে।"

রথী জিজ্ঞাসা করল, "সোমেন কী ঠিক করলে? কয়েকদিন পরেই লণ্ডন হয়ে দেশে ফিরবে তাহলে?"

সোমেন একটু মাথা নিচু করে বলল, "ভীষণ 'হোম্ সিক্' হয়ে পড়েছি আমি। এখানে আর একবিন্দু থাকতে ইচ্ছে করছেনা। এই ঠাণ্ডা আর আমার সহ্য হচ্ছেনা। অনেক আগেই হয়ত চলে যেতাম, কিন্তু আপনারা আসছেন শুনে আপনাদের সঙ্গ পাবার লোভে থেকে গেলাম। চারদিকে এই বরফের স্তূপ আর আমি সহ্য করতে পারছিনা।"

রবীন্দ্রনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "তোমার এ ব্যাথা আমি বুঝতে পারি সোমেন। আমি যখন লণ্ডনে প্রথমবার পড়তে এসেছিলুম, তখন একা একা সেই বিদেশ-বিভূঁই-এ ও ঠাণ্ডা জায়গায় থেকে থেকে আমিও হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতুম কবে দেশে ফিরে যাবো।"

এমন সময় দরজার কাছে কলিং বেলের আওয়াজ শোনা গেল। রথী উঠে গিয়ে দরজা খুলতেই দেখে একটি আমেরিকান ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। পরিচয় দিয়ে বলল, সে ক্যাম্পাস পত্রিকা 'ডেইলি ইলেনি'-র একজন রিপোর্টার। মিঃ টেগোর আর্বানায় ফিরে এসেছেন শুনেছে, তিনি খুব ব্যাস্ত না থাকলে তাঁর সঙ্গে একটি ইণ্টারভিউ চায়।

.রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। আগেই জেনেছিলেন যে তাঁর আর্বানায় প্রথম পদার্পণ করার আগেই 'ডেইলি ইলেনি' ব্যানার হেডলাইন দিয়ে খবর ছেপেছিল ঃ

"Poet to visit University : Famous Indian writer Coming Soon."

ছেলেটি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে চেয়ারে বসেই নোটবই খুলে প্রশ্ন করল ঃ

"মিঃ টেগোর, আর্বানা আপনার কেমন লাগছে ?"

"খুবই ভাল, এর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিশেষ করে গতবার যখন এসেছিলুম তখন এত ঠাণ্ডা পড়েনি। কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ করেছে এর ছাত্র ও শিক্ষকদের আন্তরিকতা। যদিও আমি লোকের সঙ্গে খুব বেশী মেশার সুযোগ পাইনি, তাহলেও যাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, তাদের আন্তরিক ও সৌজন্যমূলক ব্যবহারে আমি মুগ্ধ।"

"মিঃ টেগোর, আপনি তো শিকাগো, বোস্টন ইত্যাদি স্থানে বক্তৃতা দিয়ে এসেছেন। আমেরিকা সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী ?"

"আমেরিকা এক বিশাল দেশ, আমি তার সামান্য স্থানই দেখেছি। কিন্তু যতটুকু দেখেছি, সেই সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি যে কারিগরি নৈপুণ্যে আমেরিকার তুলনা নেই। কী অসীম কর্মতৎপরতা, কী নতুন উদ্ভাবনা শক্তি, এ সব কিছুতেই আমেরিকা আজ অন্য সব দেশকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু খুব বেশী বস্তুতান্ত্রিক হওয়ারও বিপদ আছে। আমরা অনেক ভোগ্যপন্য সংগ্রহ করতে পারি, কিন্তু তার ফলে 'We may lose our souls'।"

"আমাকে ক্ষমা করবেন মিঃ টেগোর। ভারত তো আত্মার সম্পদে ধনী, কিন্তু সেখানে এতো দারিদ্র্য কেন ? লোকে এত গরীব থাকলে আধ্যাত্মিক জীবন কী ভাবে যাপন করবে ?"

"সেটি ঠিক কথাই এবং ভারতের দারিদ্র্যের অনেক কারণ আছে যা আমি এখন আলোচনা করতে চাইনা। কিন্তু এ দুটির মধ্যে সমতা

চাই। আমাদের যেমন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি দেখতে হবে ভোগ্যপন্যের আধিক্যে আমাদের জীবন যেন আত্মিক ভাবে বিপর্যস্ত না হয়।”

“মিঃ টেগোর, আপনার ‘সং অফারিংস্’ কাব্যগ্রন্থের রিভিউ আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় দেখলাম। আপনি কি প্রধানত ‘রিলিজিয়াস্’ কবি ?”

রবীন্দ্রনাথ হেসে উত্তর দিলেন, “আমি শুধু কবি, আমাকে কোন লেবেল দিয়ে বেঁধে দিলে ভুল করা হবে। সত্যি বলতে কী, বাংলাদেশে লোকে আমাকে প্রকৃতির কবি হিসেবেই জানে।”

“মিঃ টেগোর, আমি আর আপনার সময় নষ্ট করবো না। আমেরিকা সম্পর্কে আপনার ‘মেসেজ্’ কী ?”

“আমেরিকার হৃদয় খুব উদার। এর উদ্দেশ্যও মহৎ। ঈশ্বরের কৃপায় যদি এই দেশ ঠিক পথে চলতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে আমেরিকা পৃথিবীর অনেক উপকার করবে।”

পরের দিনই ‘ডেইলি ইলেনি’তে এই ইণ্টারভিউ ফলাও করে বেরোল। তাই পড়ে অধ্যাপক সিমুর ও অন্যান্যরা কবিকে অভিনন্দন জানালেন।

এই সময় রবীন্দ্রনাথ মিসেস মুডীর কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তাতে মিসেস মুডী লিখেছেন যে তিনি ওদের সঙ্গাভাব ভীষণভাবে উপলব্ধি করছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন যে কয়েকদিনের জন্য প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কালিফোর্নিয়া ঘুরে আসতে চান। আর্বানা ও শিকাগোর এই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেতে দিনগুলির পরে কালিফোর্নিয়ার রৌদ্রজ্জ্বল উষ্ণ আবহাওয়া প্রতিমার নিশ্চয়ই খুব ভাল লাগবে।

চিঠি পড়ে রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়লেন। বৌমা কাছে না থাকলে তিনি যে কি রকম অসহায় বোধ করেন তা কি মিসেস মুডী জানেন না ? তারপর রথী ও সোমেনের হাতের রান্না খেতে হবে মনে

করতেই কবির হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো।

কিন্তু তিনি এই নতুন পরিস্থিতেতে খুব বেশী বিচলিতবোধ করলেন না। জীবনে এরকম অনেক ক্ষুদ্র সমস্যা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পরিহাসপ্রিয়তার দ্বারা এড়িয়েছেন, এক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটলনা।

সেই রাত্রেই কাগজ টেনে নিয়ে তিনি মিসেস মুডীকে লিখলেন :

"প্রিয় বান্ধবী,

কালিফোর্নিয়া যাবার এসব কথা কেন? আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সংসারের দুই অসহায় পুরুষকে পরিত্যাগ করে 'ব্রাইড মাদার'কে নিয়ে চলে যাবার কথা ভাবছেননা! আমার শিকাগো গিয়ে আর কী হবে যদি দেখি আপনি সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছেন আর আমি সেই গণ্ডগোলের সহরে একা পড়ে আছি! আমার আরো ভাল একটি পরিকল্পনা আছে। সেটি হোল আসুন শিকাগোকেই আমরা কালিফোর্নিয়ার ফল-ফুল ও রৌদ্রস্নাত স্থান বলে মনে করি। তবে তাই ঠিক হোক। ভিভ্‌লা শিকাগো!"

আর্বানায় রবীন্দ্রনাথের বলতে গেলে কিছুই বাংলা লেখা হয়নি। এতো সব বক্তৃতার আয়োজন, তার পেছনেই সব সময় কেটে গেল। তারপর তাঁর বরাবরই ভূড়ি ভূড়ি চিঠি লেখার অভ্যাস। লণ্ডনে রোদেনস্টাইন, অ্যাণ্ড্রুজ থেকে আরম্ভ করে দেশের সবাইকে চিঠি লিখেছেন নিয়মিত।

কবির হঠাৎ ভীষণ গান লেখার ইচ্ছে হোল। তাঁর সমস্ত মন-প্রাণ যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করতে চাইল। কাগজ-কলম নিয়ে জানলার পাশে টেবিলটিতে বসে তিনি লিখতে শুরু করলেন :

সংসার যবে মন কেড়ে লয়
জাগেনা যখন প্রাণ
তখনো হে নাথ প্রণমি তোমারে
গাহি বসে তব গান।

অন্তরযামী ক্ষম সে আমার
শূন্য মনের বৃথা উপহার।
পুষ্পবিহীন পূজা আয়োজন
ভক্তিবিহীন তান।
ডাকি তব শুষ্ক কণ্ঠে
আশা করি প্রাণপণে
নিবিড় প্রেমের সরস বরষা
যদি নেমে আসে মনে।
সহসা একদা আপনা হইতে
ভরি দিবে তুমি তোমার অমৃতে
এই ভরসায় করি পদতলে
শূন্য হৃদয় দান॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯ মার্চ, ১৯১৩
আর্ব্বানা॥
ইলিনয়।

শনিবার দিন সন্ধ্যেবেলায় রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে যখন ডঃ কুন্‌জ্‌-এর বাড়ি গেলেন, মিসেস কুন্‌জ্‌ তখন দরজার কাছে এগিয়ে এসে সাদরে তাদের লিভিং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কবি তাকিয়ে দেখেন যে তাঁর অনুরাগীরা সবাই ইতিমধ্যে এসে গেছেন। অধ্যাপক ও মিসেস সিমুর, অধ্যাপক ও মিসেস এলারী পেইন্‌, রেভারেণ্ড ও এমিলি ভেইল্‌, মিসেস এস্‌থার হার্ডিং, রথীর অধ্যাপক লুইস্‌ ও বেসি স্মিথ্‌, অধ্যাপক ও মিসেস মর্গান ব্রুক্‌স্‌। এরাই তাহলে হলেন তথাকথিত 'টেগোর সার্কেল'-এর সভ্য-সভ্যা! কথাটি ভেবে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে হাসলেন।

মিসেস সিমুরই কথাবার্তা শুরু করলেন, "মিঃ টেগোর, আমরা এই

রকম জমায়েতে আর একজনের উপস্থিতি খুব মিস্ করি। তিনি থাকলে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আপনার খুব ভাল লাগত।"

"কে তিনি?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন।

"তিনি হচ্ছেন মিসেস মেরী কেলী, এখানকার ভূতপূর্ব লাইব্রেরীয়ান। এখন ওরা আর এখানে নেই।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার মনে পড়ছে মিসেস কেলীকে", রথী বলল। "আগেরবার এখানে থাকার সময় আমি আর সন্তোষ ওর বাড়িতে খুব যেতুম। আমার এখনও মনে আছে ওখানে সন্তোষের একদিন বাবার 'নদী' কবিতাটি আবৃত্তি করা। সেই শুনে মিসেস কেলীর দুই ছোট ছেলের কী হাসি! সন্তোষ যখন বলছিল, 'ঝুরু ঝুরু, ঝিরি ঝিরি' তখন ওরা ভেবেছিল কেউ বোধহয় মন্ত্র পড়ছে!"

রথীর এই কাহিনী শুনে সবাই হেসে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমি জানি আমার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে এই কবিতাটি খুব প্রিয়, কারণ এটি খুব ছন্দবোধক বলেই বোধকরি। কিন্তু সন্তোষ যে এখানে এসেও সেই কবিতাটি মনে রাখবে তা ভাবতে পারিনি।"

অধ্যাপক সিমুর বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার মুখে আপনার এই স্কুলের কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। কিন্তু এই স্কুলের ছাত্রদের জীবনধারা কেমন তা জানতে ইচ্ছে করে। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে তাহলে এ সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।"

রবীন্দ্রনাথ একটু চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলেন: "ভারতে স্কুল বলতে যা বোঝায়, তা আসলে হচ্ছে কারখানা বা ফ্যাক্টরী, শিক্ষক ও ছাত্ররা তারই অংশ। সেই সকাল সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বেজে স্কুল আরম্ভ হয়, তারপর শিক্ষকরা কথা বলতে শুরু করেন আর মেশিন চলা শুরু হয়। মাঝখানে একটু টিফিন খাবার জন্য ফ্যাক্টরী বন্ধ থাকে। তারপর আবার তা চলতে শুরু করে এবং বিকেল চারটের সময় যখন শিক্ষকরা কথাবার্তা বন্ধ করেন, তখন সেই

ফ্যাক্টরী বন্ধ হয় এবং ছাত্ররা সেই মেশিনে তৈরী বিদ্যার কয়েকপাতা নিয়ে প্রতিদিন বাড়ি ফেরে। পরে পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এই বিদ্যার টেষ্ট হয় এবং একটি করে লেবেল দেওয়া হয়। আপনারা সবাই জানেন ফ্যাক্টরীর কী সুবিধে। সব জিনিষই এক রকম ভাবে বের হয় এবং সব মেশিন থেকেই সেই জিনিষ বের হয় একই লেবেল নিয়ে।

"কিন্তু সব মানুষ তো এক নয়। এমনকি একজন মানুষও প্রতিদিন একরকম নয়। আর মেশিন তো সবকিছু দিতে পারেনা যা মানুষে পারে। মেশিন প্রদীপের জন্য তেল বার করে দিতে পারে, কিন্তু জ্ঞানের আলো তো দিতে পারেনা।

"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রকৃত শিক্ষাকে আনন্দের মধ্য দিয়ে গ্রহণ করতে হবে। এই আনন্দের ভেতরই শিক্ষার গতি ও পরিনতি, স্বাধীনতা ও সংযমের মধ্য দিয়ে তার প্রকাশ ও পূর্ণতা। তাই আনন্দ ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে উন্মোচন করতে হবে। বিদ্যায়তনে সেই ধরনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতা নিয়মহীনতা নয় আর সংযম মানেই নিরানন্দময় নীতিপালন নয়। আনন্দহীন সংযম বা বিচারহীণ আচার দিয়ে তাহলে জীবনকেই বন্দী করে রাখা হবে, তার দ্বারা বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভব হবেনা।

"ঠিক এইরকম এক স্কুলই আমি বাংলাদেশের বোলপুরে স্থাপন করেছি, যে স্থানের নাম শান্তিনিকেতন বা 'অ্যাবোড অফ্ পিস্'। শান্তিনিকেতনে যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি, তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ গ্রহণ করা যা আমি ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রোথিত করে দিতে চাই। সেটি হোল যে জীবনে শিক্ষার ব্যবহারিক প্রয়োগের পরেও আর এক মহৎ আদর্শ আছে—সে হচ্ছে 'আত্মানং বিদ্ধি' বা নিজেকে জানা, নিজের সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া। আমি চেয়েছি ছেলেদের সর্বপ্রকার বিলাসিতা

থেকে মুক্ত করে আশ্রমিক সরলতার মধ্যে মানুষ করা। সেই জন্য আমাদের হল-ঘরে টেবিল-চেয়ার বা বেঞ্চি নেই। ছেলেরা ঘরের ভেতরে বা গাছের তলায় আসন বিছিয়ে পড়তে বসে।

"মাঠের মাঝখানে আমাদের বিদ্যালয়। সমস্ত রৌদ্র-আলোর খেলা চলে সারাক্ষণ। সেখানে কোন দেয়াল নেই, কোন আবদ্ধভাব নেই। সহর থেকে দূরে এই বিদ্যালয়ে ছাত্ররা প্রকৃতির কোলে মানুষ হয়ে ওঠে।"

"ইউরোপের কোন কোন স্থানেও মণ্টেসরি প্রথায় এই রকম এক্সপেরিমেণ্ট চলছে, মিঃ টেগোর," অধ্যাপক মর্গান বললেন। "সেখানে প্রকৃতির মাঝে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

"আমার আদর্শ প্রাচীন ভারতের শিক্ষার আদর্শ, প্রফেসর মর্গান, যেখানে গুরু ও শিষ্যরা সব একসঙ্গে থেকে সরলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করবে এবং ছাত্ররা প্রকৃতির মাঝখানে থেকে শিক্ষালাভ করবে। উন্মুক্ত প্রান্তর, নীল আকাশ ও স্নুবহা নদী হবে তাদের শিক্ষার পটভূমি। তারই মাঝে গুরুর সঙ্গে থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করবে।

"আমাদের বিদ্যাশ্রমের দিন শুরু হয় ভোর সাড়ে চারটের ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে। যখন শিক্ষক ও ছাত্ররা সবাই তাদের বিছানা-পত্র ঠিক করে প্রভাত-সঙ্গীত ও বেদের স্তোত্র গাইতে গাইতে বাইরে এসে হাত মুখ ইত্যাদি প্রক্ষালন করে ও সিল্কের দেহবাস পড়ে ধ্যান ও প্রার্থনায় বসে। তারপর লুচি, হালুয়া বা দুধ-মুড়ির প্রাতরাশ সেরে সবাই নিজেদের আসন নিয়ে গাছের তলায় পড়তে বসে তখন সাহিত্য, ভূগোল বা ইতিহাস শিক্ষা দেওয়া হয়। যাদের ল্যাবরেটরিতে কাজ থাকে তারাই শুধু স্কুলগৃহের ভেতরে যায়। এখানে ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট পাঠ নেই। যে ছাত্র এক বিষয়ে খুব অগ্রসর, সে উঁচু ক্লাশের ছাত্রদের সঙ্গে সেই বিষয় নিয়ে পড়তে পারে, অন্যবিষয়ে তার সমবয়সী ছাত্রদের সঙ্গে একই ক্লাশে পড়তে থাকে।

"সাড়ে-দশটার সময় গানের পর ক্লাশ ভঙ্গ হলে সবাই নদী বা কুয়োতলায় স্নান করতে যায়। স্নানান্তে আশ্রম-জননীর উদ্দেশ্যে গান গেয়ে সাড়ে এগারটার সময় সবাই মধ্যাহ্ন ভোজে বসে যা সাধারণত ভাত, ডাল, তরকারী, ঘি ও দুধ দিয়ে সারা হয়। তারপর একটু বিশ্রামের পর আবার বেলা দুটোর সময় গাছের তলায় স্কুল বসে। কোন ক্লাশেই দশ জনের বেশী ছাত্র থাকতে পারবেনা এবং শিক্ষকরা বেত বা অন্য কোন দৈহিক শাস্তি দিতে পারবেন না। চারটের সময় স্কুল শেষ হলে ছাত্ররা ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস বা স্থানীয় খেলা হা-ডু-ডু খেলতে বসে যেসবে তারা ইতিমধ্যেই কলকাতার অনেক কলেজ টিমকে হারিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে কেউ বা মিলিটারী ড্রিল শেখে বা শালবনের ভেতর দিয়ে পথ-পরিক্রমায় যায়। কী শীত, কী গ্রীষ্ম, কেউ জুতো-মোজা পড়তে পারবেনা, বা অসুস্থ না হলে দৈনিক স্নান থেকে নিবৃত্ত হতে পারবেনা।

"খেলার শেষে সবাই আবার স্নান বা গাত্রাঙ্গ পরিস্কার করে সাদা ধুতি পড়ে সন্ধ্যাকালীন ধ্যান ও প্রার্থনায় বসে। তারপর রাত্রের আহারের পর সবাই তখন নাচ-গান, শিল্পকলা বা নাটক অভিনয়ের মহড়া দেয়। রাত্রিবেলায় ছেলেরা তাদের নিজস্ব হাতে-লেখা পত্রিকা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত থাকে। এমনি একটি পত্রিকার নাম 'শিশু' যা ছ থেকে দশ বছরের ছেলেরা সম্পাদনা করে। সেখানে এরা নিজেরাই কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ লেখে। দিনের কাজ শেষ হয় রাত নটা থেকে দশটার সময় যখন সব শিক্ষক ও ছাত্র তাদের নির্দিষ্ট বিছানায় গিয়ে নিদ্রার জন্য প্রস্তুত হয়।

"আমি এই স্কুলে ছাত্রদের দেহ-মন দুইয়েরই পুষ্টি ও বর্ধনের ব্যাপারে জোর দিয়েছি। আমি যেমন চাই তাদের জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে ধাবিত হোক, তেমনি তারা সমাজ-সেবা থেকেও যেন পিছুপা না হয়, যার জন্য অনেক উঁচু ক্লাসের ছাত্র বোলপুরের সাঁওতালী বস্তিতে গিয়ে প্রাথমিক নৈশ-বিদ্যালয় স্থাপন করে সেখানে বিনামূল্যে শিক্ষাদান

করছে। প্রাচীন ভারতের আদর্শে স্থাপিত এই আশ্রমে জীব-হিংসা নিষিদ্ধ, তাই সবাই এখানে নিরামিশাষী। মন্দ বাক্য বা মন্দ আচরণের যেমন এখানে কোন স্থান নেই, তেমনি সৎ চিন্তা, সৎ কর্ম ও ঈশ্বরের অনুধ্যানে ছাত্রদের জীবনের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করার মহান ব্রত আমরা গ্রহণ করেছি এখানে। প্রায় বারো বছর আগে মাত্র পাঁচ-ছটি ছাত্র ও একজন শিক্ষককে নিয়ে এই ব্রহ্মাশ্রম শুরু করেছিলুম, আজ তার ছাত্রসংখ্যা একশ কুড়ি জন ও শিক্ষকের সংখ্যা যোল জনের মতো। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে ঈশ্বরের কৃপায় আমাদের এই বিদ্যালয় একদিন বিশাল মহীরুহের মত এক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হবে এবং দেশে-বিদেশে তার কীর্তি-কাহিনী প্রচারিত হবে।”

সবাই এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মত রবীন্দ্রনাথের এই অভিনব ‘পোয়েট্‌স্ স্কুল’-এর কথা শুনছিলেন। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে অধ্যাপক সিমুর যখন তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন, তখন রাত বেশ গভীর হয়ে গেছে, আবার বরফ পড়তে শুরু করেছে। ক্যালেণ্ডারের নিয়ম অনুসারে স্প্রিং এলেও আর্বানায় শীত যেন একেবারেই যেতে চায়না।

এই সময়ে একদিন মিনেসোটা থেকে শিক্ষাবিদ আর্থার জে. টড্ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত করতে এলেন।

করমর্দন করে নিজের পরিচয় দিয়ে অধ্যাপক টড্ বললেন, “মিঃ টেগোর, আপনার অভিনব শিক্ষাপদ্ধতির কথা আমি আর্বানার বন্ধুদের কাছ থেকে শুনেছি। সত্যি বলতে কী, এইসব জেনে আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য ভীষণ উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম।”

“অধ্যাপক টড, আপনি আমাকে খুবই লজ্জায় ফেলছেন”, রবীন্দ্রনাথ বললেন। “আপনার মতো শিক্ষাবিদের কাছে আমাদের সব কিছুই হয়ত এক্সপেরিমেণ্ট বলে মনে হবে। তবে এইকথা বলতে পারি, শান্তিনিকেতনে আমি যে স্কুল স্থাপন করেছি, তার আদর্শ যদি কোনদিন ফলবতী হয়, তাহলে বাংলা তথা ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদান অনন্য বলেই গণ্য হবে।”

"মিঃ টেগোর, আপনি আমাকে কন্‌ভেন্‌শনাল ব্যক্তি বলে ভাববেন না। শিক্ষার ব্যাপারে নতুন চিন্তা-ভাবনা আমিও অনেক করেছি। আপনাকে বলছি, সভ্যতাক্ষেত্রে প্রাচ্যের অবদান সম্পর্কে জানতে আমি ভীষণ আগ্রহী।"

"আপনার তাহলে আমার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতাটি শোনা উচিত ছিল। তাছাড়াও এখানে এ সম্পর্কে রেভারেণ্ড ভেইল্‌-এর ইউনিটি ক্লাবেও আমি পর পর চারটি বক্তৃতা দিয়েছিলুম।"

"রেভারেণ্ড ভেইল আমার বিশেষ বন্ধু। তাঁর মুখেই তো আপনার কথা প্রথম শুনলাম। জানলাম যে আপনি বর্তমান ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি এবং একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। মিঃ টেগোর, আপনার এই বক্তৃতাগুলি বই-আকারে প্রকাশ করার কথা ভেবেছেন কী?"

"প্রফেসর টড্‌, লণ্ডনে আমার ব্রিটিশ বন্ধু শিল্পী উইলিয়াম রোদেনস্টাইন হচ্ছেন আমার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনি আমার লেখাগুলি ইংরেজীতে প্রকাশ করার জন্য ম্যাকমিলান কম্পানীর সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। তাঁকে না দেখিয়ে আমি এগুলি প্রকাশের কথা ভাবতে পারছিনা।"

"ম্যাক্‌মিলান যদি আপনার সব বই ছাপে, তাহলে তার থেকে ভাল আর কিছু হতে পারেনা। আশাকরি শীঘ্রই আপনার এই সব লেখা আমরা ইংরেজীতে পড়তে সমর্থ হবো।"

"সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা মিঃ টড্‌।"

"সে তো নিশ্চয়ই। মিঃ টেগোর, ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আপনার অবদান জানি। কিন্তু রাজনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কারা এখন প্রধান?"

"রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন ভারতীয়কে আপনি প্রথম স্থান দেবেন জানিনা, কারণ আমাদের জাতীয় কংগ্রেসে এখন বেশ কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর নেতা আছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে জগদীশচন্দ্র বোসের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও তিনি আমার পরম

বন্ধু, তবু পক্ষপাতহীণ ভাবে বলতে পারি যে পদার্থ ও জীববিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদান তাকে অন্যতম প্রধান বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর সম্বন্ধে কিছুদিন আগে ভারতের 'মর্ডান রিভিউ' পত্রিকায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, আপনি যদি চান তাহলে আমি দেশে ফিরে গিয়ে তার কাটিং আপনাকে পাঠিয়ে দিতে পারি।"

"তাহলে আমি সত্যিই আনন্দিত হবো মিঃ টেগোর। আমার অনেক দিনের বাসনা প্রাচ্য তথা ভারতের বর্তমান মনীষীদের সম্পর্কে বিশেষভাবে জানা। ইচ্ছে আছে একদিন তাদের সম্পর্কে একটি বই লেখা ও এদেশে সেই নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া।"

"আমাকে আবার সে দলে ফেলবেননা কিন্তু," রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন। "আমার অবদান শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে এবং কিছুটা শিক্ষার ব্যাপারেও। 'ওয়াইজ্ মেন্ অফ দি ইষ্ট'-এর দলে আমাকে অন্তর্ভূক্ত করলে আপনার বইয়ের কোন কদর হবেনা।"

অধ্যাপক টড-ও হেসে বললেন, "আপনার প্রশংসা আপনার কাছে করতে পারিনা, মিঃ টেগোর। সে আমার বইয়ের জন্য রেখে দিলাম। কিন্তু আমার খুব ইচ্ছে আছে একদিন ভারতে ঘুরে আসা।"

"সেটি খুবই যথোপযুক্ত হবে প্রফেসর টড্, যদি ভারতের ওপর আপনি লিখতে চান। ভারত পরিভ্রমণ না করলে ভারতের সত্যিকারের মর্মকথাটি বুঝতে পারা যায়না, সেটি যে কোন দেশ সম্পর্কেই সত্যি। কিন্তু কোনদিন যদি ভারতে আসেন, তাহলে আমাদের শান্তিনিকেতনে আসতে ভুলবেননা যেখানে আমার স্কুল স্থাপিত।"

"আপনার এই আমন্ত্রনের জন্য অনেক ধন্যবাদ, মিঃ টেগোর। কিন্তু তখন আমাদের এই কথাবার্তা কী আর আপনার মনে থাকবে?"

"আপনাকে আমার ঠিকই মনে থাকবে মিঃ টড্। যদিও আমি এখানে কয়েকদিনের জন্যই এসেছি এবং সামনের সপ্তাহেই এখান থেকে চলে যাবো, তবু আর্বানায় আমি যাদের সংস্পর্শে এসেছি, তাদের আতিথ্য ও সহৃদয় ব্যবহার আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা। আপনি

যদি কোনদিন শান্তিনিকেতনে আসেন, তাহলে দেখবেন শুধু আমি নয়, আমাদের ছাত্র ও শিক্ষকরা সবাই আপনার মুখ দিয়ে কিছু শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।"

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর অধ্যাপক টড যখন বিদায় নিলেন, রবীন্দ্রনাথের তখন মনে হোল এখানে তিনি আর একজন সত্যিকারের ভারত প্রেমিকের সাক্ষাত পেলেন। এরা যদি বই লিখে ও বক্তৃতা দিয়ে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের কথা প্রচার করেন, তাহলে পাশ্চাত্য জগতে ভারতকে শুধুমাত্র আর দরিদ্র দেশ বলে গণ্য করা হবেনা।

আর্বানা থেকে বিদায় নেবার সময় সবারই চোখ যেন ছলোছলো। পরিচিত সবাই রেলওয়ে স্টেশনে এসেছে। মিসেস সিমুরেরই যেন সবচাইতে বেশী কষ্ট। চোখ মুছে বললেন, "রথী, ভেবেছিলাম তুমি ও প্রতিমা কয়েকবছর এখানে থাকবে, তোমাদের সঙ্গ পাবো : তা আর হোলনা। মিঃ টেগোর, আবার কী আপনার দেখা পাবো!"

বিদায় মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে পুরোপুরি সামলে রাখতে পারেননা, এবারও পারলেননা। ভারি গলায় বললেন, "আপনাদের ভালবাসার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবোনা। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে আবার দেখা হবে।"

অধ্যাপক সিমুর বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার কবিতার বই আমাদের কাছে রইল। আর কোন বই বেরোলে জানাবেন, আমরা কিনে নেবো।"

অধ্যাপক কুন্‌জ্ সেই কথার সূত্র ধরে বললেন, "আমাদের 'টেগোর সার্কেল'-এর জন্য আপনার ইংরেজীতে অনুদিত সব বইই কিন্তু চাই, মিঃ টেগোর। 'দি গার্ডেনার' বেরোলেই আমাদের তা জানাতে ভুলবেননা, আমরা ঠিক যোগাড় করে নেবো।'

"তার জন্য ভাববেননা, ডঃ কুন্‌জ্। বইটি বেরোলো আপনাদের এক কপি আমি নিজেই পাঠিয়ে দেবো।"

ট্রেন ছাড়বার সময় হয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ ট্রেনের দরজার মুখে

দাড়িয়ে বললেন, "বন্ধুগণ, বিদায়। বিদায় কালে আমাদের ভারতীয়দের যাই বলতে নেই, তাই বলি 'আসি'।"

গাড়ি চলতে শুরু করলে হাত নাড়তে নাড়তে মিসেস সিমুর বললেন, "ইউ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম ইন্ আর্বানা, মিঃ টেগোর। প্লিজ রাইট টু আস্।" হাওয়ায় আর তাঁর পরের কথাগুলি শোনা গেলনা। ওরা সবাই মিলে হাত নাড়তে লাগলেন ট্রেন মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত।

শিকাগোতে রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে মিসেস মুডী ভীষণ খুশী। "ওয়েলকাম, ওয়েলকাম মিঃ টেগোর। এই কয় সপ্তাহ আপনাকে দেখতে না পেয়ে মনে হয়েছে এক পরম বন্ধু ও মঙ্গলাকাঙ্খীর সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।"

সেদিন রাতে মিসেস মুডীর বাড়ির ডিনার পার্টিতে রবীন্দ্রনাথের সব পরিচিত বন্ধুরাই জড়ো হয়েছিলেন। মিস্ হ্যারিয়েট মনরো জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর, জানি এতদিন আপনি বক্তৃতা প্রস্তুত করতে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু আপনার আর কোন লেখা কী ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন?"

রবীন্দ্রনাথ একটু ইতস্তত করে উত্তর দিলেন, "কবিতা ছাড়া আমার বাংলা 'রাজা' নাটকটি 'কিং অফ্ দি ডার্ক চেম্বার' নাম দিয়ে লণ্ডনে একটি বাঙালী ছাত্র অনুবাদ করেছিল, সেইটেই আমি এ কয়দিন ঘসেমেজে ঠিকঠাক করছিলুম। জানিনা কেমন হয়েছে।"

মিসেস মুডী সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "প্লিজ্ মিঃ টেগোর, আপনার এই নাটক থেকে কিছুটা পড়ুন। আপনার কবিতা, প্রবন্ধ ও গান শুনেছি, এখন পর্যন্ত কোন নাটক শোনা হয়নি।"

রবীন্দ্রনাথ তখন 'রাজা' নাটকের কাহিনীটি বলে তাঁর নাটকের অংশবিশেষ পাঠ করে শোনাতে লাগলেন।

'রাজা'র কাহিনী সত্যিই অপূর্ব। মল্যরাজ্যের রাণী সুদর্শনা রাজার বাল্যবিবাহিতা পত্নী। রাজার সঙ্গে প্রাসাদের অন্ধকার গর্ভগৃহে

তার সাক্ষাত হয়, কিন্তু বাইরে কোনদিন তাঁকে দেখেননি। রাণীর সন্দেহ রাজা কুরূপ, তাই দিনের বেলায় তাঁকে দেখা দেননা। দাসী সুরঙ্গমা রাজা সম্বন্ধে যা বলে তাতে রাণীর সন্দেহ বাড়ে। সুদর্শনা রাজাকে বাইরে দেখতে চাইলে রাজা বললেন, 'বসন্ত পূর্ণিমার উৎসবে তুমি তোমার প্রাসাদের শিখরের ওপর দাড়িয়ো, তখন আমার বাগানের অজস্র লোকের মধ্যে আমাকে দেখবার চেষ্টা করো।' অনেক লোকের বিশ্বাস যে রাজা আদৌ নেই, তাই উৎসব ক্ষেত্রে সুবর্ণ রাজবেশ পড়ে দেখা দিল। রাণী তাঁকেই রাজা মনে করে মুগ্ধ হল। কিন্তু কাঞ্চীর রাজা, সুবর্ণকে চিনতে পেরে ও তাকে শিখণ্ডী খাড়া করে সুদর্শনাকে পাবার ষড়যন্ত্র করল। এই উদ্দেশ্যে প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যানে যখন আগুন লাগলো, তখন দেখতে দেখতে সে আগুন প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। রানী যখন সুবর্ণের কাছে গিয়ে বলল, 'রাজা, রক্ষা করো,' সুবর্ণ তখন নিজের ছলনা স্বীকার করে অতিকষ্টে কাঞ্চীরাজসহ সেই উদ্যান থেকে পালালো। রাণী লজ্জায় ধিক্কারে জ্বলন্ত প্রাসাদে ফিরে গেল। এমন সময়ে রাজা তাকে উদ্ধার করতে এলেন। কিন্তু আগুনের আলোকে রানী রাজার মুখ ক্ষণিকের জন্য দেখেছিল। সে মুখ কালো। রানী বলল, 'ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো···ঝড়ের মেঘের মতো তুমি কালো,·কূলশুণ্য সমুদ্রের মতো কালো।' রানীর নয়নে তখনো রূপের নেশা, তাই রাজাকে সে গ্রহণ করলোনা। প্রাসাদ ত্যাগ করে পিত্রালয় মদ্ররাজ্যে ফিরে গেল।

পিত্রালয়ে সুদর্শনার প্রায়শ্চিত্ত শুরু হোল। কাঞ্চী, কোশল ইত্যাদি দেশের রাজারা তাকে পাবার জন্য তার পিতৃরাজ্য আক্রমণ করল। স্বয়ংবর সভায় ডাক পড়লে সুদর্শনা দেহপাত করতে তৈরী হোল। সে অন্তরে রাজার উদ্দেশ্যে বলল, 'দেহে আমার কলুষ লেগেছে, এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধূলোয় লুটিয়ে যাব। কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি—বুক চিরে সেটা কি তোমাকে আজ জানিয়ে যেতে পারব না?'

এমন সময়ে রণক্ষেত্রে ডাক পড়ল রাজাদের। ঠাকুর্দা যিনি বসন্তপূর্ণিমার উৎসবে সবার সঙ্গে খেলা করে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি তখন এলেন বর্ম পরে রাজসেনাপতি রূপে যুদ্ধক্ষেত্রে। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার বিজয়ের শেষে তাঁকে দেখার প্রতীক্ষায় সুদর্শনা অভিমান করে বসে রইল। এমন সময়ে ঠাকুর্দা এসে তাকে খবর দিল যে রাজা চলে গেছেন। সুদর্শনার অভিমান তখন বাধা মানল না, দুচোখ ভরে অশ্রু উথলে উঠলো। সে তখন সুরঙ্গমাকে সঙ্গে নিয়ে পথে বার হোল রাজার অভিসারে। রাত্রি শেষ, সূর্য উঠলে বহুকাল পরে তার প্রভুর সঙ্গলাভ করল। রানীর প্রেমদৃষ্টি এখন রাজার রূপকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পেরেছে, রূপ থেকে অরূপের দিকে যাত্রা করেছে, তাই রাজা তাকে বাইরে আহ্বান করে বললেন, 'এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।'

রবীন্দ্রনাথের পড়া হয়ে গেলে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সেই নীরবতা দীর্ঘ করতালিতে বিদীর্ণ হোল। হ্যারিয়েট মনরোই প্রথমে বললেন, "ওহ্, মিঃ টেগোর, আমাদের 'পোয়েট্রি' ম্যাগাজিন যদি সব রকমের পত্রিকা হোত, তাহলে আপনার এই নাটকটি সঙ্গে সঙ্গে ছাপাতাম। কী সুন্দর আপনি রাজার চরিত্র এঁকেছেন! তিনি বজ্রের মতো কঠিন আবার ফুলের মতো কোমল। তাই আপনি তাঁর 'পদ্মের মধ্যে বজ্র' এই ধ্বজাচিহ্ন দিয়েছেন। কী অপূর্ব ও অভিনব এই কাহিনী, এমনটি কোনদিন শুনিনি।"

"কাহিনীর উৎপত্তি কিন্তু আমার নয় মিসেস মনরো", রবীন্দ্রনাথ সবিনয়ে বললেন। "বৌদ্ধজাতকের অন্তর্গত কুশজাতকে এই কাহিনীটি পড়েছিলুম। আমি সেটি আত্মসাত করে নিজের মতো করে নাট্যাকারে সাজিয়েছি।"

"যথার্থই নাট্যকারের কাজ করেছেন আপনি মিঃ টেগোর। ভুলে যাবেন না শেকস্পীয়ার তাঁর অধিকাংশ কাহিনীই হোলিন্‌শেড্-এর ইতিহাস থেকে পেয়েছিলেন।"

"আর যাই হোক, শেকস্‌পীয়ারের নাটকের সঙ্গে এটির তুলনা করবেন না, মিসেস মনরো।" রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন "তবে এ নাটক রূপক। এখানে আমি বাইরের জগত থেকে অন্তরের জগতে প্রবেশের অভিযানকে বর্ণনা করতে চেয়েছি, সেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামকে নাট্যায়িত করার চেষ্টা করেছি।"

সেদিন সভা ভঙ্গ হতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। মিসেস মুডীর শোফার স্কেড্‌ল্‌ গাড়ি করে কয়েকজনকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এল।

পরের দিন দুপুরে লাঞ্চের পর মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ টেগোর, চলুন রথী ও প্রতিমাকে নিয়ে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি। গতবার যখন এসেছিলেন, তখন তো সব কিছুই বরফে ঢাকা ছিল। এখন এপ্রিল মাস পড়ে গেছে, এতদিনে লেক মিশিগানের বরফ সব নিশ্চয়ই গলে গেছে।"

সত্যি, মিশিগান লেকের ধারে যেতেই রবীন্দ্রনাথ সেই বিশাল লেক দেখে আবার অবাক হয়ে গেলেন। কোথায় সেই সব শক্ত পাথরের মতো জমা বরফ, এখন সেই জল দিব্যি ঢেউ খেলে টলমল করছে। এর মধ্যেই কিছু কিছু বোট পাল তুলে বেরিয়ে পড়েছে। অবসব প্রাপ্তরা তীরের কাছে বায়ু সেবনের জন্য জমায়েত হয়েছে। মনে হয় শিকাগোর ভয়ঙ্কর শীতের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে সবাই গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরের আলো ও হাওয়ার মধ্যে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

কিছুক্ষণ সেখানে ঘোরাফেরার পর মিসেস মুডী বললেন, "চলুন, এখান থেকে মিউজিয়াম ঘুরে আসি। এই মিউজিয়ামে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের কালেক্‌শন্‌ খুবই বিখ্যাত।"

মিউজিয়ামে ইণ্ডিয়ান চিফ্‌দের সব ছবি ও শিল্পের নিদর্শন দেখে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেল। এখানে যেন গোটা উত্তর আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের করুণ ইতিহাস দেয়ালের মধ্যে সেঁটে দেওয়া

হয়েছে। সেই কিভাবে বিছিন্ন ইণ্ডিয়ান প্রজাতিরা দুর্ধর্ষ ও আধুনিক অস্ত্র-সজ্জিত ইউরোপীয়ানদের কাছে একে একে হেরে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে তারা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় রুখে দাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু সে শুধু সাময়িক জয়লাভ, তারপরই বিশাল পরাজয়ের রুধির-স্রোতে প্রায় সবাই নির্মূল হয়ে গেছে। আজ তাদের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বিচ্ছিন্ন রিগার্ভেশনের মাঝে বাস করে কোনক্রমে দিনগুজরান করছে।

শনিবার দিন দুপুরে ঐতিহাসিক ফার্দিনান্দ স্কেভিল্-এর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্চের নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের মতোই আর এক নির্যাতিত জনসংখ্যার কথা উঠল—আমেরিকান নিগ্রো।

অধ্যাপক স্কেভিল্ বললেন, "আপনি শিকাগোতে এত নিগ্রো দেখছেন মিঃ টেগোর, কিন্তু কয়েকবছর আগেও এরা সংখ্যায় নগন্য ছিল এখানে। এখন সব দলে দলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি থেকে আসছে।"

"কেন? আমার ধারনা ছিল দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে নিগ্রোদের আনা হয়েছিল ক্ষেতে-খামারে কাজ করার জন্য এবং সেখানকার উষ্ণ আবহাওয়া এই ঠাণ্ডার রাজ্য থেকে বাস করার পক্ষে অনেক মনোরম।"

"সেটা ঠিকই যখন কার্পাস ছিল সত্যিকারের 'রাজা'। কিন্তু দক্ষিণে নিগ্রোদের জীবন তো দুবিসহ। সেখানে 'জিম্ ক্রো' আইন, যার অর্থ হচ্ছে ট্রেনে-বাসে বা রেস্টোরেণ্টে নিগ্রোদের পৃথকভাবে বসতে হবে। সেখানে সাদাদের জন্য এক আইন আর কালোদের জন্য সেই আইনের অন্য প্রয়োগ। এখনও কাগজে দেখতে পাওয়া যায় সামান্য অপরাধের জন্য নিগ্রোদের ধরে ধরে 'লিংচিং' করা হচ্ছে। তাই নিউইয়র্ক, শিকাগো, ডেট্রয়েট ইত্যাদি বড় সহরে যেখানেই ফ্যাক্টরিতে চাকরি পাওয়া যায়, সেখানেই দলে দলে নিগ্রোরা দক্ষিণের মিসিসিপি, আলাবামা বা আর্কান্‌স থেকে আসছে।"

"আপনার কথা শুনে আমাদের দেশের অচ্ছুৎদের কথা মনে পড়ছে, প্রফেসর স্কেভিল্," রবীন্দ্রনাথ বললেন। "সেই বিহার বা বাংলার গ্রাম

থেকে উঁচু হিন্দু জাতের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দলে দলে সব কলকাতায় আসছে ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে। শুধু জীবিকা নির্বাহের জন্যও নয়, বর্ণের নামে গ্রামের হিন্দুদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার জন্যও বটে।"

"আপনি তো জানেন যে নিগ্রোদের ক্রীতদাসত্ব থেকে মুক্ত করার জন্য আমাদের প্রায় চার বছর ধরে সিভিল্ ওয়ার করতে হয়েছিল। যখন প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন আঠারশ তেষট্টি সালে নিগ্রোদের 'মুক্ত' বলে ঘোষণা করলেন, তখন উত্তরের অনেক রাজ্যই সেই ঘোষণা মেনে নেয়নি। তাদের মতে এ শুধু দক্ষিণের সমস্যা, উত্তরে তো ক্রীতদাসত্ব নেই। তারা ভুলে যায় যে নিগ্রোদের সমস্যা আসলে জাতীয় সমস্যা, উত্তরের বা দক্ষিণের নয়। আমরা যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কোথাও তাদের পরাধীন করে রাখি, তাহলে আমাদের সমষ্টিগত আত্মাও পরাধীন হয়ে থাকবে।"

"আপনি ভারী সুন্দর কথাটি বলেছেন প্রফেসর স্কেভিল্। এই মনোভাবটি আমিও আমার এক কবিতায় প্রকাশ করেছি। যদি নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আমরা 'অচ্ছুৎ' বলে দূরে সরিয়ে রাখি, তাহলে ঈশ্বরের বিচারে একদিন আমাদের সেই পংক্তিতে নেমে আসতে হবে, তাদের অপমানের সমভাগী হতে হবে।"

"কাগজে পড়লাম ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেকার এক প্রধান সমস্যা এই জাত নিয়ে।"

"আপনি ঠিকই পড়েছেন প্রফেসর স্কেভিল্। আমরা উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মুসলমানদের শুধু যে দূরে সরিয়ে রাখি তাই নয়, তারা যদি আমাদের ঘটি-বাটি ছুঁয়ে দেয়, তাহলে আমরা তা ফেলে দেবো, তবু ধুয়ে ব্যবহার করবোনা।"

"মনে হচ্ছে আমাদের দুই দেশেরই এই বিরাট সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যা মিটতে বেশ সময় লাগবে," অধ্যাপক স্কেভিল্ দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শিকাগো থেকেও বিদায় নেবার সময় হয়ে এল। আর্বানা ছাড়ার পর এই সাতটি দিন যেন এক মধুর মিলনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এখন আবার সেই বিদায়ের পালা ঘনিয়ে এল।

তবে এখানে ঠিক ছোট জায়গা বলে আর্বানার মতো তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে অতো ঘনিষ্ঠতা নেই। শিকাগো বড় সহর, এখানে বড় সহরের কিছুটা ঔদাসিন্য সব সময়েই রয়েছে।

যাত্রার দিন মিসেস মুডীর শরীর ভাল নয় বলে তিনি আর রেল স্টেশনে আসতে পারলেননা, বাড়ির দোরগোড়া থেকেই বিদায় জানালেন। তাঁর বিশ্বস্ত শোফার অ্যান্টন্ স্কেড্‌ল্ মোটঘাট সহ রবীন্দ্রনাথদের শিকাগোর ইউনিয়ান স্টেশনে নিউইয়র্ক-গামী ট্রেনে তুলে দিয়ে এলো।

এবার নিউইয়র্কে থাকা শুধু একটি রাতের জন্য, কারণ পরের দিনই বিকেলে জাহাজ ছাড়বে ইংলণ্ড-অভিমুখে।

তারই মধ্যে নিউইয়র্ক শহর থেকে ওরা তিনজনেই কিছু কেনাকাটা করলেন, বিশেষ করে লণ্ডনের বন্ধুদের জন্য উপহার। রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনের জন্য একটি চামড়ায় বাঁধানো অ্যালবাম কিনলেন। প্রতিমা মিসেস রোদেনস্টাইনের জন্য একটি স্কার্ফ কিনল ও বাচ্চাদের জন্য নিল টফির বাক্স।

মিসেস মুডীর কাছ থেকে খবর পেয়ে রিজলী টরেন্স হোটেলে এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে বললেন, "মিঃ টেগোর, হ্যারিয়েট ফোন করে বলেছে যে আমি যেন দেখি যে আপনি ঠিক মতো জাহাজে উঠেছেন। আপনার কিছু যদি লাগবে তো আমাকে বলুন।"

"মিসেস মুডীর করুণার শেষ নেই," রবীন্দ্রনাথ বললেন। "না, আমার কিছু লাগবেনা। আপনাদের কাছে আমাদের ঋণ বাড়ছে ছাড়া কমছেনা।"

"মিঃ টেগোর, আপনার মতো লোককে আমাদের মধ্যে পেয়ে

আমরাই ধন্য। শুধু দুঃখ রয়ে গেল যে আপনাকে ভাল করে নিউইয়র্ক সহর দেখতে পারলামনা।"

"ঈশ্বরের কৃপায় আবার যদি কোনদিন আসি, তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে ভাল করে সব ঘুরে দেখবো।"

রিজলি টরেন্স বিদায় নিতে রবীন্দ্রনাথ হোটেলের জানালা দিয়ে রাতের নিউইয়র্ক সহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলোকজ্জ্বল এই সহর যেন পৃথিবীর সব ধনকে আহরন করে তৈরী। রাস্তায় বেরোলেই দেখা যায় লোকের ব্যস্ততা, সব সময়েই যেন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে লোকে চলাফেরা করছে, কথা বলছে। ঠিক লণ্ডনের মতো আর কী, তবে মনে হয় জীবনের গতিশীলতা এখানে লণ্ডনের থেকেও বেশী। লোকের যেন এখানে দুদণ্ড বসার ফুরসত নেই।

রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল পরাধীন ভারতের কথা। লোকের হাতে সেখানে সব নিস্ফল সময়, সময় দিয়ে কী করবে জানেনা। কী কোরে দেশের ও নিজের মঙ্গল হবে সে বোধ নেই। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তার যে সব কাজের স্বপ্ন, তা কি কোনদিন সফল হবে! আর কত যে সব স্বপ্ন, তাকে ঘিরে পাখা একবার মেলতে শুরু করলে যেন থামতেই চায়না। দেখা যাক কি হয়, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

জাহাজ যখন নিউইয়র্ক ডক থেকে সন্ধ্যেবেলায় ছাড়ল, তখন সব যাত্রীই ডেকের ওপর থেকে অপস্য়মান ম্যানহাটনের দিকে তাকিয়ে রইল। সেই সহর ইতিমধ্যেই আলোর মালা সাজিয়ে বসেছে। কবি ভাবতে লাগলেন, কে বলবে যে আমেরিকান ইণ্ডিয়ানরা এখানে তিনশ বছর আগেও পালক পড়ে ঘুরে বেড়াত, এই সব জায়গা ঘন জঙ্গলে ভর্তি ছিল। এখন ম্যানহাটনের স্কাইস্ক্রেপারগুলি বহুদূর হতে দেখা যায়, আলোর হাতছানি দিয়ে সে সহর যেন সবাইকে পরিচিত হবার জন্য ডাকছে। আর কী কোনদিন নিউইয়র্কে আসা হবে!

ডেকের চেয়ারে বসে রবীন্দ্রনাথ ভাবতে লাগলেন, তাঁর এই আমেরিকা ভ্রমণ যে এমনভাবে সম্পূর্ণ হবে তা যাত্রার আগে ঘুনাক্ষরেও

কল্পনা করতে পারেননি। ভেবেছিলেন আর্বানায় কয়েকমাস থেকে রথী ও বৌমাকে রেখে তারপর ইউরোপে ফিরে যাবেন। তা আর হোলনা। এখানে বক্তৃতা তৈরী করা ও ইংরেজী অনুবাদেই সময় গেল। রথীর জন্য কষ্ট হয়, জানেন কিছুটা স্বার্থপরের মতো কাজ করেছেন। কিন্তু সে তো নিজের স্বার্থের জন্য নয়। শান্তিনিকেতনকে ঘিরে তাঁর যে সব পরিকল্পনা আছে, তার জন্য তাঁর পাশে রথীকেও দরকার। এই মহৎ যজ্ঞে পুত্রের তো পিতার পাশেই থাকা উচিত।

একটু পরেই রথী ও প্রতিমা তাঁর কাছে এসে বসল। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "রথী, তোমার কথাই ভাবছিলুম। তোমার পড়াশুনো শেষ না হতেই তোমাকে নিয়ে আসা আমার উচিত হয়নি।"

রথী উত্তর দিল, "বাবা মশায়, এ সম্বন্ধে তো আগেই আমাদের কথা হয়েছে। এ নিয়ে আবার ভেবে মন খারাপ করবেননা। একটা অতিরিক্ত ডিগ্রী নিয়ে আমার কীই বা লাভ হোত। আমি তো আর সরকারী চাকরি করতে যাচ্ছিনা। বরং শান্তিনিকেতনে যত তাড়াতাড়ি ফিরে তার উন্নতিতে লাগতে পারি ততই মঙ্গল।"

"সেই জন্যই তো তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে আপত্তি করছিনা রথী। শান্তিনিকেতনের জন্য আমার অনেক পরিকল্পনা আছে। আমি চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার গবেষনার জন্য একটি ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠিত হোক আর তুমি তার ভার নাও।" তারপর প্রতিমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "আর বৌমা ভার নিক এই বৃদ্ধের পুরাতন দেহের তদারকিতে যতদিন না তা খাঁচামুক্ত হয়।"

প্রতিমা তাড়াতাড়ি রবীন্দ্রনাথের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, "অমন কথা আপনি বলবেননা বাবা মশায়। আপনি আমার জন্য কী করেছেন তা আমি মুখ ফুটে কোনদিন বলতে পারবোনা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থদেহে সুদীর্ঘকাল আমাদের মধ্যে থাকুন।"

রথী বলল, "শিকাগোতে হোমিওপ্যাথি করেও আপনার অর্শের

ব্যথা কমলোনা ভেবে আমার খুব খারাপ লাগছে। লণ্ডনে যদি অস্ত্রোপচার করানো যেত তাহলে সবচাইতে ভাল হোত।"

"তুমি তার জন্য ভেবোনা রথী। অপারেশনের বৃহৎ খরচের মধ্যে আমরা যেতে পারিনা। শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থা তো তুমি জানো। ঈশ্বরের কৃপায় এ ব্যথা আমি সহ্য করতে পারবো। শোনো, একটু কাজের কথা বলি। পরশু দিন হচ্ছে আমাদের বাংলা নববর্ষ। প্রত্যেক বছর এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আমরা উৎসবের মধ্য দিয়ে এই দিনটি পালন করি। কিন্তু জাহাজে তো তা হবার উপায় নেই। এসো আমরা অতি প্রত্যুষে ডেকের এক কোনায় বসে সূর্যদেবকে প্রণাম করে নববর্ষ যাপন করি।"

তাই হোল, সেদিন সূর্য ওঠার আগে স্নান সেরে পূর্বাস্য হয়ে তিনজনে সূর্যবন্দনা করলেন। আস্তে আস্তে ভোরের কুয়াশা কাটিয়ে সূর্যের প্রথম রশ্মিকণা ওদের মুখে লাগল। সেই হোল যেন এক রবির কাছে আর এক রবির অনুচ্চারিত পুরস্কার।

সে দিনটি ছিল সত্যিই বড় শান্ত। গতবার আমেরিকায় যাবার পথে আতলান্তিক সাগর খুবই উত্তাল ছিল। এবারও তিনি খুব শান্ত নন। কিন্তু 'অলিম্পিক' জাহাজটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে অনেক বড়ো, দোলা অনেক কম দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথের এবার আর কোন 'সী সিকনেস' দেখা দিলনা।

সেদিন রাত্রে তিনি শান্তিনিকেতনে অজিত চক্রবর্তীকে এই ঘটনাটি চিঠি লিখে জানালেন: "প্রত্যেকবার আমার চিরপরিচিত পরিবেষ্টনের মাঝখানে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে নববর্ষের প্রণাম নিবেদন করেছি—কিন্তু এবার আমার পথিকের নববর্ষ, পারে যাবার নববর্ষ।"

আর মিসেস মুডীকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জাহাজ থেকে দুদিন পরে লিখলেন:

"প্রিয় বান্ধবী,

আমরা আগামী কাল রাত্রে আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছবো। কিন্তু এই জাহাজ ছাড়ার আগেই আমি আপনাকে বলতে চাই আপনার বন্ধুত্ব কিভাবে আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে এবং আমি জানি যে আপনার সহানুভূতি আমার সমস্ত কাজের ও আকাঙ্খা-পূরণের শক্তি যোগাবে।

গত সোমবার ছিল আমাদের বাঙালী নববর্ষের দিন এবং সেদিন আমরা তিনজনে সেলুনের কোনায় বসে প্রার্থনায় বসেছিলুম। আমরা ঈশ্বরকে এই বলে ধন্যবাদ দিতে পারি যে তাঁর অনুগ্রহেই অনেক হৃদয়ের সম্মেলনে আমাদের জীবন অনেক সমৃদ্ধ হয়েছিল এবং প্রেম ও ভালোবাসা আমাদের অজ্ঞাত স্থানেও আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। এই বছর সমুদ্র অতিক্রম করার সময় নববর্ষ আমাদের কাছে এসেছে এবং আমি অনুভব করি যে আমার জীবন এক বিরাট সমুদ্রযাত্রায় ভাসিত হয়েছে যা ভালবাসা, আশা ও প্রিয়বন্ধুদের শুভেচ্ছা দ্বারা পূর্ণ।

আশাকরি আবার আমাদের দেখা হবে ; যদি না হয় তাহলে অন্তত এই বলে যেন আশ্বস্ত হই যে আমাদের সাক্ষাত ঈশ্বরের আশীর্বাদে ভরা ছিল, যে এটি কেবলমাত্র সামাজিক মিলন নয়, যা সুখকর ও সাময়িক, বরং এ আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য পূরণে কিছুটা সাহায্য করবে। আসুন আমরা অহং-এর সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর-আরাধনার প্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে যাই, তাঁর প্রেম ও সেবাতেই জীবন উৎসর্গ করি এবং এই অনুভব করি যে আমরা পাশাপাশি চলেছি। অতীতের জন্য অনুতাপ করবেননা, বর্তমানের দ্বারা অভিভূত হবেননা, জীবনের দৈনন্দিন তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতার জাল থেকে মুক্ত হয়ে আনন্দের সঙ্গে আপনার আনন তাঁর দিকে ফেরান ; তিনি অনন্তপ্রেমিক ও অমর-জীবন।

আপনার স্নেহশীল বন্ধু,

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

রবীন্দ্রনাথ কী তখন ঘুনাক্ষরেও জানতেন যে মাত্র দুমাস বাদেই মিসেস মুডীর সঙ্গে আবার তাঁর লণ্ডনে সাক্ষাত হবে !

॥ নয় ॥

এবার লণ্ডনে এসে রবীন্দ্রনাথ আর হোটেলে উঠলেননা। আগের ব্যবস্থামত রথী ও প্রতিমাকে সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলেন রোদেন-স্টাইনের বাড়িতে। কলিং বেলের শব্দ শুনতে পেয়েই রোদেনস্টাইন দোর গোড়ায় এসে কবির ডান হাত নিজের দুহাতের মধ্যে জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানালেন।

"ওয়েলকাম টু গ্রেট বৃটেন এগেইন্, মিঃ টেগোর। আপনার 'সং অফারিংস্' তো বিগ্ হিট্ এখানে। লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজের সবাই এখন আপনার কবিতা আলোচনা করছে। 'টাইমস্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্ট' ও 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান'-এর প্রশংসার পরে আপনার কবিতা যে সমাদৃত হবে সে তো অত্যন্ত স্বাভাবিক।"

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন, 'সবই তো তোমার জন্য বন্ধু।' মুখে বললেন, "আপনার জন্যই আমার এই পরিচিতি, মিঃ রোদেনস্টাইন। আপনি আমার জন্য অতটা না করলে আজকে আমার নাম বিশেষ কেউ জানতোনা।"

"না, না, তা সত্যি নয়, মিঃ টেগোর। গোলাপের সুবাস চাপা দিয়ে রাখা যায়না। আসুন, আসুন, সোফায় এসে বসুন। রথী ও প্রতিমা, তোমরা দোরগোড়ায় দাড়িয়ে রইলে কেন? এ বাড়ি তো তোমাদের নিজেদের বাড়ির মতই।"

ততক্ষণে ওদের গলা শুনতে পেয়ে মিসেস্ রোদেনস্টাইনও ড্রইং রুমে চলে এসেছেন, "মিঃ টেগোর, আপনাদের দেখে কী খুসী হয়েছি তা বোঝাতে পারবোনা। বাচ্চারা তো খালি বলে, 'আংকেল টেগোর কবে আসবে, কবে আবার দেখতে পাবো?' জাহাজে কেমন কাটলো?"

"খুব খারাপ নয়," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "কিন্তু আমেরিকায় যাবার সময় খুব ধকল গিয়েছিল। সে তো আমি আপনাদের চিঠিতেও

লিখেছিলুম।

"হাঁ, হাঁ, তা আমরা জানি। সেইজন্যই আপনার শরীরের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলাম।"

ততক্ষণে ওদের ছেলেমেয়ে জন, মাইকেল, র‍্যাচেল ও বেটি ছুটে এসেই কবিকে জড়িয়ে ধরেছে। রবীন্দ্রনাথ কিছু না বলে ওদের সোনালী চুলে হাত বোলাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর কবি ষ্টুডিওতে এসে বসতেই রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, একটি ভীষণ আনন্দের খবর আছে। লণ্ডনের ম্যাক্‌মিলান পাবলিশার্স আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র জনসংস্করণ বার করতে রাজী হয়েছে। এই সব রিভিউ পড়ার পর ওরা বুঝতে পেরেছে যে আপনার 'গীতাঞ্জলি' বা 'সং অফারিংস্' একটি হট্ প্রপার্টি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এই বই থেকে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় তাহলে আমার স্কুলের ঋণের বোঝা কিছুটা কমবে। যাই হোক, আমেরিকায় থাকতে আমি যে সব বক্তৃতা দিয়েছিলুম, তার পুরো ম্যানুস্ক্রিপ্ট আপনাকে দেখাবার জন্য সঙ্গে এনেছি। আপনাকে তো এর কয়েকটি অধ্যায় ইতিমধ্যেই ডাকে পাঠিয়েছিলুম।"

"হাঁ, এইগুলি যে বই আকারে ছাপানো উচিত তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কি টাইটেল দেবেন বইটির?"

"ভাবছি এই প্রবন্ধগুলির ভাবধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য সংস্কৃত নাম দেবো 'সাধনা,' যার ইংরেজী সাব্-টাইটেল হবে 'Self realization of Life'।"

"খুবই তাৎপর্যপূর্ণ নাম হবে। এদিকে খবরের কাগজের রিপোর্টারেরাও খোঁজ করছে আপনি কবে এখানে আসছেন। আমি ওদের আপনার আসার তারিখ বলেছি। কালকে একজন আপনার সাক্ষাতকার নিতে আসবে।"

"আবার এখানেও এই সব ঝামেলা, মিঃ রোদেনস্টাইন!"

রবীন্দ্রনাথ একটু ক্ষুব্দস্বরে বললেন, "আমেরিকায় শেষের দিকে ওরা আমাকে বড় জ্বালিয়ে মেরেছে। বিশেষ করে আমার এই দাড়ি ও লম্বা পোষাক দেখে সবাই আমাকে মনে করতো যে আমি ওখানে প্রাচ্যের ধর্ম প্রচার করতে এসেছি।"

"কিন্তু মিঃ টেগোর, আপনি এখন ইংরেজীভাষী জগতে একজন বিখ্যাত কবি। ওরা এখানে আপনাকে নিশ্চয়ই সাহিত্য-বিষয়ক প্রশ্ন করবে।"

"তাই যেন সত্যি হয়, মিঃ রোদেনস্টাইন। কিন্তু আপনি তো জানেন, ওরা রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে সবরকম প্রশ্ন করে আমাকে জর্জরিত করবে।"

"ওয়েল্, সে হচ্ছে প্রেসের স্বাধীনতা, মিঃ টেগোর।"

"সে আমি ভাল করেই জানি এবং তার মূল্যও আমি বুঝি। মনে হচ্ছে এখন থেকে আমাকে সবরকম প্রশ্নের জন্যই তৈরী হতে হবে।"

পরের দিন ব্রেক্‌ফাষ্ট খাওয়ার পর রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার ছবি তো 'গীতাঞ্জলি'র প্রচ্ছদপটের জন্য আগেই এঁকেছিলাম আপনার আরো অনেক স্কেচের সঙ্গে। এবার আপনাদের একটি গ্রুপ-ফটো তুলতে চাই। ফটোগ্রাফার আগেই ঠিক করেছি, নাম জন ট্রেভর। কিছুক্ষণ পরেই সে আসবে। এটি আমাদের কাছে একটি বড় সম্পদ হয়ে থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আপনাদের ছবিও এই সঙ্গে চাই। এই গ্রুপ-ফটোর কপি আমাদের কাছেও মহামূল্যবান স্মৃতি হয়ে থাকবে। শিকাগোতে মিসেস মুডীর সঙ্গে আমাদের ফটোটি ভারী সুন্দর উঠেছিল। বৌমা আপনাদের বাক্স খুলে দেখাবে'খন।"

কিছুক্ষণ পরে ফটোগ্রাফার এসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রোদেনস্টাইন ও ওদের চার ছেলেমেয়ের ছবি তুললো। আলাদাভাবে মিসেস রোদেনস্টাইন ও প্রতিমার ছবিও বেটি ও র‍্যাচেলের সঙ্গে তোলা হোল। কথা রইল ছবিগুলির যেন অতিরিক্ত কপি করানো হয়। অনেকেরই

চাহিদা আছে।

ফটোগ্রাফার বিদায় নিতে না নিতেই দরজায় আবার কলিং বেলের শব্দ শোনা গেল। এবার ওদের বাড়ির পরিচারিকা এসে বলল যে লণ্ডনের এক পত্রিকার রিপোর্টার মিঃ টেগোরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ভদ্রলোক ড্রইংরুমে ঢুকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বললেন, "মিঃ টেগোর, শুনলাম আপনিই নাকি এখন ভারতের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কবি।"

রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, "আপনি কোথায় এসব কথা শুনেছেন জানিনা। আমি একজন কবি, প্রসিদ্ধ কি অপ্রসিদ্ধ তা বলতে পারবো না।"

"ওয়েল্, আপনার 'সং-অফারিংস্' কাব্যগ্রন্থের তো প্রায় সব কাগজেই প্রশংসা বেরিয়েছে।"

"সে আমার সৌভাগ্য।"

"আপনাকে আমি কয়েকটি রাজনৈতিক প্রশ্ন করতে পারি কী? শুনেছি বাংলা যখন দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল, আপনি তখন তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তার কারণ জানতে পারি কী?"

"নিশ্চয়ই। আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি বাংলা এক অখণ্ড ভূমি। প্রাচীন কাল থেকে বাংলাদেশ এক স্বতন্ত্র দেশ হিসেবেই অবস্থিত ছিল। আজ কৃত্রিমভাবে তাকে ভাগ করলে বাঙালীর আত্মাই দ্বিখণ্ডিত হবে।"

"কিন্তু বাংলার মুসলিমরা তো আপনাদের এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তারা মনে করেছে এ হচ্ছে হিন্দু 'ভদ্রলোক'দের আন্দোলন।"

"এটা সত্যিই যে সাধারণ মুসলিমরা হিন্দুদের মতো মনে-প্রাণে এ আন্দোলনে যোগ দেয়নি। তার প্রধান কারণ অনেক মুসলিম নেতাকেই বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্ররোচনা দিয়েছে যে এ হচ্ছে কেবলমাত্র

হিন্দুদেরই আন্দোলন। কিন্তু এ হচ্ছে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বাঙালীদের আন্দোলন। আর এটি যে যুক্তিসঙ্গত আন্দোলন ছিল তার প্রমাণ দু-বছর আগে বঙ্গভঙ্গ আইন রদ-এর মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়। কিন্তু তার জন্য আমাদের মাশুল দিতে হয়েছে ঠিকই। কলকাতা থেকে বৃটিশ ভারতের রাজধানী দিল্লীতে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।”

“দিল্লীতে লর্ড ও লেডী হার্ডিং-এর হাতির সামনে যে বোমা ছোড়া হয়েছে, আপনি সে কাজ সমর্থন করেন ?”

“আদৌ নয়। আমি মনে করি এ সব কাজ কাপুরুষতারই লক্ষণ। কোন প্রকার হিংসাত্মক কাজই আমি সমর্থন করিনা, উদ্দেশ্য তার যতই মহৎ হোক।”

রোদেনস্টাইন বুঝতে পারলেন যে রবীন্দ্রনাথকে ক্রমাগত এইসব রাজনৈতিক প্রশ্ন করে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলা হচ্ছে। কিন্তু রিপোর্টার নাছোড়বান্দা। প্রশ্নের ঝড় যেন থামেনা।

“ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত ?” রিপোর্টার জিজ্ঞাসা করলেন।

“বৃটিশ শাসনে ভারতের যে অনেক উন্নতি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। রাজা রামমোহন রায়ই প্রথমে সেই সব সুকৃতির দিকগুলি আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছিলেন। আমাদের অনেক কুসংস্কার, অনেক কুপমণ্ডুকতা আজ বৃটিশ শাসনের ফলে দূরিত হয়েছে। কিন্তু এ-ও মনে রাখতে হবে যে ভারতীয়দের যদি সারাক্ষণই হেয় চক্ষে দেখা হয়, যদি তাদের সর্বদাই দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলে গণ্য করা হয়, তাহলে তারা কখনোই বৃটিশ শাসনকে অবিমিশ্র আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করবেনা। আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। চলার পথে কেউ একটু পিছিয়ে পড়লে তাকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নয়।”

রোদেনস্টাইন আর থাকতে পারলেননা, এই ইন্টারভিউ থামিয়ে দেবার জন্য রিপোর্টারকে বললেন, “আপনাকে এইবারে ক্ষমা করতে

হবে। মিঃ টেগোর গতকাল মাত্র আমেরিকা থেকে জাহাজে করে এসেছেন। বুঝতেই পারছেন উনি ভীষণ ক্লান্ত, তারপর ওর শরীরও খুব দুর্বল।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আমার যা জিজ্ঞাসা করার তা করেছি। মিঃ টেগোর, আপনার সময়ের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ," বলে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে চলে গেলেন।

রিপোর্টার বিদায় নিতেই রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি কী সুন্দরভাবে প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন! ও তো আপনাকে খানিকটা নাজেহাল করতেই এসেছিল।"

"তা জানিনা মিঃ রোদেনস্টাইন। তবে আমি যা বলেছি তা অন্তর থেকেই বলেছি। সত্যি কথার তো কোন মার নেই।"

"সে কী আর আমি জানিনা? সেই জন্যই তো আপনার প্রতি শ্রদ্ধা আমার দিন দিনই বাড়ছে।"

সংবাদপত্রের প্রচারের ফলে রবীন্দ্রনাথের নাম এখন আর ইংলণ্ডেই সীমাবদ্ধ নেই, ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ ও তার প্রশংসাপূর্ণ সমালোচনার পর ভারতের অন্য প্রদেশের শিক্ষিত লোকের কাছেও কবির নাম অনেক পরিচিত হয়েছে। সেই সঙ্গে গুজবও উঠেছে যে রবীন্দ্রনাথ নয়, ইয়েট্‌স্‌-ই আসলে এই কবিতাগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করে দিয়েছেন। কলকাতা থেকে ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা কবিকে চিঠি লিখে এই ঘটনার সত্যতা জানতে চাইল। রবীন্দ্রনাথ আর থাকতে না পেরে তাকে উত্তরে লিখলেন:

"গীতাঞ্জলীর ইংরেজী তর্জমা···যে কেমন করে লিখলুম এবং কেমন করে লোকের এত ভাল লেগে গেল, সেকথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলুম না। আমি যে ইংরেজী লিখতে পারিনে এ কথাটা এমনি সাদা যে এ সম্বন্ধে লজ্জা করবার মতো অভিমানটুকুও আমার কোনদিন ছিল না। রোদেনস্টাইন···যখন কথা প্রসঙ্গে আমার কবিতার নমুনা পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, আমি কুণ্ঠিত মনে তাঁর হাতে আমার

খাতাটি সমর্পণ করলুম। তিনি যে অভিমত প্রকাশ করলেন সেটা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না। তখন তিনি কবি ইয়েট্‌সের কাছে আমার খাতা পাঠিয়ে দিলেন।”

কিন্তু লণ্ডনে রিপোর্টারদের প্রশ্ন করার যেন শেষ হয় না। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানত তিনটি : রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাস করেন কিনা, ভারতে বৃটিশ শাসন মঙ্গলজনক কিনা, আর সাহিত্যিক রুডিয়ার্ড কিপ্‌লিং সম্পর্কে তাঁর কী অভিমত।

শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বললেন, “কিপলিং আজ একজন বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিক। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। কিন্তু তাঁর সঙ্গে আমাকে তুলনা করা সমীচীন হবে না। তিনি তাঁর লেখায় ভারতের যে সমাজ অঙ্কিত করেছেন, আমার লেখার জগত তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এই পৃথিবীতে অসংখ্য বিষয় আছে, অনন্ত বৈচিত্র্য আছে। শিল্পীরা তার ছবি আঁকেন, কবিরা তার ভাষা দেন, সাহিত্যিকরা তাই নিয়ে গল্প-উপন্যাস লেখেন। সবাইকে যে একই বিষয় নিয়ে লিখতে হবে তার কোন অর্থ নেই। কিপ্‌লিং একরকম ভাবে জগত দেখেছেন, আমি অন্য দৃষ্টিতে ভারতকে দেখি।”

কিন্তু রিপোর্টাররা যেন সেই একই কথা বারবার শুনতে চায়। তাদের জ্বালায় রবীন্দ্রনাথের জীবন অতিষ্ঠ হবার উপক্রম। খানিকটা যেন মরিয়া হয়েই তিনি শিকাগোতে হ্যারিয়েট মনরোকে এইসময়ে লিখলেন :

“রিপোর্টারদের জ্বালায় আমার জীবনের শান্তি উপশম হয়েছে। কোথায় এখন মিসেস ভন্ মুডী যিনি আমার জীবনে শান্তি ও শৃঙ্খলা এনে দেবেন?”

ঈশ্বরের এমনই আশীর্বাদ যে ব্যবসা উপলক্ষে মিসেস মুডীর তখন লণ্ডনে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। লণ্ডনে তাঁর কেটারিং-এর ব্যবসার একটি শাখা খোলা হয়েছে, সেটি দেখা-শুনো করার ব্যাপারে তিনি শীঘ্রই সেখানে আসবেন। কিন্তু পারিবারিক কারণে তখনই আসতে

পারছেন না, তাই ঠিক হোল যে জুন মাসের মাঝামাঝি নাগাদ তিনি লণ্ডনে পৌঁছবেন।

রবীন্দ্রনাথ সেই সংবাদ শুনে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। জানেন যে মিসেস মুডীর তত্ত্বাবধানে তাঁর জীবনে আবার শৃঙ্খলা ফিরে আসবে, আবার কিছুটা শান্তির মুখ দেখতে পাবেন।

এবার লণ্ডনে এসেও রবীন্দ্রনাথ সাউথ কেংসিংটনে বাসা নিলেন— সাঁইত্রিশ নম্বর অ্যালফ্রেড প্লেস্-এ। সংবাদ পত্রের খবরে ও রোদেনস্টাইনের কাছ থেকে শুনতে পেয়ে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা আবার দলে দলে কবির সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

রবীন্দ্রনাথের এই জনসংবর্ধনা ভালও লাগে, আবার ভালও লাগেনা। ভীড়ের মধ্যে যখন তিনি হাঁপিয়ে ওঠেন, তখন সেখান থেকে পালিয়ে যাবার জন্য তাঁর প্রাণ সততই আই-ঢাই করে। আবার কেউ যদি বিশেষ খোঁজ না করেন, তখন তাঁর অভিমান হয় যে বন্ধুরা বুঝি তাঁকে ভুলেই গেলেন।

কিন্তু এক্ষেত্রে লণ্ডনের বন্ধুরা যেই শুনলেন যে আমেরিকায় কবির বক্তৃতার খুব সমাদর হয়েছে, তখন তাঁরাও ধরলেন যে রবীন্দ্রনাথকে এখানেও সেই সব বক্তৃতা দিতে হবে। 'কোয়েষ্ট' পত্রিকার সম্পাদক রেভারেণ্ড জি. আর. এস্. মীড্ তাঁর পত্রিকার পক্ষ থেকে লণ্ডনের ক্যাক্স্টন্ হলে এই বক্তৃতার ব্যবস্থা করলেন। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'সাধনা'র পাণ্ডুলিপি থেকে ছটি প্রবন্ধ পরপর সেখানে পড়ে শোনালেন। শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে সেই সব বক্তৃতা শুনলো। তারা দেখল যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী খুবই সুন্দর, যথাযথ। মাঝে মাঝে হয়ত দু-একটি কথায় 'অ্যাক্‌সেণ্ট্' একটু বেসুরো শোনায়, তবু তাঁর ধীর, অমৃত্তোজিত কণ্ঠস্বর ও বক্তৃতার বিষয়বস্তু শ্রোতৃবৃন্দকে ঠিকই আকর্ষণ করলো। আর্নেস্ট্ রাইস্-এর শুনতে শুনতে মনে হোল যে লণ্ডন সহরের সব কোলাহল যেন অদৃশ্য জাদুকাঠির স্পর্শে থমকে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের

ভাষণ শুনতে বসেছে।

যদিও রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা'র পাণ্ডুলিপিতে উপনিষদের বাণীই বেশী উদ্ধৃত করেছেন, তবু এ ব্যাখ্যা তাঁর সব নিজের। প্রাচীন আর্য ঋষিরা সেই বিগত যুগে অরণ্যের গভীরে সমাহিত হয়ে জীবনের যে সব সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ এখানে তার পুনরাবৃত্তি করলেন না, বরং তার কালোপযোগী ব্যাখ্যাই দিলেন। তাঁর 'আত্মবোধ', 'পাপবোধ' ও 'বিশ্ববোধ' বক্তৃতার মধ্য দিয়ে সনাতন ভারতের যে সভ্যতা ও সাধনার ধারা ব্যক্ত করলেন, তা লণ্ডনের শ্রোতৃ-মণ্ডলীর কাছে একেবারেই নতুন বলে বোধ হোল। বক্তৃতার মঞ্চে তাঁর সেই জোব্বা-পরা শ্মশ্রুমণ্ডিত দীর্ঘ দেহ দেখে অনেকেরই মনে হয়েছিল যে বাইবেলের কোন হিব্রু প্রফেট্ 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট'-এর শাশ্বত সত্যকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করতে এসেছেন।

আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্ একদিন রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, উইল্-এর কাছ থেকে আপনার এই বক্তৃতার ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট্ আমি ম্যাক্‌মিলান কম্পানীকে দেখিয়েছি। তাদেরও এগুলি খুব ভাল লেগেছে। তারা আপনার 'দি গার্ডেনার'-এর পরেই এটি ছাপাতে চায়।"

"সে তো খুবই ভাল খবর, মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্", রবীন্দ্রনাথ বললেন। "জানিনা আপনার এই সব প্রচেষ্টার জন্য কী বলে ধন্যবাদ দেবো।"

রোদেনস্টাইন তাঁর ইজেল থেকে সরে এসে বললেন, "আরও একটি সুখবর আছে, মিঃ টেগোর। এখানকার 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ম্যাসিংঘাম্ আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' পড়ে ভীষণ অভিভূত। উনি চাইছেন যে প্রত্যেক সপ্তাহে আপনি ওদের পত্রিকায় ছোট ছোট কবিতা অনুবাদ করে পাঠান। তার জন্য ওরা আপনাকে যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবে।"

"তাহলে তো খুবই ভালো হয়। টাকাটাও আমার স্কুলের কাজে

লাগবে।

"মিঃ ম্যাসিংঘাম্ আপনার বড় লেখাও ছাপাতে রাজী। আমি বলেছি যে আপনার 'কিং অফ্ দি ডার্ক চেম্বার' নাটকটির ইংরেজী অনুবাদ হয়ে গেছে। আপনি কী ওখানে এটি প্রকাশ করতে চান?"

"এ নাটকটির এখন পর্যন্ত পুরোপুরি মনের মতো সংস্কার করা হয়নি, মিঃ রোদেনস্টাইন", রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "এ অবস্থায় কী এটি ছাপানো ঠিক হবে?"

"আপনি ঠিকই বলেছেন, মিঃ টেগোর। এটি হয়ত এখনি ছাপানোর উপযুক্ত হয়নি। আমি এ ব্যাপারে অন্যদেরও অভিমত জানতে চাই। ঠিক আছে, আমার বাড়িতে একদিন সবাইকে ডাকি। আপনি তার অংশবিশেষ পড়ে শোনান। তাহলে···উপস্থিত সব গুণী ব্যক্তিদের অভিমতও তখন জানতে পারা যাবে!"

রবীন্দ্রনাথের আমেরিকা থেকে ফেরার পর তখন অবধি কবি ইয়েট্স্-এর সঙ্গে সাক্ষাত হয়নি। তাঁর অনুরোধে রোদেনস্টাইন একদিন ইয়েট্স্কে লাঞ্চে ডাকলেন যাতে কবি তাঁর সঙ্গে 'দি গার্ডেনার'-এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হতেই ইয়েট্স্ এগিয়ে এসে সাগ্রহে তাঁর করমর্দন করে বললেন, "ওহ্, মিঃ টেগোর, আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র সাফল্যে আমি এতো আনন্দিত যে ভাষায় তা প্রকাশ করতে পারবোনা।"

"তার জন্য মিঃ রোদেনস্টাইনের মতো আপনার সাহায্যও কম নয় মিঃ ইয়েট্স্। জানিনা আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেবো। আপনি প্রকৃতপক্ষেই কবিদের বন্ধু।"

"আমাকে কোন ধন্যবাদ দেবার দরকার নেই, মিঃ টেগোর। এ বইয়ের যে ভূমিকা লিখেছি, তার প্রত্যেকটি কথার আপনি উপযুক্ত। আপনার কবিতা উইল্-এর কাছ থেকে প্রথম পেয়ে কী রকম অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম তা তো আপনাকে ইতিমধ্যেই বলেছি। আপনাকে

সম্বর্ধিত করতে পেয়ে আমরাই ভাগ্যবান। মিঃ টেগোর, আশা করি আপনার 'দি গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের মানুস্‌ক্রিপ্টের সংশোধনে আপনার কোন আপত্তি নেই? ম্যাক্‌মিলান কম্পানী চায় যে আমি একবার দেখে দি।"

"আপত্তি! মিঃ ইয়েটস্‌, আপনি যদি এটি সংশোধন করে দেন, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে কোরবো।"

"আপনি তো জানেন আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস আপনার হয়ে ম্যাক্‌মিলানের সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। ও সবচেয়ে ভাল 'টার্মস্‌ অ্যাণ্ড কনডিশন' আপনার জন্য নেগোশিয়েট করতে পারবে।"

"সে আমি জানি, মিঃ ইয়েটস, এবং তার জন্য আমি তার কাছেও অসীম কৃতজ্ঞ।"

কফি খেতে খেতে ইয়েট্‌স্‌ বললেন, "মিঃ টেগোর, শুনলাম আমেরিকায় থাকতে আপনার পাবলিক্‌ লেকচারগুলি ভীষণভাবে সাক্‌সেসফুল্‌ হয়েছিল। এখানে ক্যাক্‌স্টন্‌ হলে আপনার বক্তৃতা কেমন হোল?"

রবীন্দ্রনাথের সেই সলজ্জ উত্তর থেকে রোদেনস্টাইনই রক্ষা করলেন। বললেন, "উইল্‌, আপনাকেও সেখানে আমরা আশা করেছিলাম। টেগোরের অপূর্ব প্রকাশ ও সুন্দর যুক্তিতে শ্রোতারা একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিল।"

"আমি:আসতে পারিনি বলে আমাকে ক্ষমা করবেন, মিঃ টেগোর। নিজের লেখা নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে সময় করে উঠতে পারিনি। কিন্তু মিঃ টেগোর, আপনার 'পোস্ট অফিস' নাটকের ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট পড়ে আমি ভীষণ অভিভূত হয়েছি। আমি মনে করি এ নাটকটির লণ্ডন স্টেজে অভিনীত হওয়া উচিত। এ বিষয়ে ডাবলিনের অ্যাবি থিয়েটারের লোকদের সঙ্গে কথা বলে দেখবো। এই কম্পানীর সব অভিনেতাই কিন্তু আইরিশ। তাদের 'বরোগ্‌' অ্যাক্‌সেণ্ট্‌ হয়ত আপনার ভাল লাগবেনা।"

"মিঃ ইয়েটস্, আমাদেরই সবার ইংরেজী উচ্চারণে 'অ্যাক্সেন্ট্' আছে। কোন ভারতীয় অভিনেতা যদি অমলের চরিত্রের সংলাপ ইংরেজীতে বলে, তাহলে সেখানেও অ্যাক্সেন্ট্ এসে পড়বে।"

"সেটি অবশ্যি সত্য কথা।" ইয়েটস্ উত্তর দিলেন, 'আপনার 'চিত্রা' নাটিকাটিও আমার ভাল লেগেছে, কিন্তু দুটিই একসঙ্গে মঞ্চস্থ করা যাবে কিনা সন্দেহ আছে, যাই হোক, আমি অ্যায়ের্ল্যাণ্ডের অ্যাবি থিয়েটারের সঙ্গে কথা বলে দেখি। বিশেষ করে 'পোষ্ট অফিস' যদি সাফল্যমণ্ডিত হয়, তাহলে ওরা 'চিত্রা' মঞ্চস্থ করতে উৎসুক হতে পারে।"

"আপনি যাই ঠিক করবেন, আমার পক্ষে তাই যথার্থ হবে, রবীন্দ্রনাথ বললেন। "মনে রাখবেন প্রথম থেকেই আমি আপনাদের হাতে।"

"না, না, মিঃ টেগোর, আপনি আর কারুরই হাতে নেই। এখন আপনি নিজের নামেই বিখ্যাত। 'গীতাঞ্জলি'র কবি হিসেবে বিশ্বে আপনার নাম ছড়িয়ে গেছে। আপনি এখন রোদেনস্টাইন বা আমার ওপর নির্ভরশীল নন। ম্যাকমিলান থেকে আপনার এই বইগুলি যদি প্রকাশিত হয়, তাহলে সারা পৃথিবীতে আপনি উল্লেখযোগ্য কবি হিসেবে পরিচিত হবেন।"

'চিত্রা' নাটিকাটি রবীন্দ্রনাথ মে মাসের প্রথম দিকে লণ্ডনের ক্রমওয়েল রোডের 'সেণ্টার অফ্ ইণ্ডিয়ান আর্ট, ড্রামাটিক অ্যাণ্ড ফ্রেণ্ড্লি' সোসাইটির আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পড়ে শোনালেন। উপস্থিত সবারই তা ভীষণ ভাল লাগল। যদিও এই কাহিনী মহাভারতের অন্তর্গত বলে তাদের অনেকেরই জানা, তবু সেই চিত্রাঙ্গদাকে 'চিত্রা'য় রূপান্তরিত করে রবীন্দ্রনাথ ভারতের অতিপুরাতন কাহিনীকে সমকালীন আলোকে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করলেন, যেখানে অর্জুনের সঙ্গে চিত্রাঙ্গদার প্রেম দৈহিক কামনার আকর্ষণ অতিক্রম করে শাশ্বত প্রেমের রূপে পরিণত হোল।

রোদেনস্টাইন দশই জুন তাঁর বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের 'কিং অফ্ দি ডার্ক চেম্বার' নাটক পড়ার জন্য যে আয়োজন করেছিলেন, তাতে খুব একটা বেশী লোক হয়নি। তার প্রধান কারণ তখন গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, অধিকাংশই লণ্ডনের আবহাওয়া থেকে পালিয়ে গিয়ে গ্রামের বাড়ি বা সমুদ্র-সৈকতে আশ্রয় নিয়েছে। তাই রোদেনস্টাইন অনেক চেষ্টা করেও বেশী পরিচিত লোক যোগাড় করতে পারলেননা।

এইবার রোদেনস্টাইনের বাড়িতে তাঁর লেখা রবীন্দ্রনাথ নিজেই পড়লেন। 'কিং অফ্ দি ডার্ক চেম্বার' নাটক তাঁরও খুব প্রিয়। শিকাগোয় মিসেস মুডীর বাড়িতে এই 'রাজা' নাটক পড়ে যে রকম সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটলোনা। শ্রোতাদের সব চাইতে ভাল লেগেছিল রাজার আপাত-অদৃশ্য চলাফেরা, রানী সুদর্শনার রাজাকে ভুল বোঝা ও পরিশেষে রাজার সঙ্গে তার মিলন, যখন তিনি বললেন—'এসো, এবার আমার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো—আলোয়।'

নাটক পড়া শেষ হতেই সবাই হাততালি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানালেন। মে সিংক্লেয়ার বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার এই নাটকটি শুনে আমার মরিস মেটারলিংক-এর সিম্বলিক নাটকের কথা মনে পড়ছে।"

"আমিও তো এখানে 'সিম্বলিজম' গ্রহণ করেছি, মিস সিংক্লেয়ার," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "বলতে চেয়েছি সুদর্শনা বহুকাল পরে তার যে প্রভুর সঙ্গলাভ করল, সে প্রভু কোন বিশেষ রূপে, বিশেষ স্থানে, বিশেষ ভাবে নেই, সে প্রভু সকল দেশে, সকল কালে। আপন অন্তরের আনন্দরসে যাকে উপলব্ধি করা যায়, সেই অরূপরতনকেই সুদর্শনা অবশেষে লাভ করলো।"

"আমার শুধু ভয় হয় লণ্ডন স্টেজে এই নাটক অভিনীত হলে

কতটা সাফল্যলাভ করবে। প্রডিউসাররা সিম্বলিক নাটক স্টেজ করতে এতো ভয় পায়! তারপর বার্নার্ড শ যেভাবে লণ্ডন স্টেজের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য করে বসেছেন, সেখানে আর কারুর ঢোকা মুস্কিল। আপনার 'পোস্ট অফিস' নাটকের অভিনয়ের জন্য কতো ঝামেলা পোয়াতে হোল জানেন। শেষে ইয়েট্‌স্‌ যখন আইরিশ অভিনেতাদের আনার ব্যবস্থা করলেন, তখনই সব কিছু ঠিক হোল।"

আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস-ও সেই জমায়েতে ছিলেন। তিনি বললেন, "মিঃ টেগোর, এখানকার স্টেজে অভিনীত হোক বা না-হোক, নাটক হিসেবে এটি খুবই সার্থক। আপনি যদি চান, তাহলে ম্যাক্‌মিলানের সঙ্গে এ-নিয়েও কথা বলতে পারি। ওরা যদি এটি ছাপাতে রাজী হয়, তাহলে 'চিত্রা'র পরেই এটি বেরোবে।"

রবীন্দ্রনাথ পুরো ম্যানুস্‌ক্রিপ্টটি ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েসের হাতে দিয়ে বললেন, "এটিও আপনার 'বেবি', মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস। এটি নিয়ে আপনি যা খুসী তাই করতে পারেন।"

ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস হেসে বললেন, "যা খুসী তাই করবোনা, মিঃ টেগোর। দেখবো কন্‌ট্র্যাক্টের ওপরে কিছু বোনাস পাওয়া যায় কিনা। জর্জ ম্যাক্‌মিলানকে তো আমি আগেই বলেছি যে রয়াল্‌টির এ সব টাকাই মিঃ টেগোরের বেঙ্গলী স্কুলের পেছনে যাবে, তাঁর নিজের জন্য এক পয়সাও নয়।"

কথাটি শুনে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। বোলপুরের স্কুলের যে ক্রমবর্ধমান চাহিদা, সেখানে এই সব টাকা তার সামান্যই পূর্ণ করবে। মনে হচ্ছে একটা খুব বড় টাকার অঙ্ক না পেলে স্কুল সম্পর্কে তাঁর সব পরিকল্পনা কাগজ-কলমের বাইরে আর মুক্তি পাবেনা।

সবাই চলে গেলে রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে বললেন, "বন্ধু, আবার আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হলুম। এটি নাটক হিসেবে এখানে যদি অভিনীত না-ও হয়, তাহলেও বই হিসেবে বেরোলেও আমার

স্কুলের জন্য কিছুটা টাকা পাওয়া যাবে।”

“নিশ্চয়ই, তবে ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস যখন বলেছেন যে ম্যাক্‌মিলানকে ধরে এটির ছাপানোর চেষ্টা করবেন, তখন ওর থেকে আর ভাল নেগোশিয়েটর পাবেননা।”

“সে কী আর আমি জানিনা! ও আর আপনার জন্যেই তো ম্যাক্‌মিলান থেকে এই সব বই ছাপার প্রচেষ্টা সফল হতে চলেছে। যাই হোক, ‘নেশন’ পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ম্যাসিংঘামের সঙ্গে কথা বললুম, আমার কবিতাগুলির জন্য উনি পারিশ্রমিক দেবেন বলেছেন। জানেন তো, আমার সেই প্রসঙ্গ তুলতেই সংকোচ হচ্ছিল। কিন্তু কালীমোহন দেশ থেকে চিঠি পেয়েছে, ওর পরিবার ভীষণ অর্থকষ্টে ভুগছে। এখান থেকে যদি কিছু পাই, তাহলে কালীমোহনকে তা দিয়ে দিতে পারি।”

“আমি কালকেই মিঃ ম্যাসিংঘামকে আর একবার মনে করিয়ে দেবো, মিঃ টেগোর। প্লিজ, আপনি এ নিয়ে আর উদ্বিগ্ন হবেননা।”

কয়েকদিনের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ ‘নেশন’ পত্রিকা থেকে একটি চেক্ পেলেন। কালীমোহনের সঙ্গে দেখা হতেই বললেন, “এই চেকটি আমি ডাকযোগে দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ব্যাঙ্কে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে এই টাকাটা তুলে তোমার পরিবারকে দিতে জগদানন্দকে লিখে দিচ্ছি।”

কথাটি শুনে কালীমোহনের চোখে জল এল। রবীন্দ্রনাথের এতো সব কষ্টের ফল, সেই পারিশ্রমিকের সব টাকাটি অক্লেশে তাকে দিয়ে দিলেন। কবিকে কালীমোহনের ভীষণ পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছে হোল। কিন্তু মাথা নিচু হতেই রবীন্দ্রনাথ তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

“আরে, কালীমোহন, কী করছো, তোমার কী মাথা খারাপ হোল? আমি জানিনা শান্তিনিকেতনের জন্য তোমরা কী রকম স্বার্থত্যাগ করছো, তোমাদের জীবনের সব কিছুই সমর্পন করেছো? সে কিসের জন্য? শুধু একটি স্বপ্ন, একটি কল্পনাকে ধরে রাখার জন্য বই তো নয়। দ্যাখো,

এখন সেই স্বপ্নকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি কিনা !”

কথা ছিল রবীন্দ্রনাথ রথী ও প্রতিমার সঙ্গে ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরবেন। কিন্তু রোদেনস্টাইনের চেষ্টায় এই সময় তাঁর অর্শের অপারেশন ঠিক হয়ে গেল। তাই পুত্র ও পুত্রবধূকেই কবি ইউরোপ ঘুরে দেশে ফিরতে বললেন। প্রতিমার একদম ইউরোপ দেখা হয়নি, আবার কবে তাদের সে সুযোগ হবে তার ঠিক নেই। এদিকে ওদের একজনের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশে ফেরা উচিত। শান্তিনিকেতনের সবাই কবির দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে চঞ্চল। এখন 'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য বইয়ের অ্যাড্ভ্যান্স থেকে রবীন্দ্রনাথ যে টাকা পেয়েছেন, সেই চেক্ দিয়ে শান্তিনিকেতনের আর্থিক অবস্থার কিছুটা সুরাহা করা দরকার। সৌভাগ্যবশত কবির প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সেই সময় লণ্ডন থেকে দেশে ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার হাতে নব্বুই পাউণ্ডের একটি চেক্ আশ্রমের তহবিলে জমা দেবার জন্য তুলে দিলেন।

রথীদের জুন মাসের মাঝামাঝি ইউরোপে যাবার দিন ঠিক হয়েছে। যাত্রার কদিন আগে প্রতিমা বলল, “বাবা মশায়, আমার একটুও ইউরোপে যেতে ইচ্ছে করছেনা। আপনার এতবড় অপারেশন হবে আর আমরা কাছে থাকবো না! কে আপনার শুশ্রূষা করবে, কে আপনার সব দেখাশুনো করবে, এ সব ভাবতেও আমার খারাপ লাগছে।”

রথীও সায় দিয়ে বলল, “সত্যি বাবামশায়, আপনাকে একা ফেলে এখন আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছেনা।”

“না, না, রথী, বৌমা, তোমরা এইসব ভেবে তোমাদের ইউরোপ ভেকেসান্ নষ্ট কোরনা। আমার জন্য চিন্তা কোরনা, শুনেছি এই নার্সিং হোমে পরিচর্যার ব্যবস্থা খুব সুন্দর। মিঃ ও মিসেস রোদেনস্টাইন আছেন, তারপর মিসেস মুডীও শিকাগো থেকে কদিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। উনি এলে আমার দেখাশুনো করার কোন অসুবিধে হবেনা।”

সেই ব্যবস্থাই হোল। রথীরা চলে যাবার তিন দিন পরেই মিসেস মুডী লণ্ডনে এসে হাজির, সঙ্গে তাঁর সেক্রেটারী ইডিথ্ কেলগ্। চেল্‌সি-তে তিনি তাদের পুরোনো ফ্ল্যাটেই উঠেছেন—১৬ নম্বর মোরস গার্ডেন। লণ্ডনে এটিই ওদের প্রিয় ফ্ল্যাট। আগের দুবার হ্যারিয়েট মুডী যখন লণ্ডনে উইলিয়ামের বোন শার্লট্-এর সঙ্গে এসেছিলেন, তখনও তাঁরা এই ফ্ল্যাটেই ছিলেন।

এবার উঠেই রবীন্দ্রনাথকে সেখানে ওদের সঙ্গে থাকার জন্য মিসেস মুডী যেই অনুরোধ করলেন, কবিও সেই আমন্ত্রণ সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত হলেন।

মিসেস মুডীর সৌভাগ্যবশত ঠিক সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্ট অফিস' নাটিকাটি লণ্ডনের রয়াল কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হচ্ছিল। এর খানিকটা অংশ তিনি শিকাগোতে থাকতেই শুনেছিলেন, এবার সবটা স্বচক্ষে মঞ্চে দেখার সুযোগ পেলেন।

যদিও এ নাটিকাটি তাঁকে খুবই অভিভূত করেছিল, তবু আইরিশ অভিনেতাদের দিয়ে এই চরিত্রগুলির রূপায়ন তাঁর বিশেষ ভাল লাগেনি।

সেই কথাই তিনি পরের দিন রবীন্দ্রনাথকে বললেন, "মিঃ টেগোর, এই অভিনয়ে 'পোষ্ট অফিস'-এর চরিত্রগুলি ঠিক যেন ফোটেনি, বিশেষ করে শিকাগোতে আপনার পড়ার তুলনায়।"

"আপনাকে তো আগেই বলেছিলুম মিসেস মুডী, যে এই 'পোষ্ট অফিস'-এর অমলের চরিত্রে আমার ছেলেবেলার জীবনের ছায়া আছে। মনে হয় বাঙালী অভিনেতা না হলে কেউই এর মূল ভাবটি পুরোপুরি ফুটিয়ে তুলতে পারবেনা।"

"এটি অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। তবু মিঃ ইয়েট্‌স্-কে ধন্যবাদ দিতে হবে যে, তিনি কষ্ট করে এটির অভিনয়ের আয়োজন করেছেন। আপনার 'চিত্রা' নাটিকাটি অভিনয়ের কী হল? আপনি তো জানেন আপনার সব নাটকের মধ্যে এই নাটিকাটি আমার সবচাইতে বেশী

প্রিয়। আপনি যখন শিকাগোতে এটি পড়েছিলেন, সেই থেকে আমি এই কাহিনীটি একদম ভুলতে পারিনি।”

“তার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ, মিসেস মুডী। এখানে ‘চিত্রা’র অভিনয়ের জন্য মিসেস রোদেনস্টাইন কবি ও নাট্যকার জন্ ড্রিঙ্ক্ওয়াটার-এর বার্মিংহ্যাম্ রিপার্টোরি কম্পানীর সঙ্গে কথা বলছেন। দেখি কী হয়।”

আসলে রবীন্দ্রনাথ মিসেস মুডীকে তখন অবধি বলেননি যে এই নাটিকাটির ইংরেজী অনুবাদ বই-আকারে প্রকাশিত হলে তিনি মিসেস মুডীর নামেই তা উৎসর্গ করবেন ঠিক করেছেন। কিন্তু তিনিও জানেননা যে মিসেস মুডীও সেটি কানাঘুষায় ইতিমধ্যেই শুনতে পেয়েছেন। কিন্তু কেউই এ সম্পর্কে তখন কোন কথা বললেননা, দুজনেই ‘সারপ্রাইজ্’ বজায় রাখতে চান।

মিসেস মুডীর চেল্সির ফ্ল্যাটে আবার তাঁর শিকাগোর ‘গ্রোভ্ল্যাণ্ড’-এর বাড়ির মতো রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে আসর জমে উঠল। তবে ইডিথ্ কেলগ্ ছাড়া লণ্ডনের বন্ধুরাই এখন সব। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যারা দেখা করতে আসেন, মিসেস মুডী সবসময়েই তাদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত থাকেন।

এই চেল্সিতে থাকার সময় অনেকদিন পর রবীন্দ্রনাথের আবার গান লেখার নেশায় পেল। এই সময় প্রায় রাত্রিবেলাতেই তিনি একটি করে গান লিখতে লাগলেন। এক রাতে পর পর তিনটি গান লিখে ফেললেন। শেষের গানটি হোল, ‘এ মনি হার আমার নাহি সাজে।’

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় কবি মিসেস মুডীকে যখন মুখে মুখে তার ইংরেজী তর্জমা করে শোনালেন, তখন তিনি একটু অভিভূত হয়ে পড়লেন। গানটি শুনতে শুনতে তাঁর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হোল। মনে পড়ল পরলোকগত স্বামী উইলিয়ামের কথা। এই ফ্ল্যাটে থাকতেই কত সন্ধ্যায় তিনি এমনি করে তাঁর লিখিত গান পড়ে শুনিয়েছেন, গুন গুন করে তার দু এক কলি গেয়েওছেন। এখন

সেই সব স্মৃতি আবার হুড়মুড় করে ফিরে এল। রবীন্দ্রনাথকে কিছু না বলে তিনি অলক্ষ্যে চোখের জল মুছে নিলেন।

জুন মাসের শেষের দিকেই রবীন্দ্রনাথের অর্শের অপারেশন হোল লণ্ডনের ডাচেস্ নার্সিং হোমে। রোদেনস্টাইনই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তিনি যখন শুনতে পেলেন যে শিকাগোতে হোমিওপ্যাথি করেও রবীন্দ্রনাথের কোন উপকার হয়নি এবং টাকার জন্য তিনি অপারেশন করাতে রাজী হচ্ছেননা, তখন তিনি তার এক বৃটিশ বন্ধুকে ধরে সব ব্যবস্থা করলেন। তাঁর সেই সার্জেন্ট বন্ধুও ভারতের এই প্রখ্যাত কবিকে নাম-মাত্র ফি-তে অপারেশন করাতে সানন্দে রাজী হলেন। সর্ত হোল যে অতিরিক্ত 'ফি' হিসেবে কবির অটোগ্রাফ-করা 'গীতাঞ্জলি'র একটি কপি তাঁর চাই।

অপরেশন যথাসময়ে ভালোভাবেই সম্পন্ন হোল। আরোগ্যকালের জন্য অস্ত্রোপচারের পর দুসপ্তাহ সেই নার্সিং হোমে কবিকে থাকতে হোল। তখন শুধু জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা আর মনে মনে কথার ফুলঝুড়ি তৈরী করা ছাড়া তাঁর আর কিছুই করার রইলনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দেখতে তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব এমনভাবে ভীড় করে দেখতে আসতেন যে বিকেল বেলায় ভিজিটিং আওয়ার্স-এ তাঁর ঘর ফুলের তোড়ায় ভরে যেত। রবীন্দ্রনাথ এখন একজন বিশেষ 'সেলিব্রেটি', তাই লণ্ডনের এক পত্রিকাতেও তাঁর সেই অপারেশনের সংক্ষিপ্ত খবর বেরোল।

যখন উইলিয়াম রোদেনস্টাইন, অ্যালিস ও তাদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে কবিকে দেখতে আসতেন, রবীন্দ্রনাথ যেন তখনই সবচেয়ে বেশী খুশী হতেন। রোদেনস্টাইনের, ডান হাতটি ধরে তিনি একদিন বললেন, "আবার আপনার কৃতজ্ঞতাপাশে বন্দী হলুম বন্ধু।"

"না, না, মিঃ টেগোর, ওকথা আপনি একদম ভাববেননা। এই

সার্জেনও কবি-সাহিত্যিকদের গুনমুগ্ধ। ভারতের নামকরা কবির স্বাস্থ্যোদ্ধারের কাজে নিজেকে লাগাতে পেরে তিনি নিজেই কৃতার্থ।"

অ্যালিস রোদেনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর, মিসেস মুডীর বাড়িতে থেকে আপনার খাওয়া-দাওয়া কেমন হচ্ছিল? প্রতিমা এখানে নেই, আমার তাই চিন্তা ছিল আপনার ঠিকমত যত্ন হচ্ছিল কিনা।"

"আপনি ও ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন মিসেস রোদেনস্টাইন। মিসেস মুডীর যত্নের তুলনা হয়না। দুঃখ এই যে বৌমার হাতের ভারতীয় রান্না খেতে পাচ্ছিলুম না।"

বলতে না বলতে মিসেস মুডী এক বিরাট ফুলের তোড়া নিয়ে সেখানে হাজির। রবীন্দ্রনাথ সাদরে আহ্বান করলেন, "আসুন, আসুন, মিসেস মুডী, আপনার কথাই এখন হচ্ছিল।"

"আশাকরি নিন্দার কিছু নয়," মিসেস মুডী হেসে বললেন।

"আপনাকে নিন্দা করবার মতো ভাষা এখনও কোথাও তৈরী হয়নি মিসেস মুডী। এরা জিজ্ঞাসা করছিলেন আপনার ওখানে কোন অসুবিধে হচ্ছিল নাকি। আমি বলেছি এই যদি অসুবিধে হয়, তাহলে সুবিধে কী জিনিষ তাই জানতে চাই।"

"আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, মিসেস রোদেনস্টাইন। কিন্তু আমাদের 'ব্রাইড্ মাদার' এখানে নেই, তাই ভয় হয় কোন ত্রুটি রয়ে গেল কিনা। আপনি ইউরোপ থেকে ওদের কোন সংবাদ পেয়েছেন কী?"

"এখনও নয়, তবে দু-একদিনের মধ্যেই পেয়ে যাবো বলে আশা করছি," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন।

রোদেনস্টাইনের ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ একটু দূরে দাড়িয়ে ছিল। এমন সময় তাদের নবছরের বড় মেয়ে র‍্যাচেল এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের কানে ফিসফিস করে কী বলল। রবীন্দ্রনাথ তাই শুনে ভীষণ হেসে উঠলেন।

"কী ব্যাপার ?" মিসেস রোদেনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনার বড় মেয়ে আমার একটা ছবি এঁকেছে, সেটি আংকেলকে প্রেজেন্ট্ করতে চায়।"

"বেশ তো, নিয়ে এসো না!" রোদেনস্টাইন বললেন।

র‍্যাচেল অনেক সংকোচের সঙ্গে সেই ছবি যখন রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলো, তখন সবাই একঝলক দেখেই হেসে উঠলেন। দাড়ি আঁকা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মুখের আদল হয়নি, অনেকটা পরিচিত যিশুখৃষ্টের ছবি হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ র‍্যাচেলের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "তোমরা চার ভাইবোনে যে আমার কত আদরের তা তোমাদের বোঝাতে পারবোনা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন চিরদিন তোমাদের চোখে চোখে রাখেন।"

রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আমার তরফ থেকে একটু খারাপ খবর আছে। আমাকে এখন গ্লস্টারশায়ারের ফার ওক্‌রিজ-এই বেশী সময় থাকতে হবে, কারণ ওখান থেকেই আমি ছবি আঁকার বেশী প্রেরণা পাচ্ছি। অ্যালিসের সঙ্গে এই গ্রীষ্মের ছুটিতে ছেলে-মেয়েরাও সেখানে যাচ্ছে। তাই আপনার সঙ্গে শীঘ্র কিছুদিন আর দেখা-সাক্ষাত হচ্ছেনা। তবে আপনি ভাল হয়ে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের ওখানে বেড়াতে আসবেন।" তারপর মিসেস মুডীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনিও ওর সঙ্গে আসবেন, মিসেস মুডী। আপনি জানেন যে মিঃ টেগোরের মত আপনিও এখন আমাদের ঘরের লোক হয়ে গেছেন।"

"সে আমি জানি, মিঃ রোদেনস্টাইন," মিসেস মুডী হেসে উত্তর দিলেন।

"আরও একটু খারাপ খবর আছে, মিঃ টেগোর," রোদেনস্টাইন বললেন। "মিঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের 'সতী' উপন্যাসটি এখানে ছাপানোর জন্য অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু সফল হবো বলে মনে হয়না। কোন

বৃটিশ পাবলিশার্সই পরার্থবোধে বই ছাপতে রাজী নয়।"

শুনে রবীন্দ্রনাথের মনটি একটু খারাপ হয়ে গেল। জানেন যে দীনেশ বাবু তাঁর এই উপন্যাসটি লেখার পেছনে অনেক সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু এর ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ সুবিধের হয়নি। তারপর লণ্ডনের পাবলিশার্সরা এত তাড়াতাড়ি আর এক ভারতীয় লেখকের বই ছাপাতে রাজী নয়, বিশেষ করে এটি যখন উপন্যাস।

রোদেনস্টাইনরা চলে গেলেও রবীন্দ্রনাথকে দেখতে আসার ভীড়ের বিরতি নেই। এরা বিদায় নেবার পরই এলেন আর্নেস্ট রাইস তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে। প্রায় একই সঙ্গে এলেন মে সিংক্লেয়ার, আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস, এভলিন্ আণ্ডারহিল ইত্যাদিরা। শুধু ইয়েট্স্ আসতে পারলেন না। গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি আয়র্ল্যাণ্ডে গেছেন, সঙ্গে এজরা পাউণ্ড। কিন্তু ওখান থেকেই তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে 'গেট্ ওয়েল্' কার্ড পাঠালেন।

একদিন গ্রেট বৃটেনের 'পোয়েট্-লরিয়েট' রবার্ট ব্রিজেস্ নিজে তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সাথে নার্সিং-হোমে দেখা করতে এলেন। কবির সঙ্গে ছেলেকে হ্যাণ্ডসেক্ করিয়ে দেবার পর তিনি বললেন যে অদূর ভবিষ্যতে তিনি একটি ইংরেজী কবিতার সংকলন সম্পাদনা করার কথা ভাবছেন। এতে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী কবিতাও তিনি অন্তর্ভূক্ত করতে চান।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন। শুধু বললেন যে ছাপার আগে যেন তাঁর কবিতার খসড়াটি তাঁকে দেখিয়ে নেওয়া হয়।

পরের দিন বিকেল বেলায় মিসেস মুডী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনাকে তো এই নার্সিংহোমে বেশ কয়েকদিন থাকতে হবে। ভাবছি ইডিথ্-এর সঙ্গে একটু ফ্রান্সে ঘুরে আসি, বিশেষ করে ফ্রান্সের আল্পস্ অঞ্চলে। লণ্ডনের এই ভ্যাপসা গরমে আর আমি পেরে উঠছি না। শিকাগোর অধিবাসী, বুঝতেই পারছেন বাঁচতে হলে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া চাই আমাদের।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, মিসেস মুডী। প্লিজ্, আমার জন্য আপনার যাওয়া কোথাও আটকে রাখবেন না। আমি নার্সিংহোম থেকে আপনার ফ্ল্যাটে ফিরে গেলেও আমার কোন কষ্ট হবে না।"

"আমি তার আগেই ফিরে আসব, মিঃ টেগোর", বলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বিদায় নিলেন।

মিসেস মুডীর ফ্রান্সের এই ভ্রমণ একটু রোমহর্ষকই হয়েছিল। ইডিথ্ কেলগ্-এর সঙ্গে গাড়ী করে যখন আল্পস্-এর গ্রেনোব্ল্ সহরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন গাড়ীর গতি ঢালু দিয়ে নামবার সময় বৃদ্ধি পেয়ে খাদের দিকে চলে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ষ্টিয়ারিং হুইল ঠিকমত ঘুরিয়ে সে যাত্রা তারা রক্ষা পেলেন।

পরে মিসেস মুডীর কাছে রবীন্দ্রনাথ যখন এই বর্ণনা শুনলেন, তখন বললেন, "মিসেস মুডী, ঈশ্বরের কৃপায় আপনি সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছেন। ভেবে দেখুন, আপনার কিছু হলে আমাদের কী অবস্থা হোত!"

"মিঃ টেগোর, লণ্ডনে আপনার বন্ধুর অভাব!" মিসেস মুডী হেসে উত্তর দিলেন। "সবার কাছেই আপনার এখন সমান সমাদর। আপনাকে আতিথ্য দিতে পারলে তারা ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু একটি কাজের কথায় আসি। প্যারিসে আমি বিখ্যাত ভাস্কর জো ডেভিড্সন্-এর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁকে দিয়ে আপনার একটি আবক্ষ মূর্তি তৈরী করাতে চাই। তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই এখানে আসছেন। আপনাকে তার জন্য কয়েকটি 'সিটিং' দিতে হবে।"

"মিসেস মুডী, এসব আপনি কী করেছেন? আমার মতো সামান্য ব্যক্তির আবার মূর্তি তৈরী কেন?" রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে আপত্তি করলেন।

"আপনি সামান্য ব্যক্তি হলে নিশ্চয়ই এসব করতাম না, মিঃ টেগোর। আমার সবসময় দুঃখ যে উইলিয়াম বেঁচে থাকার সময় আপনার সঙ্গে কেন আমাদের পরিচয় হোল না! উইলি আপনার

সঙ্গে আলাপ করে কী খুশীই না হোত !"

"সে দুঃখ আমারও, মিসেস মুডী। তাঁর কাব্যগ্রন্থ আমাকে ভীষণভাবে অভিভূত করেছে। পরিচিত হয়ে আমিই ধন্য হতুম।"

কিন্তু শিল্পী জো ডেভিড্সন যখন লণ্ডনে এলেন, মিসেস মুডী তখন বাতের ব্যথায় বিছানায় শয্যাশায়ী। আসলে স্ট্রবেরী খেতে ভীষণ ভালবাসেন বলে লণ্ডনে এসে প্রাণভরে ইংলিশ স্ট্রবেরী খেয়েছেন। ফলে কোমরে বাতের ব্যথা ভীষণ ভাবে চাগিয়ে উঠেছে। এখন বিছানা থেকে উঠতেই ভীষণ কষ্ট হয়।

তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সেবা-যত্নের কোন ত্রুটি রাখেননি তিনি। বলতে গেলে গোটা ফ্ল্যাটটাই রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন, শুধু নিজের শয়নকক্ষটি ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবার জন্য লোকের ভীড়েরও কমতি নেই। তারই মধ্যে ভাস্কর জো ডেভিড্সন এসে কবির 'সিটিং' নিতে শুরু করলেন।

মে সিংক্লেয়ার-এর একটি স্টুডিও ছিল এই বাড়িরই ওপরের এক ফ্ল্যাটে। তিনি একদিন নেমে এসে এই সিটিং সময়ে কবিকে সঙ্গ দিতে এলেন। সবারই ভয় ছিল যে এইরকম চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে কবি না তাঁর ব্যক্তিগত ধ্যানের মধ্যে ডুবে যান, তাহলে তাঁর কাছ থেকে আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যাবেনা। তখন ডেভিড্সনের কোন নির্দেশই রবীন্দ্রনাথের কানে পৌঁছবেনা।

এই সময়ে একদিন কবি ইয়েট্স্ এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাত করতে। মিসেস মুডীর সঙ্গে সে-যাত্রা তাঁর দেখা হোলনা, কারণ তখনও তিনি বিছানায় শয্যাশায়ী। রবীন্দ্রনাথই ইয়েট্স্কে অভ্যর্থনা করে ড্রয়িং রুমে বসালেন।

"মিঃ টেগোর, আপনার 'দি গার্ডেনার' কাব্যগ্রন্থের ম্যানুস্ক্রিপ্ট্ নিয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি, যার ভার ম্যাক্মিলান্ আমার ওপর দিয়েছে। আপনার সব কবিতাগুলিরই ইংরেজী অনুবাদ খুব সুন্দর

হয়েছে। তবে কয়েকটি শব্দ আমি এখানে-সেখানে পরিবর্তন করে দিয়েছি। তার জন্য আপনার অনুমতির জন্য এসেছি।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছ থেকে ম্যানুস্‌ক্রিপটি নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে ইয়েট্‌স্‌-কৃত পরিবর্তনগুলি দেখতে লাগলেন। ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র ম্যানুস্‌ক্রিপ্টে ইয়েট্‌স্‌ কয়েকটি শব্দের অতি সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। এক্ষেত্রেও তাই, ইয়েট্‌স্‌ বিশ্বাস করেন যে প্রত্যেক কবির কাব্যের মধ্যে তাঁর প্রকাশের অনন্যতা ফুটে ওঠা উচিত, সব কিছু ধুয়ে-মুছে মসৃণ করলে সব লেখাই প্রায় একরকম হয়ে যাবে। এ কথা বিশেষ করে সত্য রবীন্দ্রনাথের কবিতা সম্পর্কে যার প্রকাশভঙ্গী ইংরেজী কবিদের কবিতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেখানে স্বকীয়তা রক্ষা করা ভীষণ প্রয়োজন, নইলে এই সব কাব্য প্রকাশের কোন যথার্থ তা থাকবেনা।

পড়া হয়ে গেলে ম্যানুস্‌ক্রিপ্টটি ইয়েট্‌স্‌-এর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আপনার পরিবর্তনগুলি যথাযথই হয়েছে, মিঃ ইয়েট্‌স্‌। মনে হয় এতে কবিতাগুলির প্রকাশ আরও সুষ্ঠুভাবে হবে।"

"আমাকে ভুল বুঝবেননা, মিঃ টেগোর। আপনার ইংরেজী অনুবাদ সত্যিই অনবদ্য। তবে কয়েকটি শব্দের প্রয়োগ আমার কানে লেগেছে। সেগুলিরই মাত্র পরিবর্তন করেছি।"

"মিঃ ইয়েট্‌স্‌, ইংরেজী কাব্যে এই ভাষার প্রয়োগ আজ আপনার থেকে আর কে বেশী জানে! আপনি এ নিয়ে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হবেননা। আপনি আমার মঙ্গলের জন্যই এই সব কবিতার পেছনে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করেছেন। আপনি যখন বলেছিলেন যে আমার 'মালিনী' নাটক এখানকার দর্শকরা গ্রহণ করবেনা, আমি বিনা প্রতিবাদে সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলুম, কারণ আপনি আমার পরম হিতাকাঙ্খী। আমি কি কোরে ভুলি যে লণ্ডনে আমার 'পোষ্ট অফিস' নাটকটির অভিনয়ের জন্য আপনিই মূলত দায়ী?"

"আপনার এ কথা শুনে খুসী হলাম, মিঃ টেগোর। রোদেনস্টাইন

আমাকে আপনার 'সাধনা' গ্রন্থের ম্যানুস্ক্রিপ্ট দেখিয়েছেন। অপূর্ব হয়েছে। ম্যাক্‌মিলান তো এটিও ছাপাবে বলেছে। আপনি আর্নেস্ট রাইস্-কে এটি দেখতে বলে খুবই সঙ্গত কাজ করেছেন। ধর্ম ও দর্শনমূলক লেখায় ওর থেকে বড় বিশেষজ্ঞ আর পাওয়া যাবেনা।"

"সে আমি জানি, মিঃ ইয়েট্‌স্। আপনাকেই আমি প্রথম বলছি, এ বইটি আমি রাইসের নামেই উৎসর্গ করবো ঠিক করেছি।"

"এ বইয়ের এর থেকে ভাল উৎসর্গ আর হতে পারেনা," ইয়েট্‌স্ ওঠবার সময় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথকে বললেন।

রবীন্দ্রনাথের দেশে ফেরার সময় ঘনিয়ে এল। ঠিক হয়েছে চৌঠা সেপ্টেম্বর লিভারপুল্ থেকে জাহাজ ধরবেন। এবার কবির সঙ্গে থাকবে কালীমোহন ঘোষ। তার পড়াশুনোর কাজ শেষ হয়েছে, তাই এখন সে ফিরে যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিতে। ইটালির নেপেল্‌স্ বন্দর থেকে রথী ও প্রতিমাও তাদের সঙ্গে যোগ দেবে।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছে ছিল দেশে ফেরার আগে জার্মানি ঘুরে যাবেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার সময় অধ্যাপক অয়কেন্ অনেক করে জার্মানি যেতে বলেছিলেন। তারপর জার্মান কবি কাইজারলিং ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' পড়ে ভীষণ মুগ্ধ হয়ে কবিকে জার্মানিতে আসার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁর চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ কাইজারলিংকে লিখেও ছিলেন যে তিনি শীঘ্রই সেখানে বেড়াতে আসবেন।

কিন্তু তা আর হোলনা। দেশে ফেরার জন্য রবীন্দ্রনাথের মন তখন ভীষণ উতলা। কিন্তু তিনি এ-ও জানেন যে দেশে ফেরা খুব একটা সুখের হবেনা। নিন্দুকের দল তাঁর জন্য অপেক্ষা করে আছে, তিনি ফিরে গেলেই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তাঁর নামে কুৎসার জোয়ার আনবে। আবার তিনি এখন ফিরে না গেলে শান্তিনিকেতনের কাজকর্মও লক্ষ্যচ্যুত হবে, বিশেষ করে তাঁর যে সব পরিকল্পনা আছে

তার কোন রূপায়ন হবেনা।

কন্যা মীরাকে কবি যেন এইকথাই তাঁর চিঠিতে লিখলেন ঃ

"দেশে যাবার জন্য মনটা উতলা হয়ে উঠেছে। এখানকার লোক-সমাজের টানাটানিতে আমার মনের ভেতরটাতে অত্যন্ত ক্লান্তি এসেছে। আমাদের দেশের জনশুন্য নিভৃত কোন্-টির মধ্যে কিছুদিন চুপচাপ করে বসে থাকতে পারি তাহলে হাড়গুলো জিরয়। কিন্তু আবার ভাবি সেখানে গিয়ে নানা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে গিয়ে পড়তে হবে—তাছাড়া এবার ফিরে গেলে সেখানে মানুষের ধাক্কা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে যাবে—তার থেকে নিজেকে বাঁচানো আমার পক্ষে ভারি শক্ত হবে—এর ওপরে আমার আবার সমালোচক বন্ধুদের দল আছে—তাদের কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই পূর্বের চেয়ে আরো অনেক উচ্চতর সপ্তকে চড়বে। মানুষকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তোলবার উপকরণ সেখানে যে কিছু কম আছে তা বলতে পারিনে। তা হোক, তবু সমস্ত স্বীকার করে নিতে হবে—নিজের বাসা ছেড়ে কোথায় বা ঘুরে বেড়াব ?"

শুধু মীরাকেই নয়, আদরের ভাইঝি ইন্দিরাকে লিখলেন, "...যখন ভেবে দেখি দেশে ফিরে গিয়ে চারিদিক থেকে কত ছোটো কথাই শুনতে হবে, কত বিরোধ, বিদ্বেষ, কত নিন্দাগ্লানি—তখন মনে মনে ভাবি আরো কিছু দিন থাক্, যতদিন পারি এই সমস্ত কাকলি থেকে দূরে থাকি। কিন্তু অপ্রিয়তাকে পাশ কাটিয়ে চলা চলেনা, তাকে ঠেলে চলাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা। যা ভালো লাগেনা তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে, ডরিয়ে ডরিয়ে চলবনা।"

অগষ্ট মাসের মাঝামাঝি রবীন্দ্রনাথ ঠিক করলেন যে গ্লষ্টারশায়ারে রোদেনস্টাইনের কান্ট্রি হাউস থেকে ঘুরে আসবেন। তিনি বারবার আসতে অনুরোধ করেছেন, মিসেস রোদেনস্টাইনও ছেলেমেয়েদের নিয়ে এখন সেখানে আছেন। তারপর মিসেস মুডী এখন অনেকটা ভাল হয়েছেন, ঠিকমতো হাঁটা-চলা করতে পারছেন। রোদেনস্টাইন তাঁকেও অনেক অনুরোধ করেছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যেতে।

অনেক দিন পরে লণ্ডন থেকে গ্রামের দিকে বেড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের খুব ভাল লাগল। মিসেস মুডীর গাড়ীতেই ওরা যাচ্ছিলেন। গাড়ীর জানালা দিয়ে কবি তাকিয়ে দেখেন গোটা কান্ট্রিসাইডই যেন ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। প্রায় প্রত্যেকের বাড়ির সামনে ঘন সবুজ লন্ সুন্দর করে ছাঁটা, মনে হয় কে যেন সবুজ মখমলের কার্পেট পেতে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল বৃটিশদের দাবী যে, বলতে গেলে তারাই আধুনিক ল্যাণ্ডস্কেপিং আবিষ্কার করেছে। তার সত্যতা যাই হোক না কেন, কনস্টেবল্-এর আঁকা ইংলণ্ডের ল্যাণ্ডস্কেপের ছবি দেখলে মনে হয় এমনটি বোধহয় পৃথিবীর কোথাও নেই।

হঠাৎ মিসেস মুডীর কথায় রবীন্দ্রনাথের তন্ময়তা ভাঙ্গল। "কি রকম অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না মিঃ টেগোর? কয়েকমাস আগে আপনাকে শিকাগোর লেক্ মিশিগান দেখাচ্ছিলাম, আর আজ আপনার সঙ্গে ইংলণ্ডের কান্ট্রিসাইডে বেড়াতে বেরিয়েছি!"

"সবই করুণাময় ঈশ্বরের ইচ্ছা, মিসেস মুডী। আপনার সঙ্গে যে এমন ভাবে পরিচয় হবে তা কি কোনদিন ভাবতে পেরেছি! এর মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য লুকিয়ে ছিল, নইলে রথীই বা কেন মিস্ হ্যারিয়েট মনরোকে আমার কবিতার রিপ্রিন্ট্-এর জন্য লিখতে যাবে, আর আপনিই বা আমাদের জন্য আপনার বাড়ির দরজা অমনিভাবে খুলে দেবেন?"

"আতিথেয়তা আমাদের গ্রোভ্ল্যাণ্ড-এর বাড়িতে বরাবরই করেছি মিঃ টেগোর। উইলি বেঁচে থাকতে আমাদের বাড়িতে কত যে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সমাগম হোত তার ঠিক নেই।"

"মিঃ ফার্দিনান্দ স্কেভিল্ ও রিজলি টরেন্স কেমন আছেন?" রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন। "সত্যি ওদের সান্নিধ্যে আমার শিকাগো ও নিউইয়র্কের দিনগুলি খুবই আনন্দের সঙ্গে কেটেছে।"

"ওরা ভালই আছে, মিঃ টেগোর। আপনার কথা দেখা হলেই খুব বলে। আমার নিজের দিক দিয়েও একটি সুখবর আছে।

আমার ছোটভাইয়ের একটি মেয়ে হয়েছে। আমাদের ভাই বোনদের মধ্যে এই হচ্ছে প্রথম সন্তান।"

"কনগ্রাচুলেশন্স্, মিসেস মুডী। আমি দেখতে পাচ্ছি এ মেয়ে আপনার খুব আদরের হবে, ভবিষ্যতে আপনার জীবনের অনেক শুন্যস্থান পূর্ণ করবে।"

"আমার নামেই তাঁর প্রথম নাম রাখা হয়েছে—'হ্যারিয়েট,'" মিসেস মুডী সলজ্জভাবে যোগ দিলেন।

বলতে বলতে ফার ওক্‌রিজ্ গ্রাম এসে গেল। রোদেনস্টাইনের বাড়ির সামনে এসে হর্ণ দিতেই মিঃ ও মিসেস রোদেনস্টাইন তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা করলেন। মিসেস মুডী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এসেছেন বলে ওরা আরও খুশী।

রোদেনস্টাইনের এই কান্ট্রি হাউসটি আগে এক খামারবাড়ি ছিল। অনেক সংস্কার ও নতুন পেইন্ট করে বাড়িটিকে ছিমছাম করা হয়েছে। বাড়ির পেছনে অনেকটা জমি, সেখানে সব ফলের গাছ রয়েছে। সামনে পোঁতা হয়েছে রং-বেরং-এর অজস্র রকম ফুলের গাছ।

ওদের দুজনকে ড্রয়িং রুমে বসিয়ে রোদেনস্টাইন বললেন, "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে এখানে আবার আপনাকে বৃষ্টির সম্মুখীন হতে হয়নি, মিঃ টেগোর। গতবার যখন এসেছিলেন তখন তো শুধু খারাপ আবহাওয়াই পেয়েছিলেন।"

"এবারের সুন্দর আবহাওয়ার জন্য খানিকটা কৃতিত্ব মিসেস মুডীরও, মিঃ রোদেনস্টাইন। ওর 'সানি ডিস্‌পোজিশনে'র জন্যই মেঘ কেটে গিয়ে সূর্য আবার উঁকি দিয়েছে।"

রবীন্দ্রনাথের কথায় সবাই হেসে উঠলেন। রোদেনস্টাইন মিসেস মুডীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনার শরীর এখন ভাল দেখে খুশী হলাম, মিসেস মুডী। শুনলাম স্ট্রবেরী খেয়ে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওয়েল্, ইংলিশ স্ট্রবেরী একটু বেশী কষা। হয়ত আমাদের আবহাওয়ার জন্যই বোধ করি।"

"আমারই অতিরিক্ত লোভের পরিণাম, মিঃ রেদেনস্টাইন," মিসেস মুডী হেসে উত্তর দিলেন। "ইংলণ্ডের আবহাওয়াকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।"

কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর বিকেল বেলায় ওরা সবাই মিলে হেঁটে হেঁটে গ্রাম দেখতে বেরোলেন। রোদেনস্টাইনই সেই দলের গাইড। সহর থেকে দূরে গ্রামের শান্ত পরিবেশের মধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথ মনে প্রাণে শান্তি পেলেন। চারদিকে নানারকম পাখির কূজন, সবুজ গাছপালা, সব মিলিয়ে তাঁকে বারবার দেশের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর মনটা আরও যেন বেশী 'হোমসিক্' হয়ে পড়ল।

গ্রামের চার্চের সামনে দিয়ে যেতেই ওরা দেখতে পেলেন সেই চার্চের পাদ্রী সামনের ফুলের গাছে ঝাঁঝরি দিয়ে জল দিচ্ছেন। রেদেনস্টাইনকে দেখতে পেয়েই তিনি এগিয়ে এলেন।

"রেভারেণ্ড, আপনার সঙ্গে মিসেস হ্যারিয়েট ভন্ মুডী ও মিঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পরিচয় করিয়ে দিই," রেদেনস্টাইন বললেন। "মিসেস মুডী শিকাগো থেকে এসেছেন আর মিঃ টেগোর হচ্ছেন ভারতের নামকরা কবি। ওর কথা তো আপনাকে আগেই বলেছি।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওঁর 'সং অফারিংস্' কাব্যগ্রন্থের রিভিউ 'টাইম্স্ লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে' পড়েছি। মিঃ টেগোর, আপনার আগমনে আমাদের গ্রাম ধন্য হোল। আপনারা বাড়ির ভেতর আসবেন কী?"

"না, না, রেভারেণ্ড, আপনার আমন্ত্রনের জন্য অনেক ধন্যবাদ," রোদেনস্টাইন তাড়াতাড়ি উত্তর দিলেন। "এরা সবাই গ্রামের মুক্ত পরিবেশে একটু ঘুরে বেড়াতে চান। লণ্ডনে এই কটা মাস বদ্ধ অবস্থায় থাকার পর বাইরের এই আলো-হাওয়া এরা ছাড়তে চাননা।"

"তার জন্য এঁদের আমরা দোষ দিতে পারিনা," রেভারেণ্ড হেসে বললেন। "ওয়েল, তাহলে আপনারা আমাদের গ্রামের সৌন্দর্য উপভোগ করুন," বলে তিনি আবার ফুলের গাছগুলিতে জল দিতে

লাগলেন।

গ্রামের রাস্তা থেকে বেড়িয়ে এসে রোদেনস্টাইনের বাড়ি ফিরতেই রবীন্দ্রনাথ দেখলেন একটি বৃদ্ধ লোক বাইরের বাগানে কাজ করছে। ওরা কাছে আসতেই মাথার ক্যাপ তুলে সে সম্মান জানালো।

"মিঃ টেগোর ও মিসেস মুডী, আপনাদের সঙ্গে টিমোথীর পরিচয় করিয়ে দিই," রোদেনস্টাইন বললেন। "ও আমাদের বাগানের কাজ ও বাড়ির টুকিটাকি মেরামতের কাজও করে। আপনি শুনে খুসী হবেন মিঃ টেগোর যে টিমোথী ইণ্ডিয়াতেও ছিল। ও বৃটিশ মিলিটারী সার্ভিসে কাজ করেছে, সেই সিপাই মিউটিনির সময়।"

সিপাই বিদ্রোহের উল্লেখে রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। সিপাই বিদ্রোহ আরম্ভ হবার চার বছর পরে তিনি জন্মেছিলেন, কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই সেই যুদ্ধের বীভৎস রূপ ও ভারতীয়দের প্রতিরোধের অনেক গল্প শুনেছেন। সেই ইংরজদের বিরূদ্ধে নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপী, ঝাঁসির রাণীর বীরত্বমূলক যুদ্ধের কাহিনী। ব্রহ্মদেশের পটভূমিকায় যখন তিনি তাঁর 'দালিয়া' নাটকটি লিখেছিলেন, তখন তাঁর বারবার ভারতের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহের নির্বাসন ও সেখানে তাঁর মৃত্যুর কথা মনে আসত।

রাত্রে ডিনার খাবার পর রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার ভারতে ফিরে যাবার তো সময় হয়ে এল।"

"হ্যাঁ, সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে জাহাজ ছাড়বে। সঙ্গে কালীমোহন যাচ্ছে।"

"গুড ওল্ড কালীমোহন। ভাবতে পারছিনা যে আপনাদের আর দেখতে পাবোনা, আপনারা আমাদের জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন।"

এ কথা শুনে রবীন্দ্রনাথের মনও ভীষণ ভারাক্রান্ত হয়ে এল। সেদিন রাত্রে নিজের ঘরে গিয়ে তিনি লিখলেন, "জীবন যখন ছিল ফুলের মতন" গানটি।

পরের দিন সকালে ব্রেক্‌ফাস্টের টেবিলে যখন এর ইংরেজী তর্জমা করে ওদের শোনালেন, তখন রোদেনস্টাইন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি চলে গেলে আর আমাদের সদ্য লিখিত গান বা কবিতা কে পড়ে শোনাবে! আপনার যাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জীবনের এক মধুর পর্বও শেষ হয়ে যাবে।"

রবীন্দ্রনাথ ভারি গলায় বললেন, "বন্ধু, আপনাদের ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারবোনা। আপনাদের আতিথেয়তা আমার স্মৃতির মনিকোঠায় বরাবরই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।"

মিসেস রোদেনস্টাইন বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনি জানেন না যে আপনি চলে যাবার পর আমাদের জীবন কী রকম শুন্য হয়ে যাবে। আপনি যখন আমেরিকায় গিয়েছিলেন, তখন ছেলেমেয়েরা খালি বলত, 'আংকেল টেগোর আবার কবে আসবে!' এবার আর তার কোন আশাজনক উত্তর দিতে পারবোনা।"

সবাই চুপ করে রইলেন। আসন্ন বিদায়ের ছায়ায় সবারই মন তখন ভারাক্রান্ত। এই দেড় বছর রবীন্দ্রনাথ ওদের জীবনের অনেকটা অংশ দখল করে ছিলেন। এখন তার যতি টানতে হবে।

পরের দিন যাবার আগে মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ রোদেনস্টাইন. আমরা যে ফ্ল্যাটটাতে আছি, মিঃ টেগোর চলে যাবার পরই তার লীজ্‌ শেষ হয়ে আসবে। আপনি কী কোন ফ্ল্যাটের খবর দিতে পারেন যেটা আমি ভাড়া নিতে পারি?"

"কেন, আপনারা আমার বাড়িতেই উঠুন না!" রোদেনস্টাইন উত্তর ছিলেন। "ওর লীজ্‌ও শেষ হয়ে এল, এখন ওটি মার্কেটে যাবে। আপনি যদি চান, তাহলে আমি সব ব্যবস্থা করতে পারি। আমাদের এখন প্রধান ঘাঁটি হবে ফার-ওক্‌রিজের এই বাড়ি।" তারপর রবীন্দ্রনাথের দিকে ফিরে বললেন, "কিন্তু মিঃ টেগোর, আমরা কয়েকদিন পরেই লণ্ডনে যাচ্ছি। আপনাকে আমরা এখান থেকে বিদায় দিতে পারিনা। বিশেষ করে শেষবারের মতো আর একবার

আমরা মিলিত হতে চাই ”

সেই কথামতো রবীন্দ্রনাথের জাহাজ ধরার কয়েকদিন আগে রোদেনস্টাইন লণ্ডনে এসে তাঁর বাড়িতে কবির সম্মানার্থে এক ডিনারের আয়োজন করলেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও সেখানে আমন্ত্রিত হলেন ইয়েটস্ ও আর্নেস্ট রাইস্। ডিনার খাবার পরে রোদেনস্টাইনের স্টুডিওতে ওরা মিললেন শেষ বারের মতো।

রোদেনস্টাইন পানীয় হাতে করে উঠে দাড়িয়ে টোষ্ট্ করে বললেন, “মিঃ টেগোর, আপনি জানেননা আপনার এই আগমন আমাদের জীবনকে কতটা সমৃদ্ধ করেছে। আপনার আসার ফলে ইংলণ্ডে সত্যিই আজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই জগত অনেক নিকটবর্তী হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিশ্বের মানুষের মধ্যে সৌভ্রাত্রও বৃদ্ধি পেয়েছে অনেক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি আপনার স্বদেশ যাত্রা যেন নির্বিঘ্ন ও শান্তি-পূর্ণ হয়।”

ইয়েটস্ ও আর্নেস্ট রাইসও রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থে টোষ্ট্ করে কয়েকটি সময়োপযোগী কথা বললেন।

সবশেষে রোদেনস্টাইন প্রস্তাব করলেন, “আসুন, আমাদের এই ক্ষুদ্র জমায়েত আমরা আমাদের চারটি দেশের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শেষ করি। মিঃ ইয়েট্স্, আপনি আয়র্ল্যাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত দিয়ে শুরু করুন।”

ইয়েট্স্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভারী গলায় তা গাইতে শুরু করলেন, কিন্তু একটু পরেই থেমে গেলেন। “মাই গড্, আমি বাকি কথাগুলি ভুলে গেছি!”

রোদেনস্টাইন হেসে বললেন, “মিঃ রাইস্, এবার আপনার পালা।”

আর্নেস্ট রাইস তখন ওয়েল্স্-এর জাতীয় সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন, কিন্তু একটু পরে তিনিও থেমে গেলেন। লজ্জিত স্বরে বললেন, “আমিও বাকিটা ভুলে গেছি, উইল্।”

তাঁর অবস্থা দেখে সবাই হেসে উঠলেন। রোদেনস্টাইন বললেন,

"মিঃ টেগোর, এবার আপনার পালা।"

রবীন্দ্রনাথ তখন উঠে দাড়িয়ে "সুজলাং সুফলাং" দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দে মাতরম" গানটি গাইতে শুরু করলেন। কিন্তু একটু পরে তিনিও থেমে গেলেন।

"কি হোল মিঃ টেগোর, থামলেন কেন?" রোদেনস্টাইন জিজ্ঞাসা করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভীষণ লজ্জিতভাবে বললেন, "বাকি লাইনগুলি আমিও ভুলে গেছি, মিঃ রোদেনস্টাইন!"

সবাই তখন নিজেদের অবস্থা দেখে সলজ্জ হাসিতে ভেঙ্গে পড়েছেন। শুধু রোদেনস্টাইন ছাড়া। গম্ভীর ভাবে উঠে দাড়িয়ে তখন তিনি গাইতে শুরু করলেন, "গড্ সেভ্ দি কিং!"

ততক্ষণে বাকি সবাই আবার উঠে দাড়িয়েছেন। মনে হোল ইংলণ্ডই সেদিন তার যোগ্য প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল সেই জাতীয় সঙ্গীতের অভিনব প্রতিযোগিতায়। একমাত্র রোদেনস্টাইনই পুরো গানটি শেষ করতে পেরেছিলেন!

॥ দশ ॥

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ থেকে যাত্রারম্ভের সময় ভেবেছিলেন ইউরোপে দু-তিন বছর থাকবেন। রথী ও প্রতিমা সমবায় শিক্ষার জন্য ডেনমার্কে যাবে, আর তিনি ঘুরে ঘুরে ইউরোপের সহর-গ্রাম দেখবেন। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ছিল অন্যরকম। লণ্ডনে তাঁর কবিতার অশেষ গুণাবধারণ, আমেরিকায় তাঁর বক্তৃতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা এবং লণ্ডনে ফিরে আবার গুণীজনের অকৃত্রিম সম্বর্ধনা—সব মিলিয়ে তাঁর জীবনের গতিই যেন অন্যখাতে প্রবাহিত হোল।

কিন্তু এতো সম্বর্ধনা সত্বেও তিনি আর বিদেশে থাকতে পারছিলেন না। দেশের জল-হাওয়ার জন্য তাঁর প্রাণ তখন আকুল হয়ে উঠেছে। সবচাইতে তিনি উতলা হয়েছেন শান্তিনিকেতনের কথা ভেবে। তাঁকে ছাড়া কি ভাবে আশ্রম চলছে ভগবানই জানেন। আশ্রমবালকদের কলধ্বনি শোনার জন্যও কবির প্রাণ বড় চঞ্চল। ইউরোপ-আমেরিকায় থাকতে শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, যে সব বিষয় ভেবেছেন, আশ্রমের শিক্ষকদের সঙ্গে তার প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনার জন্যও তাঁর মন অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। ভাইপো সুরেন্দ্রনাথকে দিয়ে টাকা পাঠিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু কবি জানেন যে তিনি নিজে সেখানে উপস্থিত না থাকলে সবদিক সুষ্ঠুভাবে চলবেনা।

তারপর রথীর সঙ্গে বৌমা ইউরোপে বেড়াতে গেল। যদিও মিসেস মুডীর বাড়িতে তাঁর যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি, তবু প্রতিমার পরিচর্যার সঙ্গে কোন তুলনা চলে না, তার শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তিবিনম্র সেবার প্রকৃতিই আলাদা। কবির মনে হয় যতই দিন যাচ্ছে, ততই তিনি যেন রথী ও প্রতিমার ওপর বেশী নির্ভরশীল হয়ে পড়ছেন। তিনি সবচেয়ে খুশী হয়েছেন যে, রথী বুঝতে পেরেছে শান্তিনিকেতনের প্রসার কাজে তাকে এখন কবির কত প্রয়োজন। পুঁথিগত শিক্ষার উপর

রবীন্দ্রনাথের কোন কালেই আস্থা নেই। কয়েকটি ডিগ্রী যোগাড় করলেই যে সত্যিকারের উচ্চশিক্ষা লাভ হবে তাতে তাঁর কোন বিশ্বাস নেই। বরং দেশের সত্যিকারের শিক্ষার প্রসারে রথী যদি আত্মনিয়োগ করতে পারে, তাহলে সেই হবে তার প্রকৃত শিক্ষা। কবি জানেন যে, প্রয়োগ ব্যতীত প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়না।

রবীন্দ্রনাথের যাবার সময় রোদেনস্টাইন লণ্ডনে ছিলেননা। এক বিশেষ কাজে তাঁকে বাইরে যেতে হয়েছিল, সেখানে এক সপ্তাহ মত থাকবেন। যাবার দুদিন আগে মিসেস রোদেনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করার সময় তাঁর চোখে জল বেরিয়ে এল।

"মিঃ টেগোর, আপনি চলে যাবেন ভাবতে আমাদের কী খারাপ লাগছে বোঝাতে পারবোনা। কদিন ধরেই তো বাচ্চারা আংকেল টেগোর চলে যাবে ভেবে অস্থির। কে ওদের মজার মজার সব বিদেশী গল্প বলবে, ছোটদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে!"

রবীন্দ্রনাথ ম্লান হাসি হেসে বললেন, "মিসেস রোদেনস্টাইন, আমাদের সবাইকেই তো একদিন চলে যেতে হবে, বিশেষ করে যে পরবাসী। কিন্তু আপনাদের ঋণ জীবনে কোনদিন শোধ করতে পারবোনা। সময়ে-অসময়ে কতদিন এখানে এসে আপনাদের জ্বালাতন করেছি, তার জন্য আবার ক্ষমা চাইছি।"

"মিঃ টেগোর, ও সব কথা আপনি অনুগ্রহ করে ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। আপনি আমাদের পরিবারের লোক হয়ে গেছেন। উইল্ তো বারবার বলে আপনি হলেন ওর নিজের ভাই। ও আপনাকে কী চোখে দেখে আপনি তো তা জানেন। এই সময়ে লণ্ডনে থাকতে পারলোনা বলে ওর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলেছে।"

"ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদ, মিসেস রোদেনস্টাইন্ যে উইল্-এর মত বন্ধুর সাক্ষাত পেয়েছি। আজ এখানে আমার সামান্য যেটুকু পরিচিতি, তা সবই ওর জন্য।"

"ও সব কথা আপনি বলবেননা মিঃ টেগোর। আপনার যে

প্রতিভা, তার প্রকাশ একদিন না একদিন এদেশে হোতই। হ'য়ত উইল্ তার কিছুটা ত্বরান্বিত করেছে। যাই হোক, আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমরা এ বাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফার-ওক্‌রিজ্-এই পাকাপাকি-ভাবে থাকব। মিসেস মুডী এ বাড়িটি ভাড়া নিচ্ছেন।"

"হ্যাঁ, মিসেস মুডী আমাকে তা বলেছেন। এ খুবই ভাল হোল। আমার বন্ধুদের স্মৃতিতে এ বাড়ি সব সময়েই ভরা থাকবে। আপনাদের পরে মিসেস মুডী আমার জন্য যা করেছেন তার তুলনা হয়না।"

"আপনি একটু বসুন। আমি জন ও মাইকেলকে ডেকে আনি। আংকেল টেগোরকে বিদায় জানাতে ওরা ভীষণ উদ্‌গ্রীব।"

জন আর মাইকেল এসেই রবীন্দ্রনাথকে জড়িয়ে ধরল। জন বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ন্যাওটা হয়ে পড়েছিল। একটু পরে বেটি ও র‍্যাচেলও কবিকে বিদায় জানাতে এল।

"আংকেল টেগোর, ইণ্ডিয়া থেকে আমাকে ছবির কার্ড পাঠাবে তো?" জন জিজ্ঞসা করল।

"নিশ্চয়ই। তোমাদের চারজনকেই আমি ছবির কার্ড ও বই পাঠাবো। বড় হয়ে ইণ্ডিয়ায় বেড়াতে আসবে কিন্তু।"

"হ্যাঁ, তুমি বলেছো আমাদের সত্যিকারের রয়াল বেঙ্গল টাইগার দেখাবে।"

জনের কথায় সবাই হেসে উঠল। মিসেস রোদেনস্টাইন বললেন, "দেশে গিয়ে পৌঁছসংবাদ দিতে দেরী করবেননা, মিঃ টেগোর। আপনার শরীরের জন্য আমরা চিন্তায় থাকব।"

"আমার শরীরের জন্য আর আপনারা ভাববেননা। এই অপারেশনের পর মনে হচ্ছে অত সহজে মরবোনা।"

মিসেস রোদেনস্টাইন করুণ হেসে দরজার কাছে এসে রবীন্দ্রনাথকে বিদায় দিলেন।

ভারতগামী জাহাজ ধরতে হবে লিভারপুল থেকে। যাবার একদিন আগে আর্নেস্ট র‍্যাইস তাঁর বাড়িতে ডিনার খেতে কবিকে আবার নিমন্ত্রন

করলেন। এবার সঙ্গে আর রথী ও প্রতিমা নেই। তবে মিসেস মুডী আছেন, তাই তিনিও কবির সঙ্গে নিমন্ত্রিত হলেন।

আর্নেস্ট রাইসের বাড়ি যেতেই সবাই ছুটে এল। "ওহ্, মিঃ টেগোর, আপনি জানেননা কীভাবে আপনি আমাদের জীবন স্পর্শ করেছেন," মিসেস রাইস্ বললেন। "বাচ্চারা তো সেই সকাল থেকেই অপেক্ষা করছে কখন আংকেল টেগোর আবার তাদের গান শোনাবে।"

রবীন্দ্রনাথ হাসলেন, "বাচ্চারা সব সময়েই অদ্ভুত গলার গান শুনতে ভালবাসে। আপনাদের সঙ্গে মিসেস মুডীর পরিচয় করিয়ে দি। মিসেস মুডী হলেন আমেরিকান, ওর পরলোকগত স্বামী মিঃ উইলিয়াম ভন্ মুডী আমেরিকার নামকরা কবি ও নাট্যকার ছিলেন।"

"নিশ্চয়ই, মিঃ মুডীর লেখার সঙ্গে আমি পরিচিত," আর্নেস্ট রাইস বললেন। "আমাদের কুটিরে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি. মিসেস মুডী," বলে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন।

মিসেস মুডী বললেন, "মিঃ রাইস্, আমি এর আগে দুবার লণ্ডনে এসেছি, কিন্তু সহরের মধ্যে এতো সুন্দর কটেজ আমি কখনো দেখিনি। কী সুন্দর আপনার বাগান!"

"আপনি সৌজন্যবশত বাড়িয়ে বলছেন, মিসেস মুডী। চলুন ডিনার টেবিলে গিয়ে বসি। মিসেস রাইস ভেতরে যাবাব জন্য ইসারা করছেন।"

খেতে খেতে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "মিঃ রাইস, আমার 'সাধনা'র প্রবন্ধগুলি দেখে দেবার জন্য জানিনা আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো। এগুলি যে প্রকাশের যোগ্য, তা আমার তৈরী করবার সময় মনেই হয়নি। কিন্তু রোদেনস্টাইন ও অন্যান্যরা পড়ে এত প্রশংসা করলেন যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজী হতে হোল।"

"না না, এ প্রবন্ধগুলির উৎকর্ষতা সম্পর্কে আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না, মিঃ টেগোর। এগুলি সত্যিই অপূর্ব হয়েছে। বিধাতার এ এক অমূল্য দান যে তিনি শুধু আপনাকে কবিতা লেখার যাদুকাঠিই

দেননি, প্রাঞ্জল ভাষায় প্রবন্ধ লেখারও ক্ষমতা দিয়েছেন। আমাকে দিয়ে এগুলি দেখানো বাহুল্যমাত্র। এ সব প্রবন্ধ আপনাতেই সম্পূর্ণ।"

"আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন, মিঃ রাইস।"

ডিনার খাবার পরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একান্তে বসে অর্নেস্ট রাইস বললেন, "আপনাকে একটি কথা বেশ কিছুদিন ধরেই বলব মনে করছি মিঃ টেগোর। সেটি হোল যে আমি আপনার একটি সাহিত্য-জীবনী লিখতে চাই।"

"আপনি এই কাজ করে একদমই পণ্ডশ্রম করবেন, মিঃ রাইস। আমার জীবন সম্বন্ধে কারই বা আগ্রহ আছে!"

"অনেকেরই আগ্রহ আছে, মিঃ টেগোর," মিঃ রাইস হেসে উত্তর দিলেন। "ইউরোপের পাঠক-পাঠিকারা জানতে চায় 'গীতাঞ্জলি'র এই কবি কোথা থেকে এলেন, কেমন করে এত সুন্দর কবিতা লিখলেন। তারা তো জানেনা যে এ আপনার প্রায় আজন্ম সাধনা, এই ফললাভ একদিনে সম্পন্ন হয়নি।"

"আপনি যদি এ বিষয়ে লিখতে চান, তাহলে অবশ্যি আমার কোন আপত্তি নেই, মিঃ রাইস," রবীন্দ্রনাথ সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন।

"কিন্তু তার জন্য আপনার জীবন সম্বন্ধে সব তথ্য চাই।"

"ঠিক আছে, দেশে ফিরে গিয়ে আপনাকে যতটা পারি তথ্য পাঠিয়ে দেবো। সত্যি বলতে কী, কিছুদিন আগে আমি আমার জীবনের এক রেখাচিত্র লিখেছি। ইচ্ছে আছে এটি ইংরেজীতে অনুবাদ করার। মিঃ ইয়েট্‌স্ এ ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছেন। আপাতত এর নাম দিয়েছি 'রেমিনিসেন্সেস্'।"

"তাহলে তো খুব ভাল হয় মিঃ টেগোর। আপনি দেশে গিয়ে যতটা পারেন এর ইংরেজী অনুবাদ করে পাঠান। আমি সেই থেকে সাধ্যমত তথ্য আহরণ করবো।"

এমন সময়ে মিসেস রাইস এসে বললেন, "মিঃ টেগোর, যাবার আগে আপনার গান শুনবোনা? অনুগ্রহ করে একটি গান শোনান।"

রবীন্দ্রনাথ তখন তাঁর কয়েকদিন আগে লেখা, 'তোমারই নাম বলব' গানটি গাইলেন। কিন্তু এইসব পরিবেশে যা হয়, শুধু ওই একটি গানই নয়, যথারীতি পর পর আরো তিন-চারটি গান গেয়ে তাদের শোনাতে হোল।

সুরের অনবদ্যতা ও ভাষার যাদুস্পর্শে সবাই কিছুক্ষণ মোহিত হয়ে রইলেন। আর্নেস্ট রাইস দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "মিঃ টেগোর, আপনার এই সব গান যদি যন্ত্রের মধ্যে ধরে রাখতে পারতাম, তাহলে তা ভবিষ্যতের মানুষের অমূল্য সম্পদ হোত। ভাবতেই কষ্ট হচ্ছে যে আপনার এই গান আর কোনদিন শুনতে পারবোনা।"

"ঈশ্বরের অভিপ্রায় থাকলে আবার আমাদের একদিন সাক্ষাত হবে, মিঃ রাইস। তখন আবার গান শোনাবো। এবার আমাদের বিদায় দিন আপনারা। মিসেস মুডীর শরীর এখনও দুর্বল।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি সুস্থ দেহে দেশে পৌছোন। আমি অবশ্যি কাল সকালে আপনাকে বিদায় জানাতে রেল স্টেশনে থাকব।"

"যাবার আগে আর আমি কী বলব!" রবীন্দ্রনাথ দোরগোড়ায় দাড়িয়ে বললেন। "আপনাদের আতিথেয়তা জীবনে ভুলতে পারবোনা," বলে তিনি সবার সঙ্গে করমর্দন করে মিসেস মুডীর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠলেন।

পরের দিন সকালে মিসেস মুডীর সঙ্গে তাঁর গাড়ীতে করে রবীন্দ্রনাথ যখন লণ্ডনের ইউস্টন্ স্টেশনে এলেন, তখন দেখেন যে প্রায় সব পরিচিত বন্ধু-বান্ধবই তাঁকে বিদায় জানাতে সেখানে সমবেত হয়েছেন। আর্নেস্ট রাইস, মে সিংক্লেয়ার, আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস, এভ্‌লিন্ আণ্ডারহিল, স্টার্জ মোর, ইত্যাদি। অর্থাৎ উইলিয়াম রোদেনস্টাইন ছাড়া প্রায় সবাই। এণ্ড্রুজ তো আগেই ভারতে চলে গেছেন। মিঃ পিয়ারসনও এখন বাংলাদেশে।

রেল স্টেশনে আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্-এর সঙ্গে দেখা হতে রবীন্দ্রনাথ

বললেন, "মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্, ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশের ব্যাপারে রোদেনস্টাইন ও ইয়েট্স্ ছাড়া বোধহয় আপনার কাছেই আমি সবচাইতে বেশী ঋণী। ম্যাক্‌মিলান কম্পানীর সঙ্গে চুক্তি করার ব্যাপারে আপনার সাহায্যের জন্য কী ভাবে ধন্যবাদ জানাবো জানিনা। তবে একথাও জানেন যে নিজের জন্য নয়, বোলপুরে আমার স্কুলের জন্যই আমার এই সব অর্থচিন্তা।"

"সে আমি জানি বলেই এতটা চেষ্টা করেছি, মিঃ টেগোর," ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস উত্তর দিলেন। "সেই জন্যই আমি জর্জ ম্যাক্‌মিলানকে বলেছি যে 'গীতাঞ্জলি'র যদি আশাতীতভাবে কাটতি হয়, তাহলে বোনাস হিসেবে তারা যেন কিছু পাউণ্ড আপনার স্কুলকে দান করে।"

"তার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।"

"আপনি এ-ও শুনে খুসী হবেন মিঃ টেগোর যে আঁন্দ্রে জিদ্ আপনার 'গীতাঞ্জলি'র ফরাসী অনুবাদ করতে স্বীকৃত হয়েছেন। এর চাইতে ভাল অনুবাদক আপনি আর পাবেননা।"

"আপনি যা করবেন তা আমার ভালোর জন্যই করবেন, মিঃ ফক্স-স্ট্যাংওয়েস্," রবীন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন। "কিন্তু মিসেস স্টুয়ার্ট মোর না মনঃক্ষুন্ন হন। তিনিও তো এটি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন।"

"আপনি তার জন্য ভাববেননা। মিসেস মোর-ও বুঝতে পেরেছেন যে এ কাজের জন্য আঁন্দ্রে জিদ্ই সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তি। আপনি এ ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দিন।"

"নিগোসিয়েশনের সব ব্যাপারই তো আপনার উপর ছেড়ে দিয়েছি, মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্। ভারতীয় সঙ্গীতের ওপর আপনার বই লেখার কতদূর হোল?"

"চলছে। তবে খুবই শম্বুকগতিতে।"

"বইটি বের হলে আমাকে একটি কপি পাঠাতে ভুলবেননা," রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"নিশ্চয়ই তা ভুলবোনা, মিঃ টেগোর," ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস্ হেসে উত্তর দিলেন। "আপনার গান শুনেই তো এই বই লেখার প্রেরনা পেয়েছি।"

এই সময়ে একদল রিপোর্টারও সেখানে জড়ো হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের বিদায় বাণী শুনতে। তাদের দেখে রবীন্দ্রনাথের মনের ভেতর যে ক্ষোভ কয়েকদিন ধরে জমেছিল, তাই যেন হঠাৎ ফেটে পড়ল। কিছুদিন আগে কলকাতা থেকে ইংরেজীতে প্রকাশিত 'বেঙ্গলি' দৈনিক পত্রিকার একটি সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের হাতে এসেছিল। সেটি পড়ে কবি জানতে পেরেছিলেন যে বর্ধমানে এক ভীষণ বন্যা হয়ে গেছে, তাতে বহু লোক মারা গেছে ও প্রচুর সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছে। অথচ এখানকার পত্র-পত্রিকায় এ সম্বন্ধে কোন খবরই প্রকাশিত হয়নি।

সেই কথাই তিনি তীব্রভাবে সমবেত রিপোর্টারদের বললেন। বাংলায় অতোবড় বিপর্যয়ের খবর এখানকার কাগজে বেরোলনা, অথচ তিনি সংবাদ পেয়েছেন যে জার্মানীর পত্রিকায় সে খবর বিস্তারিত ভাবেই বেরিয়েছে। পরের দিন 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' এটি প্রকাশ করে মন্তব্য করেছিল, "আমরা তাঁর 'গীতাঞ্জলি' পড়ার উপযুক্ত নই যদি না আমরা তাঁর স্বদেশবাসীর যত্ন নিই, যাদের উদ্দেশ্যেই তিনি প্রথম ওইসব গান মরমী বাংলা ছন্দে লিখেছিলেন।"

ক্রমে ক্রমে বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এল। রবীন্দ্রনাথ একে একে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে করমর্দন করলেন। তারপর ট্রেনের কামরার মুখে দাড়িয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে হাতজোড় করে বললেন, "বিদায়, বন্ধুগণ। জানিনা জীবনে আবার কোনদিন আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে কিনা। তবে যেখানে আপনাদের সাহায্য, সহানুভূতি ও আতিথেয়তা পেলাম, আমার সামান্য জীবনে তা কোনদিন ভুলতে বা পরিশোধ করতে পারবোনা। আশাকরি আমাকে একেবারে ভুলে যাবেননা। মনে রাখবেন এক বিদেশী কবি আপনাদের মধ্যে এসে কয়েকদিনের জন্য অজানা গান শুনিয়ে চলে গেছে।"

ট্রেন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে আর্নেস্ট রাইসের

মনে হোল এমন মানুষ তিনি আর দেখেননি। সামান্য একটি ঘরেও যদি এই ব্যক্তি উপস্থিত হন, তাহলেও তার ব্যক্তিত্বের মহিমায় সেই ঘর সমুজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কী কবিতা, কী প্রবন্ধ, কী সঙ্গীত, সব কিছুতেই যেন গ্রীক দেবী মিনার্ভার স্পর্শ তিনি পেয়েছেন। এমন মানুষের জীবনী লিখতে পেরে তিনি নিজেই ধন্য হয়ে যাবেন।

লিভারপুল থেকে জাহাজ ছাড়ল বিকেল বেলায়। নাম 'সিটি অফ্ লাহোর'। জাহাজ ছাড়ার সময় রবীন্দ্রনাথ আর সবার মতো ডেকের রেলিং ধরে দাড়িয়ে বিদায়-দৃশ্য দেখতে লাগলেন। আস্তে আস্তে ইংলণ্ডের তীরভূমি অস্পষ্ট হয়ে যেতে লাগল।

কবির মনে হোল তাঁর এই আসা ও যাওয়ার মধ্যে কী প্রচণ্ড তফাৎ। যখন গত বছর ইংলণ্ড-অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, তখন বাংলা দেশের বাইরে বলতে গেলে কেউই তাঁকে চিনতোনা। আজ ইউরোপ-আমেরিকার সর্বত্র সাহিত্য-মহলে তাঁর নাম প্রতিষ্ঠিত। আগে তাঁর কাব্যগ্রন্থ মূলত বাংলাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এখন ইংরেজীতে তাঁর 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছে, 'দি গার্ডেনার,' 'ফ্রুট-গ্যাদারিং' ও 'ক্রেসেন্ট্ মুন্' প্রকাশিত হতে চলেছে এবং 'সাধনা' প্রবন্ধগ্রন্থও শীঘ্র প্রকাশিত হবে ম্যাক্‌মিলান থেকে। এগুলি ছাড়া 'চিত্রা' ও 'কিং অফ্ দি ডার্ক চেম্বার' নাটক দুটিও প্রকাশিত হবার পথে। 'পোষ্ট অফিস' তো লণ্ডনের রয়াল কোর্ট থিয়েটারে অভিনীত হয়ে অনেক দর্শক ও সমালোচকের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

কালীমোহন ঘোষ ছাড়া সুকুমার রায়ও এই জাহাজে দেশে ফিরছিল। কিন্তু তাদের কেউ তখন কবির কাছে এসে দাড়ায়নি। তিনি যখন চিন্তামগ্ন থাকেন, তখন তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করা পরিচিত সবাই অপরাধ বলেই মনে করে। কিছুক্ষণ পরে কালীমোহন এসে বলল, "গুরুদেব, চলুন ওই ডেক্-চেয়ারে গিয়ে বসি। আর দাড়িয়ে থাকা আপনার পক্ষে ঠিক হবেনা।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "চলো। সত্যি, অনেকদিন পরে জাহাজের এই হাওয়ায় খুবই ভাল লাগছে। এ কয়মাস হৈ-চৈ-র পরে এই কটা দিন আশাকরি নির্বিঘ্নেই কাটানো যাবে।"

ডেকের কোনার দিকে দুটো চেয়ার টেনে দুজনে বসে পড়লেন। রবীন্দ্রনাথ বললেন, "কালীমোহন, তোমাকে রোদেনস্টাইনের তো ভীষণ ভাল লেগে গেছে। ওর বারানসী ঘাটের ছবির পটভূমিকায় তোমার পোট্রেট্ সত্যিই খুব সুন্দর হয়েছে। একটি যদি কপি পাওয়া যেত, তাহলে নিয়ে গিয়ে দেশের সবাইকে দেখাতুম।"

কালীমোহন হেসে বলল, "ছবিটাই তার জন্য নষ্ট হোল, গুরুদেব।"

"না না, তোমাকে মডেল হিসেবে বেছে নিয়ে রোদেনস্টাইন ঠিকই করেছেন। তার ফলে ছবির যথার্থতাই অনেক বেড়ে গেছে।"

আলোচনা অন্যদিকে মোড় ফেরাবার জন্য কালীমোহন বলল, "গুরুদেব, শান্তিনিকেতনের স্কুলের প্রসারের জন্য কী ভাবছেন?"

"তুমি খুব ভাল প্রসঙ্গই তুলেছ, কালীমোহন। তোমাকে এইসব বলার জন্য আমার প্রাণ ছটফট করছে। আমি খুবই স্বপ্ন দেখি যে শান্তিনিকেতনে আমাদের এই স্কুল বেড়ে বেড়ে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে।"

"বিশ্ববিদ্যালয় মানে ইউনিভার্সিটি?"

"হ্যাঁ, তবে সাধারণ ইউনিভাসিটি নয়, এ হবে এক অনন্য বিশ্ববিদ্যালয়। পৃথিবীর সব দেশের প্রধান ভাষা এখানে শিক্ষা দেওয়া হবে, সব রকমের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন এখানে হবে। কলেজ তো আমরা শীঘ্রই স্থাপন করতে পারি। এণ্ড্রুজ চলে গেছেন বোলপুরে, পিয়ারসনও শীঘ্র যোগ দেবেন বলেছেন। এদের ও আর কয়েকজনকে নিয়ে আমরা কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে লেগে যেতে পারি। আশুতোষ মুখার্জি বলেছেন তার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদনের চেষ্টা করবেন।"

"কিন্তু গুরুদেব, আর্থিক সংস্থানের কী উপায় হবে? স্কুলের আর্থিক

অবস্থার কথা চিন্তা করে করে নেপালবাবু ও জগদানন্দবাবুর রাতে ভাল ঘুম হয়না।”

“সে কী আর আমি জানিনা! মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস বলেছেন যে আমার ইংরেজী বইগুলির যদি ভাল বিক্রী হয়, তাহলে ম্যাক্‌মিলান থেকে রয়াল্‌টির উপরে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যাবে। আস্তে আস্তে আমাদের এগুতে হবে কালীমোহন। ইউরোপে বা আমেরিকায় যদি একটা লেকচার ট্যুরের ব্যবস্থা করা যেত, তাহলে টাকার কিছুটা সুরাহা হত!” রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন।

কালীমোহন চুপ করে রইল। সে জানে রবীন্দ্রনাথ এই স্কুলের প্রতিষ্ঠার কাজে কি অসম্ভব স্বার্থত্যাগ করেছেন, নিজের অর্জিত সব অর্থই তিনি এতে নিয়োগ করেছেন। এখন এই নিয়ে যদি আরও মত্ত থাকেন, তাহলে তাঁর শরীর সইবেনা, আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন। দেখা যাক কী হয়, সবই মঙ্গলময়ের ইচ্ছা।

একটু পরেই ডিনারের ঘণ্টা পড়ল। ডিনার খাবার পর রবীন্দ্রনাথ সোজা নিজের কেবিনে চলে গেলেন। কয়েকটি চিঠি লেখা প্রয়োজন। প্রথমেই রোদেনস্টাইনকে। আসার সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়নি ভেবে কবির ভীষণ খারাপ লেগেছে।

কাগজ-কলম টেনে নিয়ে তাঁকে লিখতে শুরু করলেন:

“প্রিয় বন্ধু,

আপনাকে শুধু এই জানাতেই চিঠি লিখছি যে সমুদ্রে এই কটা দিন আমার পক্ষে রৌদ্র ও বিশ্রাম পূর্ণ অখণ্ড আনন্দের দিন হিসেবে কেটেছে। প্রথম দুটো দিন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এখন সেই পর্দা যখন উত্তোলিত হয়েছে, আমি খালি সোনালী ও নীল, শব্দ ও নিস্তব্ধতা, আকাশ ও সমুদ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুনছি। এই নৃত্যপরায়না সাগর আমার কাছে কুমারীর উচ্ছলিত হাসির মতো মনে হচ্ছে, বিবর্ণ আকাশ যার পায়ের কাছে প্রেমের সোনার ডালি উপহার দিচ্ছে। আমার হৃদয় এখন সেই লোভী মৌমাছির মতো, যে ‘ফরগেট-মি-নট্‌’ পুষ্পগুচ্ছের

থেকে মধু সংগ্রহ করে চলেছে এবং যার ভারে তার শাখা এখন অলস ও শান্ত। কালীমোহন ও আমি, এই দুই নিভৃত প্রাণী ডেকের এক কোনে চেয়ার নিয়ে বসি ও নিরবে আমাদের দিন কাটাই, যখন আর সব যাত্রীরা তাদের অন্তহীন ফুর্তির জন্য নানা পরিকল্পনায় ব্যস্ত।··· আমরা জিব্রাল্‌টারের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—পাহাড়কে ভোরের আলোয় ঝিমোন শান্ত্রীর মতো দেখাচ্ছে।

আপনাদের সকলের প্রতি আমার ভালবাসা রইল।

আপনার চিরদিনের
রবীন্দ্রনাথ টেগোর"

বাড়িতেও কয়েকটি চিঠি লিখতে হবে। চিঠি লিখতে রবীন্দ্রনাথের কোন আলস্য নেই। সারাজীবন অসংখ্য চিঠি লিখেছেন। ভাইঝি ইন্দিরা, স্ত্রী মৃনালিনী ও অন্তরঙ্গ বন্ধুদের যত চিঠি লিখেছেন, সেগুলি ছাপা হলে তিন-চারটি বই হয়ে যাবে। ইন্দিরাকে লেখা চিঠিগুলি বই-আকারে ইতিমধ্যেই বেরিয়েছে। স্ত্রীকে লেখা চিঠিগুলি প্রকাশ করবেন কিনা বুঝতে পারছেন না। সেখানে অনেক ব্যক্তিগত কথা আছে, সব প্রকাশিত হলে পাঠক-পাঠিকাদের কী ভাল লাগবে!

পরের দিন সকাল বেলায় ব্রেকফাষ্ট খাবার পরে ডেকে এসে রবীন্দ্রনাথ দেখেন যে কালীমোহনের সঙ্গে এক বৃটিশ পাদ্রীর খুব আলোচনা চলছে। কবি বুঝতে পারলেন যে পাদ্রীই তাকে পাকড়াও করেছেন, লক্ষ্য; যদি এই 'হিদেন্'কে খৃষ্টান ধর্মে দিক্ষিত করে তার 'সোল্'কে রক্ষা করতে পারেন!

রবীন্দ্রনাথ একটু দূরে গিয়ে চেয়ার টেনে একটি বই নিয়ে বসলেন। এভ্‌লিন আণ্ডারহিল্ তাঁর সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইটি রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছেন। এভ্‌লিন্ সত্যিই ভাল কবি, কী সুন্দর মনটি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একযোগে ভক্ত কবীরের অনেক দোঁহা ইংরেজীতে অনুবাদ করেছেন। ম্যাক্‌মিলান এগুলিও বই-আকারে ছাপতে রাজী হয়েছে।

বইটি পড়তে পড়তে কবি এতো তন্ময় হয়ে গেছেন যে খেয়াল নেই কখন বেলা হয়ে গেছে, সূর্য আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে।

কালীমোহনের দিকে তিনি তাকিয়ে দেখেন সেই পাদ্রী সাহেব তখনও তাকে ছাড়েননি, সমানে বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছেন। দেখে রবীন্দ্রনাথের মায়া হোল। কালীমোহনের উদ্ধারকল্পে তিনি তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথকে দেখেই কালীমোহন সসম্মানে উঠে দাঁড়াল, তারপর তাঁকে সেই পাদ্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। "রেভারেণ্ড বোল্টন্, আপনার সঙ্গে মিঃ রবীন্দ্রনাথ টেগোরের পরিচয় করিয়ে দিই। আমরা দুজনেই একসঙ্গে ভারতে ফিরে যাচ্ছি।"

রবীন্দ্রনাথ আসন গ্রহণ করার পর রেভারেণ্ড বোল্টন্ জিজ্ঞাসা করলেন, "মিঃ টেগোর, আপনি দেখছি লং রোব পড়ে আছেন। আপনি কী নেটিভ্ প্রিস্ট্?"

কালীমোহন সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, "না না, রেভারেণ্ড বোল্টন্। মিঃ টেগোর বেঙ্গলের বোলপুর স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা, যেখানে আমি একজন শিক্ষক। ইনি ভারতের সবচাইতে প্রসিদ্ধ কবি।"

"আই সি। ওয়েল, কবিদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। কিন্তু আপনার স্কুলে যদি হিন্দু দেব-দেবীর পূজো করার উপযোগিতা প্রচার করেন, তাহলে আমি আপত্তি করতে বাধ্য। আমি মনে করি হিন্দুদের এই অসংখ্য দেব-দেবীর পুতুল পূজো তাদের আত্মাকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে।"

"রেভারেণ্ড বোল্টন্, হিন্দুধর্মে পৌত্তলিকতাই তো সব নয়। এ হচ্ছে ঈশ্বরের একপ্রকার প্রকাশ। কিন্তু আপনি যদি বেদ বা উপনিষদ পড়েন তাহলে দেখবেন প্রাচীন হিন্দুরা নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার কথাও বলেছেন। আর্যঋষিদের কাছে ঈশ্বর যেমন জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ছিলেন, তেমনি আবার তিনি অনন্ত ব্রহ্ম, ঈশ্বর সর্বব্যাপী।"

এই কথাটি শুনে রেভারেণ্ড বোল্টন্ একটু চম্‌কে গেলেন। তিনি

কোনদিন বেদ বা উপনিষদের নাম শোনেননি, নেটিভ্‌দের কোন ধর্ম-গ্রন্থেরই তিনি ধার ধারতেননা। বললেন, "কিন্তু ও সব স্ক্রিপ্‌চার তো পড়া হয় বলে জানিনা। আমি দেখি ইণ্ডিয়ার সর্বত্রই ঢাক-ঢোল পিটিয়ে অসংখ্য দেব-দেবীর পূজো হচ্ছে। এই পৌত্তলিক পূজোর মধ্যে আত্মার মুক্তি নেই, মিঃ টেগোর। একমাত্র যিশুখৃষ্টের পথ অনুসরণ করলেই আত্মার মুক্তি সম্ভব।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আমাদের দেশের এক আধুনিক সেইন্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস বলেছেন, 'যত মত তত পথ'। পথ তো একটি নয়, রেভারেণ্ড বোল্টন্। সব পথ ধরেই একাগ্রচিত্তে সাধনা করলে ঈশ্বরের করুনালাভ হবে, আত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব।"

"কিন্তু আমাদের পাপবোধ সম্বন্ধে কী হবে? আমরা যত পাপ করেছি, তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত হবে যদি যিশুখৃষ্টকে আশ্রয় নিই। ভুলে যাবেননা আমরা সবাই পাপী, আর পাপের বেতন হচ্ছে অনন্ত নরক ভোগ।"

"পাপের এই ব্যাখ্যা আমি মানতে রাজি নই, রেভারেণ্ড বোল্টন্। পাপ আমাদের জীবনে স্থির হয়ে থাকেনা, জীবনের প্রকৃত গতি রুদ্ধ করেনা। অনন্তের প্রতি আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি আমাদের অনুরাগ, পাপ উত্তীর্ণ করে জীবনকে পুণ্যের পথে নিয়ে যায়। পাপ থেকে জীবের জন্ম নয় রেভারেণ্ড। উপনিষদে আছে "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিখানি ভূতানি জায়ন্তে' অর্থাৎ আনন্দের ভেতর থেকেই জীবের জন্ম।"

রবীন্দ্রনাথের এইকথা শুনে রেভারেণ্ড বোল্টন্ বুঝলেন যে ইনি সাধারণ লোক নন। তিনি জানেননা যে এইসব আলোচনা রবীন্দ্রনাথ আর্বানায় থাকতে বহুবার তাঁর সেই 'টেগোর সার্কেল'-এর ভক্তবৃন্দের সঙ্গে করেছেন।

তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। কালীমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এইবার আমাদের মাপ করতে হবে রেভারেণ্ড বোল্টন্। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। আমরা আবার এই সব আলোচনা আর এক সময়

করবো।”

“নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আলাপ করে অনেক আনন্দ পেলাম মিঃ টেগোর। আপনার সঙ্গেও মিঃ ঘোষ। হ্যাভ এ নাইস্ ডে,” বলে রেভারেণ্ড বোল্টন্ তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ মনে মনে হাসলেন। বললেন, “কালীমোহন, তোমার আমাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। কেমন তোমাকে এই পাদ্রীর খপ্পর থেকে বাঁচিয়ে দিলুম!”

কালীমোহন হেসে উঠল। “গুরুদেব, আপনি আর একটি আত্মার মুক্তির পথে বাধা জন্মালেন। আপনার কথা শোনার পর রেভারেণ্ড বোল্টন্ এদিকে আর পা মাড়াবেন বলে মনে হয়না।”

রবীন্দ্রনাথ মুচ্‌কি হেসে বললেন, “চলো কালীমোহন, ডাইনিং কারের দিকে তাড়াতাড়ি এগুই। রেভারেণ্ডের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে খিদে পেয়ে গেছে। এইসব আত্মিক ক্ষুধার কথা আলোচনা করলে আমার দৈহিক ক্ষুধাও অনেক বেড়ে যায়।”

কালীমোহন মনে মনে বলল, “লেখার মধ্যে থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তো আপনি অনেক দিনই ভুলে গেছেন। ভাল করে খেলে গতবছর ইংলণ্ডে আসার আগে অতো দুর্বল হয়ে পড়তেন না!”

দেশে ফেরার জন্য রবীন্দ্রনাথ ইচ্ছে করেই দীর্ঘ পথ বেছে নিয়েছিলেন, কারণ এই জাহাজ জিব্রাল্টার ঘুরে ভারতে যাবে। আগেই সংবাদ দেওয়া ছিল, তাই জাহাজ ইটালির বন্দরে ভিড়তেই রথী ও প্রতিমা উঠে এল।

জাহাজে উঠেই ওরা রবীন্দ্রনাথকে পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে তাঁর পাশে এসে বসল। রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছুদিন পরে ওদের দেখতে পেয়ে ভীষণ খুশী হলেন।

“বোস, বোস, তোমাদের কাছ থেকে ইউরোপের গল্প শুনি। তারপর, কোথায় কোথায় ঘুরলে বলো।”

"প্যারিস আবার দেখলুম বাবামশায়," রথী বলল। "সেবার তো মাত্র একদিনের জন্য ঘোরা। এবার ভাল করেই ঘুরে দেখলুম। কিন্তু আমাদের সব চাইতে ভাল লেগেছে ইটালি, বিশেষ করে ভেনিস সহর। গণ্ডোলায় করে বেড়াতে বেড়াতে আমার পদ্মার বোটে থাকার কথা মনে হচ্ছিল।"

"শুধু পদ্মার বোট, শেক্‌স্‌পীয়ারের 'মার্চেন্ট্‌ অফ্‌ ভেনিস্‌'-এর কথা মনে হয়নি?"

"হ্যাঁ, তাও হয়েছে, কিন্তু সে-ও তো পদ্মার তীরে শিলাইদহে থাকতে আপনি আমাদের ভাই-বোনদের পড়ে শুনিয়েছেন।"

এমন সময় কালীমোহন ওদের দেখে এগিয়ে এল, সঙ্গে সুকুমার রায়।

কবি ওদের দেখে সানন্দে আহ্বান করলেন, "এসো, এসো, সুকুমার এই চেয়ারে বসো, কালীমোহন তুমিও বসো। সুকুমার, মিঃ পিয়ারসনের বাড়িতে বাংলা সাহিত্যের ওপর তুমি যে প্রবন্ধটি পড়েছিলে, সেটি আমার খুব ভাল লেগেছিল। দেশে গিয়ে ওটি প্রকাশ করার চেষ্টা কোরো।"

"গুরুদেব, আপনাকে আমি আগে বলার সুযোগ পাইনি," সুকুমার বলল। "আপনি যখন নার্সিং হোমে ছিলেন, তখন 'ইষ্ট অ্যাণ্ড্‌ ওয়েষ্ট সোসাইটি'র এক অধিবেশনে আমি 'দি স্পিরিট্‌ অফ্‌ রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েছিলাম। উপস্থিত সবাই তার খুব প্রশংসা করেছেন, বিশেষ করে রেভারেণ্ড মীডস্‌।"

"সুকুমার, এই সব করে তোমরা আমায় লজ্জায় ফেল কেন! আমেরিকায় সাংবাদিক বসন্ত কুমার রায় বললেন যে তিনি আমার ওপর এক প্রবন্ধ তৈরী করেছেন। এখন আর্নেস্ট রাইস্‌ বললেন যে তিনি আমার জীবনী লেখার কথা ভাবছেন। অথচ সাহিত্যে আমার অবদান কতটুকু! তা নিয়ে এসব হৈচৈ করার কোন অর্থ হয়না। তোমরা এই সব লেখ আর দেশের সমালোচকরা পেয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে তারা

নিন্দার পসরা খুলে বসে।”

“ও সব কথা আপনি ভাববেননা, গুরুদেব। আপনার বইয়ের সংখ্যা তো কম হোলনা। বাংলা সাহিত্যে সে সবের অবদান অসীম। আপনার ‘গোরা’ যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল, আপনি বুঝতে পারবেননা কী রকম দিনের পর দিন আমরা অপেক্ষা করতাম পরের কিস্তি কবে বেরোবে। নিন্দুকদের কথা আপনি ছেড়ে দিন। ওরা সব কিছুতেই আপনার খুঁত দেখে, বিশেষ করে সুরেশ সমাজপতি ও ডি. এল্. রায়।”

ডি. এল্. রায়ের কথা উঠতেই রবীন্দ্রনাথ বললেন, “দেশ থেকে খবর পেয়েছি যে তিনি গত মে মাসে মারা গেছেন। বাংলা সাহিত্যের এ এক অপরিসীম ক্ষতি। ভদ্রলোকের লেখার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আমাকে সবাই তাঁর সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কথা বলে। কিন্তু তারা জানেনা যে দ্বিজেন বাবুর বিরুদ্ধে আমি কোনদিন একটি কথাও বলিনি। এমনকি লণ্ডন থেকে কিছুদিন আগে তাঁর আরোগ্য কামনা করে আমি একটি চিঠিও লিখেছিলুম। শুনলুম সে চিঠি তাঁর মৃত্যুশয্যায় পেয়েছিলেন।”

সবাই চুপ করে রইল। অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে ডি· এল্. রায়ের মৃত্যু সত্যিই বাংলা সাহিত্যের বিরাট ক্ষতি। সুকুমার বলল, “আমার ওর ঐতিহাসিক উপন্যাসের থেকেও ওর হাসির কবিতাগুলি বেশী ভাল লাগত। কিন্তু গুরুদেব, আপনিও তো হাস্যরসে কম দক্ষ নন। আপনার ‘চিরকুমার সভা’ ও ‘পঞ্চভূতের ডায়েরি’ আমি যে কতবার পড়েছি তার ঠিক নেই।”

“হাস্যরসে বেশী ঝুঁকলে গুরুতর বিষয়ে ফিরে আসা কঠিন, সুকুমার।”

“গুরুদেব, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে বলি আমি একটি বড় হাসির কবিতা লিখেছি। আপনাদের অভিমতের জন্য পড়ে শোনাতে চাই।”

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, তোমার লেখা খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনবো।"

"তাহলে আমি এখনই কেবিন থেকে সেটি নিয়ে আসছি," বলে সুকুমার উঠে গিয়ে একটু পরে ফিরে এল। তারপর ডেক-চেয়ারে বসে খাতা খুলে পড়তে শুরু করল ঃ

"খাই খাই করো কেন এসো বসো আহারে
খাওয়ার আজব খাওয়া ভোজ কর যাহারে···"

কবিতা পড়া শেষ হতে না হতে হাসতে হাসতে ওদের দম বন্ধ হবার উপক্রম। একটু থেমে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সুকুমার, এটি অপূর্ব হয়েছে। আমি তখনই জানতুম, উপেন্দ্রের ছেলে তুমি, সাহিত্য তোমার রক্তের মধ্যে। দেশে গিয়ে কবিতাটি প্রকাশ করার চেষ্টা কোরো, ভীষণ সমাদর পাবে।"

প্রতিমা হাসতে হাসতে বলল, "দেশে ফিরে গিয়ে কলকাতায় আমাদের বাড়িতে আসতে হবে কিন্তু, সুকুমার বাবু। সত্যিকারের খাওয়া কাকে বলে তা আপনাকে দেখিয়ে দিতে চাই।"

এমন সময় ডিনার খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল। রথী মন্তব্য করল, "এই ছ্যাখো, খাওয়ার কথা আলোচনা করতে করতেই খাওয়ার ডাক পড়লো। একেই বলে নাম-মাহাত্ম্য।"

পরের দিন সকাল বেলায় জাহাজের ডেকে রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ একা একা ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ঠিক করলেন মিসেস মুডীকে চিঠি লিখবেন। তাঁর আতিথেয়তার ঋণ জীবনে শোধ করা যাবেনা। রোদেনস্টাইনের বাড়িতে উঠে ওরা নিশ্চয়ই এখন গুছিয়ে বসেছেন। কিন্তু শরীর এখনও বোধহয় সবটা সারেনি। কাগজ-কলম নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখতে বসলেন ঃ

"প্রিয় বান্ধবী,

আবহাওয়া যতটা ভাল পাওয়া যেতে পারে তা পেয়েছি। সমুদ্রের উত্তালতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে এর থেকেও তা খারাপ হতে পারে। সূর্য এখন দেবতার মতো এবং অকৃপণভাবে উজ্জ্বল। সে তার

ঝুলি খুলে প্রত্যেক তরঙ্গের মাথায় সোনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আকাশে যেন এই আলোর মদিরার ফলে ঝিম লেগেছে, বাতাস যেন স্বপ্নে বিভোর—সেই স্বর্গের স্বপ্ন যেখান থেকে তারা পথ হারিয়েছে ও আর ফিরে যেতে পারবেনা।

আমার দিনগুলি এখন নিরব ও পূর্ণ। আমি নিচের ডেকের একটি নির্জন কোনা বেছে নিয়েছি যেখানে সমুদ্রের নীলের ওপর আমি আমার হৃদয় প্রসারিত করে দিয়েছি। আমি কি করে সে ইচ্ছা প্রকাশ করি যে আপনি আমাদের সঙ্গে এসেছেন এবং আমাদের আনন্দের ভাগ নিয়েছেন। এ কথা আমার ভাবতেই খারাপ লাগে যে আপনি এখনও লণ্ডনের অন্ধকার, নিরানন্দময় আবহাওয়ার মধ্যে রুগ্নশয্যায় পড়ে আছেন। আশাকরি এতদিনে এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়েছেন এবং আপনার অফুরান প্রসন্নতা ও জীবনোচ্ছলতার মধ্যে ফিরে এসেছেন যার স্পর্শে আপনার চতুর্দিক আবার আলোকিত হয়ে উঠেছে।

আপনি আমার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ভালবাসা গ্রহণ করবেন।

আপনার

রবীন্দ্রনাথ টেগোর"

চিঠিটি লেখার পর রবীন্দ্রনাথ আবার ডেকে এলেন। চারদিকে সূর্যের অফুরন্ত আলো ও নীল সমুদ্রের আদিগন্ত বিস্তারের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তাঁর মন এক অপার্থিব আনন্দে ভরে উঠল। গুন গুন করে তাঁর মনে আবার গানের কলি ভেসে এল, ঠিক চেল্‌সিতে মিসেস মুডীর 'শেইন্ ওয়াক্'-এর ফ্ল্যাটে থাকার সময়ে যেমন তাঁকে গানে পেয়েছিল। ঘরে গিয়ে আবার টেবিলে বসে আস্তে আস্তে লিখতে লাগলেন ঃ

বাজাও আমারে বাজাও।

বাজালে যে সুরে প্রভাত আলোকে

সেই সুরে মোরে বাজাও।

যে সুর ভরিলে ভাষাভোলা-গীতে

শিশুর নবীন জীবন-বাঁশিতে

জননীর মুখ-তাকানো হাসিতে—
সেই সুরে মোরে বাজাও।
সাজাও আমারে সাজাও।
যে সাজে সাজালে ধরার ধূলিরে
সেই সাজে মোরে সাজাও।
সন্ধ্যামালতী সাজে যে ছন্দে
আপনারি গোপন গন্ধে,
যে সাজ নিজেরে ভোলে আনন্দে—
সেই সাজে মোরে সাজাও।

বোম্বাইতে জাহাজ থামতেই রবীন্দ্রনাথ দেখেন এক গাদা লোক ফুলের মালা নিয়ে জাহাজ-ঘাটে দাঁড়িয়ে আছে। কবি ভাবলেন বোধহয় কোন গন্যমান্য বৃটিশ সরকারী কর্মচারী তাদের সঙ্গে এই জাহাজে এসেছেন, তাঁর জন্যই এই অভ্যর্থনা। কিন্তু জাহাজ থেকে নামতেই দেখলেন সবাই তাঁর দিকেই এগিয়ে আসছে। এ সব মালা তাঁরই জন্য।

তাহলে বিদেশের খ্যাতি দেশেও পৌঁছেছে, বিশেষ করে বাংলার বাইরে! কবির মনে পড়ল এ সম্বর্ধনা তাঁর গত বছর বোম্বাই থেকে যাত্রারম্ভের কত বিপরীত, যখন জাহাজ-ঘাটে তাঁকে বিদায় দেবার জন্য কেউ ছিলনা।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বোম্বাইতে থাকলেননা, ট্রেনে করে সোজা কলকাতায় রওনা দেওয়া মনস্থ করলেন। বোম্বাই থেকে কলকাতার এই ট্রেন যাত্রা তাঁর খুবই ভাল লাগল। যদিও পথের ক্লান্তি অনেক, তবু এতদিন পরে নিজের দেশে পা দিয়েই তাঁর মন এক অদ্ভুত প্রসন্নতায় ভরে গেল। ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন মাইলের পর মাইল জুড়ে সমতল ক্ষেত্র, যা অনেকটা তাঁকে ফেলে-আসা ইলিনয়ের প্রেইরী ভূমির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। বর্ষাকাল শেষ হয়েছে। শরতের হিমেল হাওয়া বইতে

শুরু করেছে, তাই রেললাইনের পাশ দিয়ে কাশের গুচ্ছ উঁকি দিতে শুরু করেছে। তাঁর মনও বাংলাদেশে পৌঁছনোর জন্য অধীর হয়ে আছে। কখন বাংলার মাটি স্পর্শ করবেন, কখন আবার বোলপুরের খোয়াইয়ের ধার দিয়ে হেঁটে বেরোবেন, সেই চিন্তায় তাঁর চিত্ত তখন ভরপুর।

কিন্তু ট্রেন হাওড়া স্টেশনে আসতেই কবি দেখেন অসংখ্য লোক ফুলের মালা হাতে নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এসেছে। জানালা দিয়ে দেখলেন সেই বিরাট জনতার পুরোভাগে রয়েছেন অধ্যক্ষ ব্রজেন শীল। তাঁর পাশে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও দাড়িয়ে আছেন।

গাড়ি প্লাটফর্মে থামতেই ওঁরা দরজা দিয়ে কামরার ভেতরে উঠে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গলায় মালা পড়িয়ে তাঁকে নিয়ে শোভাযাত্রার জন্য প্রস্তুতি চলতে লাগল। জনতার মধ্য থেকে ধ্বনিও শোনা যেতে লাগল, 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জয় হোক,' 'কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জয় হোক'!

কোলাহল একটু থামলেই রবীন্দ্রনাথ ব্রজেন শীলকে বললেন, "ব্রজেন বাবু, আপনি এ কী করেছেন? জানেন আমি এ সব একদম পছন্দ করিনা। আমাকে কিছু না জানিয়ে আপনাদের এইসব আয়োজন করা একটুও উচিত হয়নি।"

"কেন, রবিবাবু আপনার প্রতি দেশবাসীর কী কোন কর্তব্য নেই? আপনি ভারতের মুখ বিদেশের কাছে উজ্জ্বল করেছেন, বাংলা ভাষাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার জন্য দেশের লোকেরা যদি আপনাকে অভিনন্দন জানাতে চায়, তার জন্য আপনার কোন আপত্তি করা উচিত নয়।"

"কিন্তু এইসব শোভাযাত্রা করে আমাকে নিয়ে যাওয়ার মধ্যে নিজেকে সঙ্‌-এর মতো লাগছে। অনুগ্রহ করে আপনি এইসব বন্ধ করুন।"

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বললেন, "আপনার কোন অসুবিধে হবেনা, রবিবাবু। আসুন আপনি গাড়িতে উঠে আসবেন। ওরা আপনার গাড়ির পেছনে পেছনে হেঁটে যাবে।"

তাই করা হোল। হাওড়া স্টেশন থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত সারাটা পথ রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য গন্যমান্যদের গাড়ি আস্তে আস্তে চলতে লাগল, তাদের পেছনে দীর্ঘ জনতা ধ্বনি দিতে দিতে শোভাযাত্রা করে চলল।

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া সেই গাড়িতে ব্রজেন শীল ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় উঠেছিলেন। গাড়ির ভেতরে ঢুকে একটু চলার পর তিনি ব্রজেন শীলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্রজেন বাবু, মিঃ রোদেনস্টাইন যে চাকরি ঠিক করেছিলেন, আপনি সেটি নিলেন না কেন? আমি ভেবেছিলুম আপনি ইংলণ্ডে আরো কিছুদিন থাকবেন।"

"দেশে ফেরার জন্য হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, রবিবাবু। জানি মিঃ রোদেনস্টাইন ও মিঃ ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস আমার এই চাকরিটি পাবার জন্য অনেক করেছেন, কিন্তু আমি আর দেশ ছেড়ে থাকতে পারছিলামনা। তাই যখন এদেশেই চাকরির ব্যবস্থা হোল, আমি তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। আমি অবশ্যি ওদের অনেক ধন্যবাদ দিয়ে চিঠি দিয়েছি।"

"দীর্ঘদিন দেশ ছেড়ে থাকার ফলে আমারও সেই অবস্থা হয়েছে ব্রজেন বাবু," রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন। "কবে দেশের মাটিতে পা দেবো তার জন্য প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছিল।" তারপর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "দেশে আমাকে নিয়ে এই হৈ-চৈ-র মূলে তো আপনিই রামানন্দ বাবু। আপনার 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় লণ্ডনে আমার কবিতা-পাঠ, 'গীতাঞ্জলি'র প্রকাশ ও আমেরিকায় আমার বক্তৃতা ইত্যাদি নিয়ে এমন সব সংবাদ ছাপতে লাগলেন যে দেশের লোক ভাবল আমি বুঝি রাজ্য জয় করেছি।"

"রাজ্য জয়ই তো আপনি করেছেন, রবিবাবু। পৃথিবীর সাহিত্য

রাজ্য আপনি জয় করেছেন। আমাকে যখন রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ 'অ্যান ইভিনিং উইথ্ রবীন্দ্র' প্রবন্ধটি লিখে পাঠালেন, তখম আমি তা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।"

"অ্যাণ্ড্রুজ এত বন্ধুবৎসল যে লোকের মন্দ দিক তিনি দেখতে পাননা। কিন্তু তাঁর মতো লোক হয়না। ভারত-অন্ত প্রাণ। শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করতে আসছেন।"

"হ্যাঁ, আমার অফিসে এসে দেখা হতেই সে কথা বললেন। এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় পিয়ারসনের সঙ্গে গান্ধীর আন্দোলনে সাহায্য করতে গেছেন।"

"আজ প্রায় দেড় বছর হোল আমি দেশছাড়া, তাই অনেক ঘটনাই জানিনা। আমাকে এই গান্ধী সম্বন্ধে একটু বিশদভাবে বলুন," রবীন্দ্রনাথ বললেন।

"মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। লণ্ডন থেকে ব্যারিস্টারি পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্র্যাকটিস করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানকার সাদারা ভারতীয়দের কুলির মতো ব্যবহার করে দেখে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন, বিশেষ করে সেখানকার চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য। তাকে সাহায্য করতেই অ্যাণ্ড্রুজ ও পিয়ারসন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন।"

"আশাকরি এরা যেন তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে আসেন। শান্তিনিকেতনে ওদেরকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। শুনুন রামানন্দবাবু, কেদার তো লণ্ডনে সাংঘাতিক কাজ করছে। লণ্ডনের স্টেজে কালিদাসের 'শকুন্তলা' নাটক মহড়া দিতে ব্যস্ত। সত্যি, আপনার এই ছেলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই আর একবার হুলুস্থুল পড়ে গেল। বাড়ির মেয়েরা সব উলুধ্বনি দিয়ে এগিয়ে এল, ফুলের মালা ও কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অভ্যর্থনা করা হোল।

ভীড়ের সামনেই কবির ভাইঝি ইন্দিরা ছিল। এগিয়ে এসে রবীন্দ্রনাথের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করল, "রবিকা, আপনার আসতে কোন কষ্ট হয়নি তো?"

"না, কিন্তু এসব কেন ইন্দু? তোমরা জানো আমি এসব একদম পছন্দ করিনা।"

"কী কোরব, রবিকা, এতে আমাদের কোন হাত নেই। দেশের কাগজগুলিতে এমনভাবে আপনার কথা বেরোতে লাগল যে বাড়ির সবাই বলল আপনাকে এ রকম ভাবে অভ্যর্থনা না করলে আপনার সম্মানের হানি হবে। আমি তবু অনেক কম করে করতে বলেছি।"

রথী ততক্ষণ সব মালপত্র বাড়ির ভেতরে নেবার তদারক করছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যে সব মাননীয় অতিথিরা এসেছিলেন, তাদের বাইরের ঘরে বসিয়ে সে ও প্রতিমা চা-জলখাবারের আয়োজন করতে চলে গেল।

ভীড় আস্তে আস্তে কমলে রবীন্দ্রনাথ তেতলায় নিজের ঘরে এসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। মনে হোল, এতক্ষণে সত্যিকারে দেশে ফিরেছেন। নিজের ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো সুখ বোধহয় আর নেই।

জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রবীন্দ্রনাথের অতীতের সব কথা মনে পড়ল। সেই ছেলেবেলার বদ্ধ জীবন, স্কুল পালিয়ে বাড়িতে বসে থাকা। সাহিত্য নিয়ে মেতে ওঠা। বিয়ে। এই ঘরে বসেই দিনের পর দিন সাহিত্য-চর্চা করা। তারপর একদিন এই বাড়ি ছেড়ে শিলাইদহ-পতিসর ও বোলপুরে বাস শুরু করা।

আজ যদি স্ত্রী মৃনালিনী দেবী বেঁচে থাকতেন, তাহলে তার সম্মানে কত খুশীই না হতেন। মহর্ষী বেঁচে থাকলেও অনেক খুশী হতেন। তিনি তো রবীন্দ্রনাথের কাব্য-উপন্যাস দেখেছেন, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মাশ্রম প্রতিষ্ঠাও দেখে গেছেন। তিনি ঠিকই জানতেন যে তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্র একদিন দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে, ঠাকুর-বাড়ির সুনাম বৃদ্ধি করবে।

পরের দিন কলকাতার সব খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় আগমন ও হাওড়া স্টেশনে তাঁর অভূতপূর্ব সম্বর্ধনার খবর বড় বড় করে বেরোল। বাড়ির চাকর এসে সকালবেলার চা-এর টেবিলে এগুলি রাখতেই তিনি একটু চোখ বুলিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। এসব প্রশংসায় তাঁর কোন চিত্তচাঞ্চল্য জাগেনা। তিনি ঠিকই জানেন যে আজ যারা তাঁর ঢাক দ্বিগুণ নিনাদে পেটাচ্ছে, কালকেই তারা তাঁর নিন্দায় গগন বিদীর্ণ করতে দ্বিধা করবেনা।

রবীন্দ্রনাথের মনে পড়ল কিছুদিন আগে তাঁর লেখার এক সমালোচনা। লেখক আর কোনদিক থেকে নিন্দে করতে না পেরে লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলিরই উৎকর্ষতা বেশী, এগুলির জন্যই তিনি বাংলাসাহিত্যে সঠিক পরিচিত হবেন। আর এক সমালোচক তাঁর 'গোরা' উপন্যাস পড়ে লিখেছিলেন যে কবিতা বা ছোটগল্প নয়, রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিক হিসেবেই প্রধানত প্রতিষ্ঠিত হবেন। তিনি জানেন যে এই সব প্রশংসার পেছনে নিন্দার ঢেউ আসতেও বেশী বিলম্ব হবেনা।

সেই খারাপ খবরটি রথীই দিল বিকেল বেলায়।

"সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, বাবামশায়, এই নিন্দুকের দলে বিপিন পালও যোগ দিয়েছেন। আগে ডি. এল্. রায় ও সুরেশ সমাজপতি ছিলেন, এখন 'পেট্রিয়ট' পত্রিকায় বিপিন পালও আপনার বিরুদ্ধে লিখছেন।"

রবীন্দ্রনাথের কাছে এ সংবাদ নতুন। বিপিন পালকে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করেন, বাংলার অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও মান্য করেন। তাঁর যে বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতেই অসামান্য দখল আছে, রবীন্দ্রনাথ তা সবার আগেই স্বীকার করেছেন। সেই বিপিন পাল যদি এই নিন্দুকের দলে নাম লেখান, তাহলে রবীন্দ্রনাথের মনস্তাপ বাড়বে বই কমবেনা।

কিন্তু এসবের থেকেও খারাপ খবর এল ঠাকুর বাড়ির ভেতর থেকেই।

তাঁর যে দুই কন্যা ও জামাতারা সেখানে একসঙ্গে বাস করতো, আর সব আত্মীয়রা তা ভাল চক্ষে দেখছেনা। ভাইপোরা সব আলাদা হয়ে যেতে চায়। যে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের পুত্ররা সবাই মিলে-মিশে একান্ন-বর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, আজ তারা সব ভাগ বাটোয়ারা করে আলাদা হয়ে যেতে চায়। তারপর রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে জমিদারীর আয়ও অনেক কমে গেছে। বিলেত যাত্রার আগে জমিদারী দেখার ভার পড়েছিল প্রমথ চৌধুরীর ওপর কিন্তু তাঁর মন তখন সাহিত্যে, জমিদারী দেখায় নয়।

আলাদা হয়ে যাবার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কোন আপত্তি নেই। জানেন যে, কালের অমোঘ নিয়মে সবাই আলাদা হয়ে যাবে। মহর্ষীর নিজের ভাই তাঁর সঙ্গে একত্রে থাকেননি, সুতরাং তাঁর এই বৃহৎ পরিবারে যে ভাঙ্গন ধরবে তাতে আর সন্দেহ কী!

সেদিন রাত্রে তিনি রথীকে বললেন, "রথী, আমি কালকেই বোলপুরে চলে যেতে চাই। তুমি ও বৌমাও আমার সঙ্গে চলো।"

"ঠিক আছে বাবামশায়। আমি ট্রেনের টিকিট কাটার বন্দোবস্ত করছি। ওদের কাছে আপনি যে আসছেন তার একটা টেলিগ্রাম করে দি?"

"হ্যাঁ, তাই দাও। বুঝতেই পারছো যে জোড়াসাঁকোয় বেশীদিন থাকলে আমি আরো পারিবারিক নোংরামির মধ্যে পড়ে যাবো। তারপরে এখন আবার 'সামাজিক' আপ্যায়নের সব নিমন্ত্রন আসছে। তার আগেই আমি এখান থেকে পালাতে চাই।"

"কিন্তু বাবামশায়, শান্তিনিকেতনে তো এখন দূর্গোপূজোর ছুটি চলছে। সব ফাঁকা, ছাত্রদের মধ্যে বলতে গেলে কেউ নেই। সেখানে আপনার ভাল লাগবে?"

"খুব ভাল লাগবে, রথী। খোলা হাওয়াই আমার এখন একান্ত প্রয়োজন। তারপর তোমরা থাকবে, আমার কোন কষ্ট হবেনা।"

"আমি কাল সকালেই সব ব্যবস্থা করছি বাবামশায়, আপনি আর

কিছু ভাববেননা।”

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় ট্রেন যখন বোলপুর স্টেশনে এসে থামল, তখন প্লাটফর্মে অনেক লোক, যেন হাওড়া স্টেশনের ক্ষুদ্র সংস্করণ। তবে ছাত্ররা কেউ নেই, সব শিক্ষক ও কর্মীরা, ভীড় করে এসেছে ফুলের মালা নিয়ে। সবার সামনে শান্তিনিকেনের স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদানন্দ রায়, তাঁর সঙ্গে নেপাল রায়, অজিত চক্রবর্তী ইত্যাদি সবাই সেখানে হাজির।

এ অভ্যর্থনা রবীন্দ্রনাথের খারাপ লাগলো না। এ হচ্ছে তাঁর নিজের স্থান, এর মধ্যে আন্তরিকতা আছে, হৃদয়ের বন্ধন আছে। আর দু-জায়গার অভ্যর্থনার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল, সেখানে প্রাণের অর্ঘ্য অনেক কম, যতটা ছিল কর্তব্যকর্মের দায়সারাভাব।

সবাই রবীন্দ্রনাথকে গাড়িতে তুলে নিয়ে শোভাযাত্রা করে শান্তিনিকেতনে পৌছলো। সবারই গুরুদেবকে গত দেড় বছরের কথা বলার জন্য প্রাণ আইঢাই করছিল।

সুদীর্ঘকাল পরে আশ্রমের প্রধান বাড়ির দোতলায় নিজের ঘরে এসে রবীন্দ্রনাথের ভীষণ ভাল লাগল। চারদিক নিস্তব্ধ, কারণ পূজোর ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তাই ছাত্রদের কলরব শোনা গেলনা। তবু নিজের পরিচিত পরিবেশে এসে তাঁর মন এক অনাবিল পরিতৃপ্তিতে ভরে গেল।

পরের দিন সকাল হতেই রবীন্দ্রনাথ ঘুরে ঘুরে আশ্রম দেখলেন। সঙ্গে জগদানন্দ রায়, নেপাল রায়, ক্ষিতিমোহন সেন, অজিত চক্রবর্তী ও কালীমোহন ঘোষ। বাকি অধ্যাপকরা সব পূজোর ছুটিতে তাঁদের বাড়িতে।

শান্তিনিকেতনের এই মুক্ত অঙ্গনের চারদিকের খোলা হাওয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের মন অপূর্ব আবেশে ভরে গেল। এই তাঁর আপন ক্ষেত্র, নিজের বাড়ি, তাঁর জীবনের মূল শিকড় এখন এখানে প্রোথিত। বিদেশ কিছুদিনের জন্য, চিরকালের ঘর করার জন্য নয়। এখানে

আসার পর প্রাণে আবার সেই নিবিড় শান্তি ফিরে এসেছে যা বহুদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছিলেন।

সেদিন রাত্রে ত্রিপুরায় সোমেন দেববর্মনকে লিখলেন: "প্রবাসের পালা শেষ করে আবার আমাদের সেই আশ্রমে এসে বসেছি। কত আরাম সে আর বলতে পারিনে। দেশ বিদেশে সম্মান সম্বর্ধনা তো অনেক পেয়েছি কিন্তু এখানকার খোলা আকাশের এই নির্মল আলোকে প্রতিদিন যে অভিষেক হয় তার কাছে কিছুই লাগেনা!"

পরদিন সকালে অজিত চক্রবর্তী এসে বললেন, "গুরুদেব, রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ ফেব্রুয়ারী মাসেই শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। আমাদের কাজের খুবই প্রশংসা করলেন। আপনার সঙ্গে লণ্ডনে সাক্ষাতের কথাও অনেক বললেন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী চাঞ্চল্য দেখলাম উইলিয়াম পিয়ারসনের মধ্যে। তিনি আমাদের সব কাজ দেখে ভীষণ অভিভূত হয়েছেন। এরা দুজনেই এখন দক্ষিণ আফ্রিকায় গেছেন মোহনদাস গান্ধীর আন্দোলনে সাহায্য করতে। তারপর শান্তিনিকেতনে আসবেন আমাদের কাজে যোগদান করতে।"

রবীন্দ্রনাথ শুনে বললেন, "এরা দুজনেই মহৎ ব্যক্তি। ভারতের কল্যানের জন্য এরা জীবন উৎসর্গ করেছেন। এদের কাছে পেয়ে আমাদের আশ্রমই ধন্য হয়ে যাবে।"

"মিঃ জে. ডব্লু. পেটাভেল্ সস্ত্রীক এসেছিলেন, যার সঙ্গে আপনার নাকি লণ্ডনে আলাপ হয়েছিল। উনি তো এক 'এডুকেশনাল কলোনি' স্থাপন করতে চান। শান্তিনিকেতন দেখে তিনিও মুগ্ধ। আমাদের এখানে শীঘ্রই আবার আসবেন বললেন।"

"পেটাভেল্ সাহেব যদিও পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, কিন্তু ভীষণ আদর্শবাদী। মাথায় তাঁর অনেক ধ্যান-ধারনা ঘুরছে। ওকে যদি আমরা কাজে লাগাতে পারি, তাহলে শান্তিনিকেতন ওর কাছ থেকে অনেক কিছু পাবে।"

শুধু অজিত চক্রবর্তীই নয়, বাকি সব শিক্ষকদেরও অনেক কথা

বলার আছে। খবরের কাগজে তাঁরা যেটুকু খবর পড়েছেন, সে তো সব নয়, হয়ত সবটা সত্যিও নয়। গুরুদেবের মুখ থেকেই তাঁরা সবকিছু শুনতে চান।

রবীন্দ্রনাথ সেদিন বিকেল বেলা অনেকক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটালেন। তাঁর প্রিয় ভ্রমণক্ষেত্র সেই শালবনে ঘুরে ঘুরে ওদের সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন। বললেন যে একদিনে নয়, আস্তে আস্তে তাঁর সব অভিজ্ঞতা সবার কাছে ব্যক্ত করবেন। এই অভিজ্ঞতা কুড়োতেও যেমন সময় লেগেছে, তার বর্ণনাও তিনি সময় বুঝে করবেন।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আশ্রমের পরিচালক কমিটির মিটিং বসল।

নেপালবাবু তখন আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ। তিনি যথারীতি স্কুলের হিসেবে-নিকেশ দাখিল করলেন। আর্থিক অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ভাইপো সুরেন্দ্রনাথের হাতে রবীন্দ্রনাথ যে নব্বুই পাউণ্ডের চেক্ পাঠিয়েছিলেন, সেটি জমা দিয়ে খানিকটা সুরাহা হয়েছে বটে, কিন্তু বিদ্যালয়ের প্রসারের বাজেট একেবারেই শুন্য। ফলে হয় আয়ের অংক বাড়াতে হবে, না হয় আশ্রমের প্রসার কাজ একেবারেই স্থগিত রাখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "আশ্রমের সঙ্কোচনের কথা না ভেবে তার প্রসারের কথাই আমাদের ভাবা উচিত। আজ অ্যাণ্ড্রুজ, পিয়ারসন ইত্যাদিরা আশ্রমে যোগ দিচ্ছেন, শীঘ্রই আমাদের বিদ্যানিকেতন আন্তর্জাতিক চরিত্রের রূপ নেবে। আমি জানি তার জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। আপনারা তো জানেন যে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সবই করেছি, এমনকি আমার অনেক বাংলা বইয়ের কপিরাইট পর্যন্ত বিক্রী করেছি। আমি আবার তাই করতে রাজী। ইংলণ্ডে ম্যাক্‌মিলান কম্পানী আমার 'গীতাঞ্জলি' ছাড়াও আরও কয়েকটি বই ছাপাতে রাজী হয়েছে। আমি ওদের সঙ্গে কথা বলব যদি এই বইগুলির কপিরাইট বিক্রী করে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যায়।"

এ কথায় সবাই একটু চুপ করে রইলেন। স্তব্ধতা ভাঙ্গার জন্যই

বোধকরি ক্ষিতিমোহন সেন বললেন, "গুরুদেব, আমরা কিন্তু আপনার ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি' এখনো দেখতে পাইনি।"

"ওহ্, আমার ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। অথর্'স কপি তো বেশী পাইনি, তার প্রায় সবই ইউরোপ-আমেরিকায় বিলোতে গেছে। দাঁড়ান, আমার ঘর থেকে কপিটা নিয়ে আসছি।"

"আমিই নিয়ে আসছি বাবামশায়," বলে রথী উঠে গিয়ে ঘর থেকে বইটি নিয়ে এল।

সবাই পরম আগ্রহে হাত ঘুরে ঘুরে বইটি দেখতে লাগলেন। অত সুন্দর ছাপা-বাঁধাই বই সচরাচর চোখে পড়েনা। সবার ভাল লাগল বিশেষ করে প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় রোদেনস্টাইনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের মুখের স্কেচ।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, "ম্যাকমিলান কম্পানী যদি এর জনসংস্করণ বার করে, তাহলে অনেক কপি পাওয়া যাবে। আমি এই কপিটি আমাদের লাইব্রেরীতে দান করলুম।"

কালীমোহন বলল, "গুরুদেব, তাহলে অটোগ্রাফ করে দিন। এ বই তাহলে আমাদের লাইব্রেরীতে অমূল্য সম্পদ হয়ে থাকবে।"

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, "কালীমোহন, এ বইয়ের চাইতে রোদেনস্টাইনের আঁকা তোমার ছবিই বেশী মূল্যবান হবে।" তারপর উপস্থিত সবাইকে বারানসীর ঘাটের পটভূমিকায় কালীমোহনকে দাঁড় করিয়ে রোদেনস্টাইনের ছবি আঁকার ঘটনা বললেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রাণে আবার গানের ঢেউ এল। জাহাজে থাকতে যা খুলেছিল এবং কলকাতার হৈ-হট্টগোলে যা বন্ধ ছিল, এখন আবার তা দুকূল ধারায় প্লাবিত হতে লাগল। রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজকে এই সময়ে লিখলেন, "এখন আমার মধ্যে গানের ভাব এসেছে এবং আমি প্রতিদিন নতুন গান রচনা করছি।" প্রাণের ঝর্ণাধারায় যে সুরের স্রোত বইতে লাগল, তারই অঞ্জলি তুলে যেন সেই সময়ে লিখলেন, 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে' গানটি।

এখানে আসার পরের দিনই তিনি রোদেনস্টাইন ও মিসেস মুডীকে নির্বিঘ্নে পৌঁছানোর সংবাদ দিয়েছিলেন। তারপর আর্নেস্ট রাইস যা চেয়েছিলেন, সেই তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তও তাঁকে পাঠিয়েছেন। এখন ইয়েট্‌স্‌-এর পরামর্শমত 'আত্মপরিচয়'-এর ইংরেজী অনুবাদে তিনি ব্যস্ত।

নভেম্বর মাসের গোড়ার দিকে একদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করার জন্য এডোয়ার্ড টমসন্‌ শান্তিকেতনে এসে হাজির হলেন। তিনি বাঁকুড়ার ওয়েস্‌লিয়ান্‌ কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক, এ দিকে আবার ইংরেজী কবি-ও। সবচেয়ে বড় কথা তিনি ভাল বাংলা জানেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আগেই সাক্ষাত হয়েছিল, তাঁর বাংলা কবিতার সঙ্গেও তিনি বিশেষ পরিচিত। এখন তিনিও কবির একটি সাহিত্য-জীবনী রচনা করতে চান। কিন্তু তাঁর স্ত্রী তা একেবারেই চাননা। এক 'নেটিভ্‌' কবির জীবনী লেখার জন্য দু-তিনবছর সময় নষ্ট করার তিনি একান্ত বিরোধী। এখন 'টাইম্‌স্‌ লিটারারী সাপ্লিমেণ্ট্‌'-এ ইংরেজী 'গীতাঞ্জলি'র প্রশংসার পর তিনি নিজেও যেমন উৎসাহিত হয়েছেন তেমনি স্ত্রীকেও নিমরাজী করিয়েছেন।

অধ্যাপক টমসন আসতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করে নিজের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই বললেন। যে কথাগুলি লণ্ডনে থাকতে রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজকে বলেছিলেন, প্রায় সেই একই কথা নতুন করে বললেন। তবে টমসন বাংলা জানেন বলে কবি তাঁকে এক কপি 'জীবনস্মৃতি' উপহার দিলেন।

নয়ই নভেম্বর শান্তিনিকেতনের স্কুল খুললো। ছাত্ররা তাদের প্রিয় গুরুদেবকে তাদের মধ্যে পেয়ে ভীষণ খুসী। তারা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ ছাড়তে চায়না। গুরুদেবকে তাদের অনেক কথা বলার আছে। কবির এই দীর্ঘ দেড়-বছরের অনুপস্থিতিতে তাদের পেটে অনেক কথা জমে আছে, সেগুলি তারা যেন একসঙ্গেই সব বলে ফেলতে চায়।

ক্রমে ক্রমে আশ্রমের দৈনন্দিন কর্মধারার স্রোতে রবীন্দ্রনাথ

নিজেকে ডুবিয়ে দিতে লাগলেন। সেই অতি প্রত্যুষে উঠে ছাত্রদের সঙ্গে মাঙ্গলিক স্তোত্র পাঠ করা, তুপুর বেলায় নিজের ঘরে বসে লেখা-পড়ার চর্চা করা, বিকেলে ইংরেজী সাহিত্যের ওপর ক্লাশ নেওয়া, আর গভীর রাত্রি পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনা করা। তারই মধ্যে আশ্রমের পরিচালনার কাজে নিজেকে যথাসম্ভব নিযুক্ত রাখা। আশ্রমের নিয়ম-অনুসারে আবার তিনি নিরামিশাষী খাবারে ফিরে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এখন কবিতার চাইতে গান রচনাতে বেশী উৎসাহ। বোধহয় গত দেড় বছরের অপেক্ষাকৃত নিরবতাকে একমাসের মধ্যেই ভেঙ্গে ফেলতে চান, মনে মনে তাই সর্বদাই গানের সুর ও কথা জেগে উঠছে। বিশেষ করে বিদেশী সঙ্গীতের সুর মিলিয়ে অনেক গানের কলি মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠছে।

মাঝে তিনি রোদেনস্টাইনের তু-তিনটি চিঠি পেয়েছেন। শুভসংবাদ যে তাঁর 'দি গার্ডেনার' বইটি ম্যাকমিলান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, অথর'স্ কপি নিশ্চয়ই শীঘ্র পেয়ে যাবেন। বইটির রিভিউ ভালই হয়েছে, তবে 'গীতাঞ্জলি'র মত অত উচ্ছ্বসিত নয়। আঁন্দ্রে জিদ্-এর ফরাসী ভাষায় অনুদিত 'গীতাঞ্জলি'ও প্রকাশিত হয়েছে। রোদেনস্টাইন খুব ভাল ফরাসী ভাষা জানেন। লিখেছেন, অপূর্ব অনুবাদ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের মনে হোল যেন একযুগ আগে এদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়েছিল। আস্তে আস্তে ইউরোপ-আমেরিকার সেই দিনগুলি স্মৃতির মুকুরে ঝাপসা হয়ে আসছে। আর কী কোনদিন এইসব বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে! এরা সবাই আস্তে আস্তে তাঁকে ভুলে যাবেন। সারা পৃথিবীই আস্তে আস্তে তাঁকে ভুলে যাবে। তার জন্য তাঁর ক্ষোভ নেই। এই দেড়-বছরের বিদেশ ভ্রমণে যা পেয়েছেন, তার তুলনা নেই। জীবনের মনিকোঠায় সেই সব অভিজ্ঞতা সযত্নে তোলা থাকবে চিরদিনের জন্য। পৃথিবী তাঁকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, কিন্তু তিনি সেই দিনগুলির কথা কোনদিন ভুলবেননা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাবার খবর দেশে পৌঁছল তেরই নভেম্বর। আসলে স্টক্‌হোল্‌ম্‌ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল এইদিনই, কিন্তু এক রিপোর্টার সেই খবর 'স্কুপ্‌' করে তা কলকাতার অধুনালুপ্ত সান্ধ্য দৈনিক 'এম্পায়ার'-এ প্রকাশ করে দেয়।

খবর পেয়ে সারা কলকাতার সংবাদপত্র জগত তখন উত্তাল। একজন বাঙালী তথা ভারতীয় লেখক এতবড় আন্তর্জাতিক সম্মান এর আগে কোনদিন পাননি। এ সম্মানে সারা পৃথিবীই স্বীকৃতি জানাচ্ছে একজন ভারতীয় কবির প্রতিভাকে। খবরটি কলকাতায় পৌঁছনোমাত্র বোলপুরে টেলিগ্রাম করে দেওয়া হোল।

পনেরই নভেম্বর শান্তিনিকেতনে যখন এ খবর পৌঁছল, তখন বিকেল হয়ে গেছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথ, রথী ও ভাইপো দিনেন্দ্রনাথের সঙ্গে গাড়িতে করে চৌপাহাটির শালবনে বেড়াতে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ দূর হতে তাঁরা দেখেন যে কয়েকজন লোক পাগলের মত হয়ে তাঁদের দিকে ছুটে আসছে। কাছে আসতেই কবি দেখলেন তারা সব আশ্রমের লোক। তাদের ঐরকম ব্যবহার দেখে রবীন্দ্রনাথের মনে শংকা জাগল। তবে কী আশ্রমের কোন বিপদ হয়েছে, কোন আশ্রম-বাসী ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে?

আরো কাছে আসতেই দেখা গেল দলের সামনে রয়েছেন ক্ষিতিমোহন সেন, তাঁর হাতে একটি কাগজ। সবাই ভীষণ উত্তেজিত।

রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে তাদের প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে? আপনারা এতো উত্তেজিত হয়েছেন কেন?"

কোন উত্তর না দিয়ে ক্ষিতিমোহন টেলিগ্রামটি রবীন্দ্রনাথের হাতে দিলেন। খবরঃ সাহিত্যে উনিশষ তের সালের নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথকে প্রদান করা হয়েছে। কলকাতা থেকে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

আর কারুকে কোন কথা না বলে সেই টেলিগ্রামটি পাশে দাঁড়ানো নেপাল রায়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "নেপালবাবু, এই হচ্ছে

আপনার অর্থসমস্যা সমাধানের এক উপায়।" পুরস্কারের আর্থিক মূল্য সেবছর ছিল আট হাজার বৃটিশ পাউণ্ড, তখনকার টাকার হিসেবে এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা।

তারপর যেন নিজের মনেই স্বগতোক্তি করে কবি বললেন, "হায়, আজ থেকে আমার ব্যক্তিগত জীবন বলতে আর কিছু রইলনা!"

ওরা যখন আশ্রমে ফিরে এলেন, তখন রাত হয়ে গেছে, সবাই খেতে বসেছে। তাদের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে আশ্রমে ভীষণ সোরগোল শুরু হোল, সবাই ভীষণ উত্তেজিত। অধিকাংশ আশ্রম-বালকই জানেনা নোবেল প্রাইজ কী বস্তু। তবু তাদের প্রাণাধিক গুরুদেব যে এক ভীষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, তা তারা ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছে। সবাই তখন আশ্রম-বাটি ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল, "আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।"

রবীন্দ্রনাথ সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা কী তখন শোনে! কী শিক্ষক, কী ছাত্র সবাই তখন রবীন্দ্রনাথের পায়ে ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করতে শুরু করেছে। কবি বারবার এ সব বন্ধ করতে চাইলেন, তুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবু সেই প্রণামের স্রোত থামলোনা। তারপর যখন অজিত চক্রবর্তীও এসে মাথা নিচু করে প্রণাম করতে গেলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ আর থাকতে পারলেননা। অজিতের কাঁধ ধরে তাকে তুলে বললেন, "অজিত, তুমিও! তোমরা কী সব পাগল হয়ে গেলে?"

"গুরুদেব, আপনি কিছু বলুন, নইলে কেউই এখন থামবেনা," অজিত হেসে উত্তর দিল।

আশ্রম প্রাঙ্গনে সবাই যখন সমবেত হোল, তখন রবীন্দ্রনাথ বললেন, "এ সম্মান আমাকে দেওয়া হয়নি, আমাকে উপলক্ষ্য করে আসলে দেওয়া হয়েছে বাংলা সাহিত্যকেই। আমার লেখার মধ্য দিয়ে আমি তো বাংলার জীবন, তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে অনন্যতা ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছি, সে সৌন্দর্যের ব্যাখ্যা অনেকেই আমার থেকে ভাল

ভাবে করেছেন। আমার কবিতার মধ্য দিয়ে ভগবানের প্রতি যে আকুতি প্রকাশ করেছি, বৈষ্ণব সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে অনেক ভাল ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। আমি শুধু আমার সাধ্যমত তাদেরই পথ অনুসরণ করে ঈশ্বর ও প্রকৃতির মহিমা বর্ণনা করেছি। নোবেল প্রাইজে আমার জীবনের কোন পরিবর্তন হবেনা, আশ্রম-জীবনেরও কোন পরিবর্তন হবেনা। শুধু নেপালবাবুর আর্থিক চিন্তার কিছু সুরাহা হবে। আপনারা আর বিচলিত হবেননা, আপনাদের দৈনন্দিন কাজের আর বিঘ্ন ঘটাবেননা। শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, এ সম্মানে আমাদের আশ্রম যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের পরিচয় যেন নিকটতর হয়।”

সবাই তখন সমবেত কণ্ঠে কবিরই রচিত সব গান গেয়ে রবীন্দ্রনাথকে সম্বর্ধিত করতে লাগল। সবশেষে আশ্রমের ছাত্ররা কাঠ-খড় জোগাড় করে এক বিরাট ‘বন্-ফায়ার’ জ্বালিয়ে তারপর শান্ত হোল।

সেদিন অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন্-ও শান্তিনিকেতনে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই বক্তৃতা দিয়ে সবাইকে শান্ত করার পর বাড়ির ভেতরে গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন। বললেন, “প্রফেসর টমসন, কী হৈ চৈ দেখুন! আজ থেকে আমার আর শান্তি নেই। সবাই আমার কাছে নানান বিষয় নিয়ে আবেদন করবে, অজস্র লোকে আমাকে চিঠি লিখবে। বোম্বাইয়ে জাহাজ-ঘাটে ভীড় দেখেই ভয় পেয়েছিলুম, বুঝেছিলুম আমাকে নিয়ে এখন থেকে ‘পাবলিক শো’ শুরু হবে।”

“এ এক বিরাট সম্মান, মিঃ টেগোর, আপনাকে আমার তরফ থেকেও অভিনন্দন জানাই,” টমসন বললেন। “স্বভাবতই এতে সবাই উত্তেজিত হয়েছে, এ জিনিষ তো আগে কোনদিন ঘটেনি। আপনাকে সম্মান দিয়ে নোবেল্ কমিটি বাংলা তথা ভারতকেই সম্মান জানিয়েছে।”

“জানিনা আমি এই সম্মানের উপযুক্ত কিনা। আমার থেকে নিশ্চয়ই আরো উপযুক্ত ভারতীয় সাহিত্যিক আছেন।”

“কে বলুন?”

রবীন্দ্রনাথ চুপ করে রইলেন।

অধ্যাপক টমসন্ রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখছেন, তাই অনেক মাল-মশলা জোগাড় করেছেন। ইতিমধ্যেই সেই ঘটনা শুনেছেন যে যখন আর্থার ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রবীন্দ্রনাথকে অনারারী ডক্টরেট্ উপাধি দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন, তখন অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলার লর্ড কার্জন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন যে মিঃ টেগোরের থেকেও অনেক বড় ভারতীয় কবি আছেন। ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েস যখন তাদের একজনেরও নাম জানতে চাইলেন, তখন কার্জন তার কোন জবাব দিতে পারেননি।

সেই রাত্রিতেই ইংলণ্ড থেকে রোদেনস্টাইনের টেলিগ্রাম এল, "Nobel Congratulations."

রাত একটু গভীর হতে কলকাতা থেকে খবর নিয়ে এসে উপস্থিত হোল রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ। তার মুখ থেকে আশ্রমবাসীরা আরো বিস্তারিত খবর পেলো। শান্তিনিকেতনের মতো কলকাতাও এই সংবাদে উদ্বেল। সাত-আট দিনের মধ্যে এক স্পেশাল ট্রেনে করে দেশের সব গন্যমান্য ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে আসবেন রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানাতে। সেই দলের মধ্যে থাকবেন জাস্টিস আশুতোষ চৌধুরী, অধ্যাপক জগদীশ চন্দ্র বোস, রেভা[illegible]ও মিল্বার্ণ, মৌলবী আবদুল কাশেম, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র ও আরো অনেকে।

রবীন্দ্রনাথ বুঝলেন কিছুদিনের জন্য অন্তত তাঁর জীবন থেকে শান্তি অন্তর্হিত হয়েছে, এই উত্তেজনার পালা মিটতে বেশ কিছু সময় লাগবে। এর জন্য কারুকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, এমনটি এর আগে কোনদিন হয়নি।

সেদিন গভীর রাতে আশ্রমের সবাই ঘুমোলে রবীন্দ্রনাথ একা ছাতিমতলার বাঁধানো বেদীতে এসে বসলেন। এই ছাতিমতলায়ই ধ্যানে বসে মহর্ষী দেবেন্দ্রনাথের অনেক দিব্যজ্ঞান হয়েছিল। এইখানে

এসেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের বহু শোক-তাপ বিদূরণ করেছেন, মনের ভেতর শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গভীর রাত্রে প্রার্থনায় বসেছেন।

আজও তার ব্যত্যয় ঘটলনা। বেদীর ওপরে উঠে রবীন্দ্রনাথ জোড়াসন করে বসলেন। কত কথা তাঁর মনে পড়ল এই সময়ে। সেই রোদেনস্টাইনের আকস্মিকভাবে কবির ইংরেজীতে অনূদিত গল্প পড়া ও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া, ইয়েট্স্-এর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, ফক্স-স্ট্র্যাংওয়েসের বই প্রকাশের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। আর্বানায় সেই সোনার দিনগুলি, মিসেস মুডীর আতিথ্য, অ্যাণ্ড্রুজের শান্তিনিকেতনে আসা—সবই রবীন্দ্রনাথের স্মৃতির পর্দায় একেএকে ভেসে উঠল। সবই করুণাময় ঈশ্বরের অভিপ্রায়।

তখন যুক্তকরে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনার সুরে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে বললেন ঃ

"হে মঙ্গলময় ঈশ্বর, আমার প্রাণে শান্তি দাও, চিত্তে বৈরাগ্য দাও, হৃদয়ে ভক্তি দাও। আমাকে আশীর্বাদ করো তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস যেন চিরদিন অটল থাকে, জীবনের সব ঝড়-ঝঞ্ঝায় তোমার কূলে যেন আমার তরী ভেড়াতে পারি।

"হে পরমব্রহ্ম, হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও, আমার সমস্ত অহংকার দূর করে আমাকে নির্মল করো।

"হে আমার অন্তর্যামী জীবনদেবতা, তোমার প্রসন্নতা থেকে যেন জীবনে কোনদিন বঞ্চিত না হই, তোমার পদতলে মাথা রেখে যেন এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারি।"

ঃ সমাপ্ত ঃ

পরিশিষ্ট

যদিও আমি রবীন্দ্রনাথের এই জীবনীপর্ব উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে বর্ণনা করেছি, তবু এটি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনার ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। মাত্র তিন-চারটি চরিত্র ছাড়া বাকী সব চরিত্রই ঐতিহাসিক, তাঁদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই পরিভ্রমণের সময়ে সাক্ষাত ও কথাবার্তা হয়েছিল। আলোচনার বিষয়বস্তুও তাঁদের লিখিত বই ও চিঠিপত্র থেকে সংগ্রহ করেছি, শুধু সংলাপের আকারে সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ উপন্যাস লিখতে বসেছি বলে কল্পনার রাশ খুলে দিইনি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট পুরুষের জীবনোপন্যাস লেখার সময়, যার জীবনের প্রায় সব ঘটনাই যখন সুবিদিত ও পূর্বালোচিত।

তবু আর সবার জীবনের মতো রবীন্দ্রনাথের জীবনের এই সময়কার অনেক ঘটনাই বিসংবাদ ও পরস্পরবিরোধী তথ্যে পূর্ণ। এই উপন্যাসের আলোকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষভাবে আলোচনার দাবী রাখে:

রোদেনস্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের লণ্ডনে প্রথম সাক্ষাত:

রোদেনস্টাইন তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে রবীন্দ্রনাথ লণ্ডনে পৌঁছবার দু-একদিন পরে তাঁর বাড়িতে এসেই তাঁর হাতে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের খাতাটি তুলে দিয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনীকার অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন্‌কে বলেছিলেন যে লণ্ডনে পৌঁছনোর কয়েকদিন পরে এক অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে রোদেনস্টাইনের সাক্ষাত হওয়ার সময় তিনি কবির কবিতার ইংরেজী অনুবাদ দেখতে চাইলে রবীন্দ্রনাথ খাতাটি তাঁর হাতে দিলেন। আর এক লেখক লিখেছেন যে লণ্ডনে পৌঁছনোর পরের দিনই পিতা-পুত্র রোদেনস্টাইনের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত হতেই রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজী অনুবাদের খাতাটি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্র-জীবনীকার জি. ডি. খানোলকার লিখেছেন যে লণ্ডনে পৌঁছনোর পরের দিন রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইনকে ফোন করে সাক্ষাতের আয়োজন করেছিলেন। আমি খানোলকরের ভাষ্যই মেনে নিয়েছি, কারণ আমার কাছে এইটিই বেশী সঙ্গত বলে মনে হয়েছে।

রোদেনস্টাইনের বাড়িতে ইয়েট্স্-এর কবিতা পাঠ :

ঘটনাটি ঘটেছিল তিরিশে জুন, উনিশষ বারো সালে, যে তারিখটি রবীন্দ্র-জীবনীকার কৃষ্ণ কৃপালনী, খানোলকার ইত্যাদি সবাই উল্লেখ করেছেন এবং রেভারেণ্ড অ্যাণ্ড্রুজ থেকে আরম্ভ করে আরো অনেকের চিঠি-পত্রে ঘটনাটি ওইদিনই ঘটেছিল বলে বর্ণিত হয়েছে। অথচ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ঘটনাটির তারিখ লিখেছেন সাতই জুলাই, উনিশষ বার সাল। রবীন্দ্রনাথের জীবনে এই দিনটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন ছিল, কিন্তু প্রভাতকুমার এই তারিখটির উল্লেখেই ভুল করেছেন।

লণ্ডনের ট্রকেডারো হোটেলে ভোজসভা :

এই হোটেলে রবীন্দ্রনাথের সম্মানে 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি' কর্তৃক যে ভোজসভার আয়োজন হয়েছিল তার তারিখ ছিল দশই জুলাই, উনিশষ বার সাল। কিন্তু প্রভাতকুমার তাঁর রবীন্দ্রজীবনীতে এর তারিখ দিয়েছেন বারই জুলাই, উনিশষ বার সাল। এখানেও প্রভাত-কুমার তাঁর তারিখে ভুল করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাবর্তনের পথে জাহাজে রবীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর উপস্থিতি :

মেরী ল্যাগো তাঁর 'ইম্পারফেক্ট এন্কাউন্টার' গ্রন্থের ফুট্নোটে লিখেছেন যে মিসেস মুডী লণ্ডনে পৌঁছনোর পূর্বেই রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবী দেশের পথে রওনা দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের রবীন্দ্র-জীবনীতে আছে যে ইটালির নেপল্স্ বন্দর থেকে ওরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একই জাহাজে দেশে ফিরেছিলেন, যে জাহাজে সুকুমার রায় (তোতাবাবু)-ও দেশে ফিরছিলেন। আমি প্রভাতকুমারের

তথ্যই এখানে গ্রহণ করেছি, কারণ আমার মনে হয়েছে যে শান্তিনিকেতনে তাঁর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমাদেবীর অসংখ্যবার সাক্ষাত হয়েছে এবং তাদের জীবনের এই উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমারের সঙ্গে অনেকবার আলোচনা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে জাহাজে বসে রবীন্দ্রনাথ রোদেনস্টাইন ও মিসেস মুডীকে যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে সহযাত্রী হিসেবে রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর কোন উল্লেখই নেই, যদিও তিনি জানতেন তাঁরা ওদের মঙ্গল সংবাদে কত উদ্‌গ্রীব থাকবেন।

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তিসংবাদে প্রতিক্রিয়া ঃ

সেদিন যেহেতু অধ্যাপক এডোয়ার্ড টমসন সেখানে ছিলেন, তাই তাঁর বই থেকে সেইসব প্রতিক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করেছি যা প্রভাতকুমারের গ্রন্থে অনুপস্থিত।

এই উপন্যাস রচনার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলির সূত্রগুলির বিশেষভাবে সাহায্য নেওয়া হয়েছে:

A. Aronson, Rabindranath Through Western Eyes, 1943.

Ramananda Chatterjee, The Golden Book of Tagore, 1931.

Harold M. Hurwitz, "Tagore in Urbana, Ill." *Indian literature*, IV, 1961.

G. D. Khanolkar, The lute and the Plough, 1962.

Krishna Kripalani, Rabindranath Tagore, 1962.

Mary Lago, Imperfect Encounter : Letters of Willam Rothenstein and Rabindranath Tagore, 1972

Harriet Monroe, A Poet's Life, 1938.

Sujit Mukherjee, Passage to America, 1964.

Ernest Rhys, Rabindranath Tagore : A Biographical Study, 1915.

William Rothenstein, Men and Memoirs (3 Volumes).

Basanta K. Roy, Rabindranath Tagore : The Man and His Poetry, 1915.

Mayce E. Seymour, "That Golden Time," *Visva-Bharati Ovarterly*, 1959.

Rabindranath Tagore, Gitanjali, ("Song offerings"), 1913.

The Gardener, 1913

The Crescent Moon, 1913

Chitra, 1913

The King of the Dark chamber, 1914

The Post office, 1914

Sadhana : The Realisation of Life, 1914.

Rathindranath Tagore, On the Edges of time, 1958.

Edward J. Thomson, Rabindranath Tagore, His Life and works, 1928.

Arthur J. Todd, Three wise Men of the East and other Lectures, 1927.

Olivia Torrence (Dunbar), A House in Chicago, 1947.

Albert and emily Vail, Heroic Lives, 1918.

রবীন্দ্র-রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।